পরিবর্ধিত সংস্করণ

হাদীস মানতেই হবে

শায়খ ইমদাদুল হক

আল্লাহ তাআলা কুরআনের হিফাযতের ওয়াদা করেছেন।.... হাদীস ও সুন্নাহর হিফাযত কুরআন মাজীদ হিফাযতের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। যেকোন বিবেকবান লোক, হোক না সে অমুসলিম, হাদীস হিফাযতের ইতিহাস ও তার উপায়-উপকরণ এবং হাদীসের সুবিশাল ভাণ্ডারের প্রতি যদি নযর দেয়, তাহলে সে উক্ত ওয়াদার সত্যতা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারবে—

'আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে আছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।'

সুতরাং কুরআন মাজীদের সাক্ষ্য এবং বাস্তবতার সাক্ষ্য— সর্বদিক থেকে এ কথা অকাট্য যে, কুরআন মাজীদ, এর অর্থ, ব্যাখ্যা ও বাস্তবরূপ (যার পারিভাষিক নাম নববি-আদর্শ এবং হাদীস ও সুন্নাহ) সবগুলোই নিশ্চিতভাবে সংরক্ষিত।

মাওলানা মুহাম্মাদ
আবদুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ

হাদীস মানতেই হবে

(পরিবর্ধিত সংস্করণ)

শায়খ ইমদাদুল হক

ইমাম ও খতীব, বাইতুল মা'মুর জামে মসজিদ, আনন্দধাম, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা

মুহতামিম, দারুস সুন্নাহ একাডেমি, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

নজরে সানী

শায়খ আবু রাফআন সিরাজ

শিক্ষক, উলূমুল হাদীস বিভাগ, মাদানীনগর মাদরাসা

হাদীস মানতেই হবে
শায়খ ইমদাদুল হক

পরিবর্ধিত সংস্করণ
রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরী, অক্টোবর ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।
দ্বিতীয় প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরী, অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।
প্রথম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪৪৪ হিজরী, অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যবস্থাপনা : মামণি প্রিন্টার্স, ০১৭৩৮৮৭৮৭৮০

অনলাইন পরিবেশক
Rokomari.com | Wafilife.com
Jazabor.com | khidmahshop.com

মূল্য : ৩১৫ টাকা

তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত
১১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা।
umedprokash@gmail.com
Phone : 01757597724

উৎসর্গ

মাওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী (রাহ.)
মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রাহ.)
ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহ.)
হাদীসে নববির তিন খাদেম।
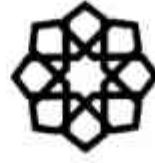
সূচিপত্র

ভূমিকা ১১

শরীআতের উৎস হিসাবে হাদীসের অবস্থান ১১

হাদীসকে ওহি অভিধায় অভিহিত করা ১৩

হাদীস অস্বীকারের ফিতনা : নবীজির ভবিষ্যদ্‌বাণী ১৭

ওহির ব্যাখ্যায় ওহি ২১

কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ২২

রাসূল কুরআন ব্যাখ্যার অথরিটি ২৪

রাসূলের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের কারণ ৩০

ওহি-ই কুরআন ব্যাখ্যার মূলসূত্র ৩১

হাদীস অস্বীকারকারীদের ভাঁওতাবাজি ৩৫

হাদীস অস্বীকারকারীই হাদীস অপরিহার্যতার প্রমাণ ৩৭

কুরআনের শব্দ ও অর্থ সংরক্ষণ ৪০

আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না ৪১

ওহির ব্যাখ্যায় ওহি : সাহাবিদের বুঝ ৪৪

নববি ভাষ্য ও সাহাবিদের বুঝ প্রত্যাখ্যানের ফল ৪৫

কুরআনের অতিরিক্ত ওহি ৫৩
কিতাব ও হিকমত ৫৩
তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি........ ৫৬
কুরআনের অতিরিক্ত ওহিতে শরয়ি বিধান ৬৭
কুরআনের অতিরিক্ত ওহিতে সংবাদ প্রদান ৬৯
হাদীসের বিধান কুরআনের স্বীকৃতি........ ৭১
শরীআত প্রণয়নে নবীজির অধিকার ৭৩
রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ-অনুকরণ ৭৬
রাসূলের আনুগত্য সর্বকালে আবশ্যক........ ৮০
কুরআন মানলেই কি রাসূলের আনুগত্য পরিপূর্ণ হয়........ ৮২
কুরআন-বহির্ভূত ওহির গুরুত্ব ও মর্যাদা ৮৩
কুরআন-বহির্ভূত ওহি নাযিলের কারণ কী........ ৮৬
কুরআনের অতিরিক্ত ওহি : সাহাবিদের বুঝ ৮৮

হাদীস সুসংরক্ষিত ৯১
হাদীস সংরক্ষণে নবীজির নির্দেশনা ৯২
পরবর্তীদের নিকট হাদীস পৌঁছানোর নির্দেশ........ ৯৭
হাদীস সংরক্ষণ ও সম্প্রচারে সাহাবিগণ........ ৯৮
প্রবীণ সাহাবিদের হাদীস অনুসরণ........ ১০৭
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা (রা.)........ ১২৩
উম্মাহর নিকট হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব ১৩৭
হাদীস লিপিবদ্ধকরণ ও প্রথম দিককার পাণ্ডুলিপি ১৪০
হাদীস সংরক্ষণ পরিপূর্ণ ও সুসম্পাদিত........ ১৪৮
হাদীস সংরক্ষণে বিশ্বাস ঈমানের দাবি........ ১৫২

হাদীস অস্বীকারের রকমফের ১৫৪
আল্লাহ কুরআনকে সহজ করেছেন ১৫৪
কুরআন ব্যাখ্যায় কুরআনই যথেষ্ট ১৫৭
আল্লাহই একমাত্র বিধানদাতা........ ১৫৯

আল কুরআনে সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা.......................... ১৬১
হাদীস মানা কুরআনের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা............... ১৬৪
সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কুরআন......................... ১৬৬
আহসানাল হাদীস : লাহওয়াল হাদীস ১৬৬
হাদীসের নামে অশ্লীল কিচ্ছা-কাহিনি.................................. ১৬৯
হাদীস লিখতে নবীজির নিষেধাজ্ঞা ১৬৯
হাদীস কি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে ১৭৩
সত্যের সাথে যখন মিথ্যা মিশে যায় ১৭৬
হাদীসশাস্ত্র অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক................................ ১৭৯
হাদীস সত্যায়ন প্রক্রিয়া অনৈসলামিক................................ ১৮৪
সহীহ সনদে জাল হাদীস.. ১৯২
প্রবীণ সাহাবিদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা কম......................... ১৯৫
হাদীসের বহুপথ, কুরআনের একপথ................................... ১৯৮
কুরআন ও হাদীসের সংঘর্ষ ১৯৯
হাদীস মানি, তবে... ২০৬
হাদীস মানি কুরআনের মানদণ্ডে....................................... ২০৮
কুরআনের অতিরিক্ত শর্তারোপ ২১৪
এসব কথা কুরআনে নেই ২১৬

উপসংহার... ২২০
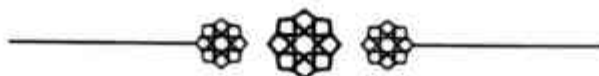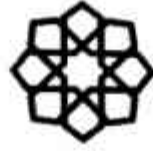
ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بَالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَبَيَّنَ أَحْكَامَهُ وَرَفَعَ إِبْهَامَهُ وَخَصَّصَ إِطْلَاقَهُ وَشَرَّحَ أَهْدَافَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ أَجْمَعِيْنَ.

শরীআতের উৎস হিসাবে হাদীসের অবস্থান

মহান আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। তিনি সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় ও প্রেমময় মাবুদ। সুতরাং একমাত্র তাঁরই অধিকার ও যোগ্যতা আছে বান্দার উপর বিধান দেবার এবং একমাত্র তাঁর বিধান ও নির্দেশনাতেই রয়েছে পরিপূর্ণ কল্যাণের নিশ্চয়তা। তিনি তাঁর বিধান ও নির্দেশনা পাঠান ওহির মাধ্যমে। ওহির ধারা শেষ হয়েছে। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ওহি তিনি নাযিল করেছেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে। এই সত্যবাদী বিশ্বস্ত নবীর মাধ্যমেই আমরা পেয়েছি ওহির জ্ঞান ও শিক্ষা। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন :

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

জেনে রাখো, নিশ্চয় আমাকে দেওয়া হয়েছে কুরআন এবং তার সাথে অনুরূপ ওহি।[১]

কুরআন মহান আল্লাহর কালাম ও কিতাব। আর তার অতিরিক্ত ওহি হাদীস বা সুন্নাহ নামে পরিচিত। অর্থাৎ ওহি দুই প্রকার : ১. কুরআন ও ২. হাদীস। এ কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নকারী সমগ্র মুসলিম উম্মাহ একমত যে, কুরআন কারীম মহান আল্লাহ প্রেরিত ওহি এবং শরয়ি বিধিবিধানের প্রধানতম দলীল। তেমনি হাদীসও ওহি এবং শরীআতের অন্যতম দলীল। এ বিষয়ের সাথে দ্বিমত পোষণকারী মুসলিম বলে গণ্য নয়।

কেননা কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হওয়ার ব্যাপারে যেভাবে আমরা অবগত হয়েছি, সেই একইভাবে অর্থাৎ আল্লাহর রাসূলের মাধ্যমে আমরা অবগত হয়েছি যে, কুরআনের অতিরিক্ত ওহি—যা হাদীস বা সুন্নাহ নামে অভিহিত—তাও মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত। নবীজির দেওয়া এই উভয় সংবাদে বিশ্বাস করা তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন এবং তাঁর সত্যবাদিতায় বিশ্বাসের অনিবার্য দাবি। কোনো ব্যক্তির দেওয়া সংবাদের একাংশের প্রতি বিশ্বাস করা আর অন্য অংশকে অবিশ্বাস করা ব্যক্তিকেই অবিশ্বাস করার নামান্তর।

অতএব আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে, হাদীসও কুরআনের মতো মহান আল্লাহ প্রেরিত ওহি, শরয়ি বিধিবিধান প্রমাণের অন্যতম উৎস এবং আমাদের জন্য তা মান্য করা অপরিহার্য।

আরেকটি জরুরি জ্ঞাতব্য, *শরয়ি বিধানের উৎস হিসাবে হাদীসের অবস্থান কুরআনের পরে*—এ সিদ্ধান্ত নীতিগতভাবে যথার্থ। তবে এ সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে যদি কেউ এ কর্মনীতি গ্রহণ করে যে, প্রথম স্তরে কোনো বিষয়ের আলোচনা পেয়ে গেলে আর দ্বিতীয় স্তরের দিকে তাকাতে হবে না। কেননা দ্বিতীয় স্তরের দিকে তাকাতে হয় কেবল প্রথম স্তরে পাওয়া না

---

১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭১৭৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৬০৪; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ১২। সামআনি (তাফসীরুস সামআনি : ২/১০১), ইবন তাইমিয়া (মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৯/৮৫, ২১/৮), ইবনুল কাইয়িম (আকসামুল কুরআন, পৃ. ২৪৯), ইবন মুফলিহ (আল আদাবুশ শারইয়্যাহ : ২/৩০৬), শাওকানি (ফাতহুল কদীর : ২/১৩৫, ৩/২২৪), আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে প্রমাণিত বলেছেন।

গেলে। আর এর ভিত্তিতে কুরআনে কোনো বিষয়ের আলোচনা পেয়ে গেলে মনে করল, সে বিষয়ে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা থেকে বিমুক্ত হয়ে গেলাম, হাদীসের দিকে আর না তাকিয়ে কুরআনে যতটুকু পেলাম এবং নিজে তার যে অর্থ বুঝলাম সেভাবেই আমল করলাম—এ কর্মনীতি মারাত্মক ভুল।

কেননা কুরআনে আলোচিত বিষয়গুলোও আমাদের বুঝতে হবে হাদীসের আলোকে এবং তার উপর আমল করতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নমুনায়। আর কুরআনে বর্ণিত বিষয়াবলির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াও কুরআন-বহির্ভূত অনেক বিষয় হাদীসে আলোচিত হয়েছে। সে সকল ক্ষেত্রে হাদীসই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ প্রকার হাদীস দ্বারা হালাল-হারামের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। দলীল-প্রমাণসহ এ বিষয়টির পর্যাপ্ত আলোচনা এ পুস্তকে উপস্থাপিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

হাদীসকে ওহি অভিধায় অভিহিত করা

মহান আল্লাহ আল কুরআন নাযিল করেছেন মানব জাতির উদ্দেশে জিবরীল আমীনের মাধ্যমে তাঁর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট। এ পুস্তকের আলোচনায় আমরা দেখব, আল কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, হাদীস নাযিলকৃত ওহি। সাহাবি-তাবিয়িগণও এমনটাই বিশ্বাস করতেন। এমনকি ‘ওহি’ অভিধাটিও কুরআন-সুন্নাহয় হাদীসের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রখ্যাত সাহাবি আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, লোকেরা বলাবলি করছে, আবু হুরাইরা বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করছে। যদি আল্লাহর কিতাবে দুটি আয়াত না থাকত আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। তারপর তিনি সূরা বাকারাহর ১৫৯ ও ১৬০ নং আয়াত দুটি তিলাওয়াত করেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُوْنَ. إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ.

‘নিশ্চয় যারা আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি ও হিদায়াত গোপন করে মানুষের জন্য কিতাবে আমি তা বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ

অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীরাও অভিশাপ করেন। তবে যারা বিরত হয়, সংশোধন করে নেয় এবং বর্ণনা করে দেয়, আমি তাদের তাওবা কবুল করে থাকি। আর আমি তো তাওবা কবুলকারী দয়ালু।'[২]

আবু হুরাইরা (রা.)-এর এ বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, তিনি হাদীসকে অবতীর্ণ ওহি হিসাবে বিশ্বাস করতেন। কেননা অবতীর্ণ ওহি গোপনের দায় থেকে বাঁচার জন্যই হাদীস বর্ণনা করেন বলে এ হাদীসে তিনি জানাচ্ছেন।

তৃতীয় খলীফা উসমান ইবন আফফান (রা.) একবার আসরের সালাতের জন্য ওযু করেন। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন,

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ مَا حَدَّثْتُكُمُوْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ يُحْسِنُ وُضُوْءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا.

শোনো, আমি তোমাদেরকে একটি হাদীস শোনাব। তবে কুরআনের একটি আয়াত যদি না থাকত আমি তোমাদেরকে হাদীস শোনাতাম না। আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযু করবে এবং সালাত আদায় করবে তার পরবর্তী সালাত পর্যন্ত সকল পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।

হাদীসটির বর্ণনাকারী উরওয়া (রাহ.) বলেন, উক্ত আয়াতটি হচ্ছে সূরা বাকারাহর ১৫৯ নং আয়াত, যে আয়াতটি আবু হুরাইরা (রা.) পূর্বের হাদীসে উল্লেখ করেছেন।[৩]

আমরা দেখছি, উসমান (রা.)-ও হাদীসকে অবতীর্ণ ওহি হিসাবে বিশ্বাস করতেন এবং ওহি গোপন করার অপরাধ থেকে মুক্তির জন্যই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন।

তাবিয়ি হাসসান ইবন আতিয়া (রাহ.) বলেন,

كَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ.

২. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১১৮, ২৩৫০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৭২৭৬।
৩. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২২৭।

জিবরীল (আ.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সুন্নাহ নিয়ে অবতীর্ণ হতেন, যেমন কুরআন নিয়ে তাঁর নিকট অবতীর্ণ হতেন। এবং তাঁকে সুন্নাহ শিক্ষা দিতেন, যেমন তাঁকে কুরআন শিক্ষা দিতেন।[৪]

তাছাড়া আল কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মহান আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত সকল বক্তব্যকেই সুস্পষ্টরূপে ওহি নামে অভিহিত করা হয়েছে—তা আল কুরআনে সংকলিত হোক বা না-হোক। ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى.

"তিনি অবতীর্ণ ওহি ব্যতীত প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না।"[৫]

এ আয়াতে দীন-শরীআত সম্পর্কিত নবীজির সকল বক্তব্যকে ওহি হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। সুতরাং হাদীসে নববি, যা ওহির দ্বিতীয় প্রকার হিসাবে অভিহিত, ওহি হিসাবে তার নামকরণ যথার্থ ও কুরআন সমর্থিত। অন্য আয়াতে আরো বলা হয়েছে :

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِإِذْنِهٖ مَا يَشَاءُ إِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ.

"কোনো মানুষের জন্য এমন হওয়ার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম, পর্দার অন্তরাল অথবা কোনো দূত প্রেরণের মাধ্যম ব্যতীত, যে দূত তিনি যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সমুন্নত প্রজ্ঞাময়।"[৬]

এ আয়াতে মানুষের নিকট মহান আল্লাহর বাণী পৌঁছানোর তিনটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। মুফাসসির ইমামগণ বলেন, 'ওহির মাধ্যম' অর্থ কোনো বক্তব্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে সরাসরি ইলহাম বা ইলকা করা। আর 'পর্দার অন্তরাল থেকে' এর স্বরূপ হলো, যেভাবে ঈসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। তৃতীয় পদ্ধতি, কোনো দূত

---

৪. নুআইম বিন হাম্মাদ, যাওয়ায়িদুয যুহদ: ২/২৩, সুনান দারিমি, হাদীস : ৬০৮; মারাসীল আবু দাউদ, হাদীস : ৫৩৬; মারওয়াযি, আস-সুন্নাহ, হাদীস : ১০২, ৪০২। বক্তব্যটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত।

৫. সূরা [৫৩] নাজম, আয়াত : ৩ ও ৪।

৬. সূরা [৪২] শূরা, আয়াত : ৫১।

অর্থাৎ জিবরীল আমীনকে প্রেরণের মাধ্যমে বার্তা পৌছানো। উম্মাতের ইজমা' ও আল কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের আলোকে প্রমাণিত যে, সমগ্র কুরআন মহান আল্লাহ মাত্র এই শেষোক্ত পদ্ধতিতে অর্থাৎ জীবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে নাযিল করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْأَمِيْنُ . عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ . بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِيْنٍ.

"এই কিতাব তো বিশ্বজগতের পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত আত্মা জিবরীল সুস্পষ্ট আরবি ভাষায় তা নিয়ে আপনার অন্তরে অবতীর্ণ হয়েছেন, যেন আপনি সতর্ককারী হন।"[৭]

অর্থাৎ মানুষের নিকট আল্লাহর বার্তা প্রেরণের যে তিনটি পদ্ধতির কথা আমাদের আলোচিত আয়াতে বলা হয়েছে তার কেবল একটি পদ্ধতিতেই কুরআন নাযিল হয়েছে। আর বাকি দুটি পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে কুরআনের অতিরিক্ত ওহি।[৮] এ দুটি পদ্ধতির একটি পদ্ধতিকে আয়াতে কারীমায় সরাসরি 'ওহি' শব্দেই উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট মহান আল্লাহর বার্তা প্রেরিত হয়েছে। উপরের আলোচনার আলোকে আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারছি যে, এ বার্তা কুরআন নয়। কেননা কুরআন তো জিবরীল আমীনের মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তাছাড়া এটি কুরআন নাযিল শুরুর আগের বিষয়। উম্মুল মুমিনীন আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) এ বার্তাকে 'ওহি' শব্দে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট ওহির সূচনা হয় ঘুমন্ত অবস্থায় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তখন তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন তা প্রভাতের আলোর ন্যায় পরিষ্কার উদ্ভাসিত হতো।[৯]

---

৭. সূরা [২৬] শুআরা, আয়াত : ১৯২-১৯৫।

৮. তাকি উসমানি, হাদীসের প্রামাণ্যতা, পৃ. ৫৩-৫৪।

৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৫২০২; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬০;

হাদীস অস্বীকারের ফিতনা : নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস *'ওহি এবং ইসলামি শরীআতের অন্যতম উৎস'* এ কথা যেমন আল কুরআনের আলোকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তেমনি সমগ্র উম্মাতে মুসলিমার নিকট স্বীকৃত—যদিও হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া না-হওয়া এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মর্ম নির্ধারণে উম্মাতের মাঝে মতভিন্নতা রয়েছে। যেমন : অল্প কিছু মানুষ বাদ দিলে পৃথিবীর সকল কাল ও ভূখণ্ডের মানুষ ধার্মিক। তারা স্রষ্টা ও পরকালে বিশ্বাসী। যদিও সঠিক ধর্ম কোনটি, ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে ধর্মে বিশ্বাসী মানুষদের মাঝে তুমুল মতভিন্নতা রয়েছে। যেহেতু ধর্ম নিয়ে এত মতভেদ সুতরাং ধর্ম বাতিল—নাস্তিকদের এ সমীকরণ সর্বৈব ভুল ও অবাস্তব।

বরং সত্য হচ্ছে, মহান আল্লাহ মানব জাতির পথপ্রদর্শনের জন্য যুগেযুগে তাঁর মনোনীত নবী-রাসূলের মাধ্যমে সত্য-সঠিক দীন বা জীবন-ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন। কিন্তু মানব জাতি জ্ঞানগত দুর্বলতা ও স্বার্থচিন্তার কারণে সঠিক দীনের উপর থাকতে পারেনি। কখনো-বা নিজের সুবিধামতো পরিবর্তন করে নিয়েছে। স্বার্থের অনুকূলে ধর্মকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু প্রবল উপস্থিতির কারণে অস্বীকার করতে পারেনি। তবে ব্যাপক বিকৃতি সত্ত্বেও মহান আল্লাহ সঠিক দীন টিকিয়ে রেখেছেন এবং অনুসন্ধানীর জন্য খুঁজে পাওয়ার রাস্তাও পরিষ্কার রেখেছেন। এমনকি নিষ্ঠার সাথে যে সত্য-সঠিক পথ পেতে প্রচেষ্টা চালাবে তাকে পথ দেখানোর দায়িত্ব পর্যন্ত তিনি নিজে নিয়েছেন।[১০]

হাদীসও তা-ই। উম্মাত তার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা নিয়ে, মর্ম নির্ধারণ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে নানান মতভেদ করেছে। কিন্তু শরীআতের দলীল হওয়ার বিষয়টি এমন সুপ্রতিষ্ঠিত, সর্বজনস্বীকৃত ও গৃহীত যে, কিছু বিভ্রান্ত লোক ছাড়া এ বিষয়টি কেউ অস্বীকার করেনি। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বিষয়টি উজ্জ্বল প্রামাণ্য ও সর্বজনস্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও কিছু মানুষ যে অস্বীকার করবে, এ ভবিষ্যদ্বাণী নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায়ই করে গেছেন। বেশ কয়েকজন সাহাবি থেকে এ মর্মে বেশ কিছু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা কিছু হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করছি :

মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৪৮৪৩।

১০. সূরা [২৯] আনকাবূত, আয়াত : ৬৯।

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْ كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوْشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلٰى أَرِيْكَتِهِ يَقُوْلُ عَلَيْكُمْ بِهٰذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوْهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيْهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوْهُ.

মিকদাম ইবন মা'দী কারিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শুনে রাখো, আমাকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহর কিতাব এবং তার সাথে আরো অতিরিক্ত তার অনুরূপ ওহি। শুনে রেখো, এমন সময়ও আসবে যখন কোনো 'পরিতৃপ্ত লোক' আপন আসনে হেলান দিয়ে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনই গ্রহণ করো। এখানে যা হালাল আছে শুধু তাকে হালাল এবং এখানে যা হারাম আছে শুধু তাকে হারাম বলে মানবে।[১১]

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَأَعْرِفَنَّ مَا بَلَغَ عَنِّيْ الْحَدِيْثُ مِنْ حَدِيْثِيْ أَمَرْتُ فِيْهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى أَرِيْكَتِهِ: هٰذَا الْقُرْآنُ فَمَا وَجَدْنَا فِيْهِ اتَّبَعْنَاهُ وَمَا لَمْ نَجِدْ فِيْهِ فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ.

আবু রাফি' (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, এমন লোক সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে রাখছি, আমার হাদীস যখন পৌঁছবে—যে হাদীসে আমি আদেশ অথবা নিষেধ করেছি—পালঙ্কে হেলান দিয়ে সে ব্যক্তি বলবে, এই তো কুরআন রয়েছে। তাতে যা পাব আমরা তার অনুসরণ করব আর যা তাতে পাব না আমাদের সেসবের কোনো প্রয়োজন নেই।[১২]

---

১১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭১৭৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৬০৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৬৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ১২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ১২। সামআনি (তাফসীরুস সামআনি : ২/১০১), ইবন তাইমিয়া (মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৯/৮৫, ২১/৮), ইবনুল কাইয়িম (আকসামুল কুরআন, পৃ. ২৪৯), ইবন মুফলিহ (আল আদাবুশ শারইয়্যাহ : ২/৩০৬) শাওকানি (ফাতহুল কদীর : ২/১৩৫, ৩/২২৪)-সহ আরো অনেক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে প্রমাণিত বলেছেন।

১২. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৩৮৬১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৬০৫; সুনান তিরমিযি,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَسٰى أَنْ يُكَذِّبَنِيْ رَجُلٌ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى أَرِيْكَتِهِ يَبْلُغُهُ الْحَدِيْثُ عَنِّيْ فَيَقُوْلُ: مَا قَالَ ذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ هٰذَا وَهَاتِ مَا فِي الْقُرْآنِ.

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অতিসত্বর এমন লোকের আবির্ভাব হবে, আমার হাদীস যখন তার কাছে পৌঁছবে, তখন আপন আসনে হেলান দিয়ে আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সে বলবে, আল্লাহর রাসূল এ কী বলেন! রাখো এসব! কুরআনে যা আছে তা-ই নিয়ে এসো।[১৩]

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَسٰى الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يَقُولَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلٰى أَرِيْكَتِهِ: مَا وَجَدْنَا فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حَلَالٍ أَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ وَإِنِّيْ أُحَرِّمُ عَلَيْكُمْ أَمْوَالَ الْمُعَاهَدِيْنَ بِغَيْرِ حَقِّهَا.

খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শীঘ্রই তোমাদের মাঝে কোনো ব্যক্তি আপন সিংহাসনে হেলান দিয়ে এ কথা বলবে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবে যা হালাল পাব তাকেই হালাল বলে মানব এবং যা হারাম বলে পাব তাকেই হারাম বলে মানব। অথচ আমি চুক্তিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়ের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা তোমাদের জন্য হারাম করে দিচ্ছি।[১৪]

এ হাদীসগুলো থেকে তিনটি বিষয় আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি : ১. হাদীস মহান আল্লাহ প্রেরিত ওহি। ওহির মাধ্যমে জেনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মাতকে ভবিষ্যতের এই ফিতনা

হাদীস : ২৬৬৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ১৩; মুসনাদুর রুওয়াইনি, হাদীস : ৭২৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ১৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩৬৮-৩৭০। হাদীসটিকে তিরমিযি, ইবন হিব্বান, হাকিম, যাহাবি, আইনি, রাফিয়ি, ইবনুল আসীর প্রমুখ মুহাদ্দিস প্রমাণিত বলেছেন।

১৩. মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস : ১৮১৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/১৫৫।

১৪. তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস : ৩৮২৯; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/১৫৫।

থেকে সতর্ক করেছেন। কারণ, আল্লাহর পক্ষ থেকে জানানো ছাড়া তিনি তো ভবিষ্যৎ জানতেন না। ২. হাদীস শরীআতে ইসলামিয়্যার অন্যতম দলীল। এবং ৩. শরয়ি ইলম বিশুদ্ধভাবে অর্জনের স্বীকৃত ঐতিহ্যগত ধারা রয়েছে। পরবর্তী প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ পূর্ববর্তী প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য ধারক-বাহক থেকে গ্রহণ ও ধারণ করবেন—যাতে ইলম সকল ধরনের বিকৃতি থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। বুঝ হয় অবিকল—যেমনটি শিক্ষা দিয়েছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আর ইখতিলাফ অন্তহীন না হয়ে বৈধতার সীমায় সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারীরা হবে এই ধারা-পরম্পরা থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিলাসী জীবনের অধিকারী। আশ্চর্যজনক বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যতিক্রম বাদে সকল যুগের হাদীস অস্বীকারকারী এমনই ছিল। হাদীস ওহি হওয়ার এটাও একটা প্রমাণ।

হাদীসের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। যদিও সর্বকালের সমগ্র উম্মাতে মুসলিমাহ হাদীসকে ওহি এবং শরীআতের দলীল হিসাবে মান্য করেছে, তবুও সর্বযুগেই মুসলিম হিসাবে দাবিকারী বিচ্ছিন্ন কিছু মানুষ হাদীস অস্বীকার করেছে। তাদের কেউ পুরোপুরি, কেউ আংশিক হাদীস অস্বীকার করে। বর্তমানে আমাদের দেশে বিভিন্ন মাধ্যমে তারা বেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছে।

আমাদের এই পুস্তকটি এইসব হাদীস অস্বীকারকারীর উদ্দেশে নিবেদিত। তারা সকলেই যেহেতু কুরআন মান্য করার দাবি করে থাকে, হাদীস মানে না, তাই আমরা হাদীসের ওহি হওয়া এবং শরীআতের দলীল হওয়ার বিষয়ে হাদীসকে দলীল হিসাবে পেশ করিনি। প্রধানত কুরআন দ্বারাই এ দুটি বিষয় প্রমাণ করা হয়েছে। তবে প্রচুর সংখ্যক হাদীস এ বইয়ে উল্লেখিত হয়েছে। মূলত আলোচ্য বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়িদের বুঝ জানা এবং ইতিহাসের সাক্ষ্য হিসাবে তা হাজির করা হয়েছে।

এখন আমরা মূল আলোচনায় প্রবেশ করব। মহান আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা।
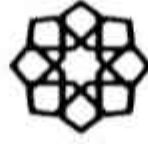
ওহির ব্যাখ্যায় ওহি

হাদীস মহান আল্লাহ প্রেরিত ওহি, শরয়ি বিধিবিধান প্রমাণের অন্যতম উৎস এবং আমাদের জন্য তা মান্য করা অপরিহার্য। সুন্নাহ বা হাদীসে রয়েছে দুই ধরনের ওহি : ১. আল কুরআনে উল্লেখিত বিধিবিধান ও অন্যান্য বিষয়-আশয়ের পুনরাবৃত্তি ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং ২. কুরআনের অতিরিক্ত বিষয়াবলি। তাই বিষয়টি আমরা দুই ভাগে আলোচনা করব।

প্রথম ভাগ : আল কুরআনে উল্লেখিত বিধিবিধান ও বিষয়-আশয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হিসাবে হাদীস। আল কুরআনে সাধারণত সকল বিধান সংক্ষিপ্তভাবে ও মূলনীতি আকারে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহ ভিন্নভাবে তাঁর রাসূলকে ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন।

কুরআন যখন নাযিল হতো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং বারবার জিহ্বা সঞ্চালন করে তা আওড়াতেন, যেন যথাযথভাবে আত্মস্থ হয়ে যায়। তখন মহান আল্লাহ বলেন :

لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ . إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ . فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ . ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.

"আপনি একে দ্রুত মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয় (আপনার হৃদয়ে) এর সংরক্ষণ ও (আপনার

মুখে) পাঠ করাবার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন (জিবরীলের মাধ্যমে) তা পাঠ করি, আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যা আমারই দায়িত্ব।"[১৫]

কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা

উপরে উল্লেখিত আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেবার দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এ ঘোষণার মাধ্যমে আল কুরআনের ব্যাখ্যার যে প্রয়োজনীতা রয়েছে তা পরিষ্কার বিবৃত হয়েছে।

কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য যদিও সহজ করা হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যেকোনো পাঠকই তার সকল বক্তব্য বিনা ব্যাখ্যায় বুঝে ফেলবে। যেমন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সকল শ্রেণির সিলেবাস প্রণয়ন করা হয় সেই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স ও মেধার উপযোগী বিষয় ও ভাষা দিয়ে—সরল, সুস্পষ্ট ও বিভিন্ন ধরনের উদাহরণসহ। তবুও সকল শিক্ষার্থী শিক্ষক ও গাইডের সাহায্য ছাড়া সকল পড়া ষোলো আনা আয়ত্ত করতে পারে না। আল কুরআনের বক্তব্যের ক্ষেত্রেও একই কথা মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ.

"এইসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করেছি, অথচ জ্ঞানীগণ ছাড়া তা অনুধাবন করতে পারে না।"[১৬]

দুটি দৃষ্টান্ত দেখুন। **১.** রমাযানের রাতে পানাহারের বৈধতার শেষ সীমা নির্দেশ করে আল কুরআনে আয়াত নাযিল হলো :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

"তোমরা পানাহার করতে পারো তোমাদের নিকট কালো সুতা (রেখা) থেকে প্রভাতের সাদা সুতা সুস্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত।"[১৭]

তখন সাহাবিদের কেউ কেউ নিজেদের কাছে কালো সুতা ও সাদা সুতা

---

১৫. সূরা [৭৫] কিয়ামাহ, আয়াত : ১৬-১৯।

১৬. সূরা [২৯] আনকাবূত, আয়াত : ৪৩।

১৭. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ১৮৭।

রেখে দেন এবং সাদা ও কালোর মধ্যে পার্থক্য দেখা না যাওয়া পর্যন্ত পানাহার করেন। তাঁদের একজন ছিলেন আদি ইবন হাতিম (রা.)। তিনি তাঁর বালিশের নিচে সুতা রেখে দেন এবং রাতে বারবার দেখেও সাদা-কালোর পার্থক্য করতে পারেন না। তিনি সকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বিষয়টি জানান। তাঁর কথা শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিয়ে রসিকতা করে বলেন, তোমার বালিশ তো অনেক প্রশস্ত! এখানে তো রাতের আঁধার আর দিনের শুভ্রতা বোঝানো হয়েছে।[১৮]

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত (দরুদ) ও সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়ে সূরা আহযাবের ৫৬ নং আয়াত নাযিল হলো :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.

> "নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী নবীর উপর সালাত পেশ করে থাকে। হে মুমিনগণ, তোমরাও তার উপর সালাত ও যথাযথভাবে সালাম পাঠ করবে।"

আয়াতটি নাযিল হলে সাহাবিগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার প্রতি সালামের পদ্ধতি তো আমরা জানি, আল্লাহ আমাদেরকে আপনার উপর সালাত (দরুদ) পাঠেরও নির্দেশ দিয়েছেন। আপনার উপর সালাত কেমন হবে? তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে শিখিয়ে দেন, কী বলে তাঁর উপর সালাত পাঠ করতে হবে।[১৯]

সাহাবিগণ ছিলেন আরব। ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাক (আ.) থেকে চলে আসা ধর্মীয় ঐতিহ্যও তাঁদের ছিল। তবুও আয়াতে বর্ণিত আমল শেখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বারস্থ তাঁদের হতে হয়েছে।

এরূপ আরো অনেক ঘটনা আছে যে, সাহাবায়ে কিরাম (রা.) আরব ও আল কুরআনের প্রথম সম্বোধিত এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১৮. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১৯১৭, ৪৫০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৯০, ১০৯১।

১৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১১৪৩৩; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৭৯৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ৯০৫; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর ১৯/১৩০, হাদীস : ১৮৭।

সাল্লামের সান্নিধ্যধন্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যাখ্যা ছাড়া তাঁরা কুরআনের বক্তব্যের সঠিক মর্ম বুঝে উঠতে পারেননি।

সুতরাং কুরআনের বক্তব্য পুরোপুরি অনুধাবন করার জন্য এবং ইসলামি শরীআতের বিধানাবলি বিস্তারিত ও বিশদভাবে জানার জন্য যে কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে এ কথা কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে এবং বাস্তবতার নিরিখেই আমরা জানতে পারছি।

রাসূল কুরআন ব্যাখ্যার অথরিটি

আমরা কুরআনের আলোকে কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা জানতে পেরেছি। মহান আল্লাহ নিজেই কুরআন ব্যাখ্যার দায়িত্ব নিয়েছেন। তবে সে দায়িত্ব পালনে তিনি কুরআনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ হিসাবে আলাদা কোনো গ্রন্থ নাযিল করেননি এবং নিজে এসেও শেখাননি—আর সেটা হবারও নয়, তা তাঁর সুউচ্চ শানের পরিপন্থী। তিনি বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁকে আদেশ করেছেন মানব জাতিকে সে ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম দায়িত্বও বটে। এ কথা আল কুরআনের একাধিক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ.

"প্রকৃতপক্ষেই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। আর যদিও তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল।"[২০]

লক্ষণীয়, এ আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের যে সকল দায়িত্বের কথা উল্লেখ করেছেন তার একটি হচ্ছে, উম্মাতের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ

২০. সূরা [৩] আল ইমরান, আয়াত : ১৬৪। আরো দেখুন, সূরা বাকারাহ : ১২৯ আয়াত ও সূরা জুমুআহ : ০২ আয়াত।

তিলাওয়াত বা আবৃত্তি করা; আরেকটি হচ্ছে, কিতাব শিক্ষা দেওয়া। নিশ্চয় আয়াত আবৃত্তি করে শোনানো আর কিতাব শিক্ষা দেওয়া এক কথা নয়। কেননা এ বিষয়ক সবগুলো আয়াতে প্রথমে আয়াত তিলাওয়াত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর আলাদাভাবে কিতাব শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাহলে কিতাব শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? বিষয়টি আল কুরআনের অন্য আয়াত দ্বারা পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"আমি আপনার নিকট উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেন, যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে; এবং যাতে তারা চিন্তা-ফিকির করতে পারে।"[২১]

এ আয়াতে কারীমায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট উপদেশগ্রন্থ নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি মানুষদের জন্য ব্যাখ্যা করে দেবেন যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ বলেছেন, 'যাতে তারা চিন্তা-ফিকির করতে পারে।' অর্থাৎ মানুষেরা কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যার আলোকে। তাঁর ব্যাখ্যা এড়িয়ে কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা এবং সে চিন্তা-ফিকির থেকে যদি এমন কোনো মর্ম বের হয়, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক, মহান আল্লাহর নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়।

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

"আমি আপনার উপর গ্রন্থ তো এজন্যই নাযিল করেছি যে, আপনি তাদেরকে সুস্পষ্ট করে দেবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করেছে; এবং তা মুমিনদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণাস্বরূপ।"[২২]

এ আয়াতেও লক্ষণীয়, মহান আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

২১. সূরা [১৬] নাহল, আয়াত : ৪৪।

২২. সূরা [১৬] নাহল, আয়াত : ৬৪।

সাল্লামের উপর গ্রন্থ নাযিলের উদ্দেশ্য হিসাবে বলেছেন যে, নবীজি মানুষদের মধ্যে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেবেন। এমনকি কুরআন বুঝতে গিয়ে কারো কোনো ভুল হলে বা মতভিন্নতা সৃষ্টি হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যার আলোকে তার সমাধান করতে হবে। সুতরাং কুরআনের ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে চূড়ান্ত ধরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক দাবিকারীর কুরআন অধ্যয়নের পথ ও পন্থা সঠিক নয়। সে হয়তো নিজে বিভ্রান্ত, নয়তো পরিকল্পিতভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী।

আল কুরআন শুধু তিলাওয়াত বা আবৃত্তির জন্য নাযিল হয়নি; বরং এ মহাগ্রন্থ নাযিলের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য অর্থ অনুধাবন ও মর্ম উপলব্ধি করা এবং তার বিধি-নিষেধ প্রতিপালন করা। অর্থাৎ কুরআন সংশ্লিষ্ট বান্দার দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে, কুরআন তিলাওয়াত করা, মর্ম অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালিত করা।

জ্ঞানীমাত্রই জানেন, ভাষার মাধ্যমে প্রদত্ত বক্তব্য তিন ধরনের জটিলতা থেকে মুক্ত থাকে না। ১. কখনো কখনো ব্যাখ্যা ছাড়া তার মর্ম অনুধাবন করা যায় না। ২. কখনো কখনো শুধু মৌখিক ব্যাখ্যার দ্বারাও বোঝা যায় না; বরং বাস্তব কর্মগত নমুনা পেশ করতে হয়। এবং ৩. কোনো কোনো বাক্যে একাধিক অর্থের অবকাশ থাকে।

ধরুন, একটি বাক্যের তিনটি অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বক্তা শুধু একটি অর্থেই বাক্যটি প্রয়োগ করেছে। অথবা তার নিকট বাক্যটির দুটি অর্থ গ্রহণযোগ্য। এখন যদি বাক্যটি আমরা তিনজন ব্যক্তির সামনে পেশ করি আর তারা তিনজন ভিন্ন ভিন্ন তিনটি অর্থ বুঝে নেয় এবং তাদের নিজ নিজ বুঝ অনুযায়ী বাক্যটির নির্দেশের উপর আমল করে তবে নিশ্চয় একজন বা দুজনের বুঝ ও কর্ম সঠিক হবে। আর বাকি একজন বা দুজনের বুঝ ও কর্ম হবে ভুল। এবং কিছুতেই বলা যাবে না যে, এরা বক্তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমল করেছে।

তাছাড়া কোনো মতলববাজ একাধিক সম্ভাবনা থেকে বা পূর্বাপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে খণ্ডিতভাবে উদ্ধৃত করে এমন অর্থও প্রচার করতে পারে, যা বক্তার উদ্দিষ্ট বা তার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও সে দাবি করবে যে, এটাই একমাত্র সঠিক অর্থ।

সুতরাং বাস্তবতারও দাবি হচ্ছে, কুরআন ব্যাখ্যার কোনো অথরিটি থাকতে হবে, যিনি লোকদেরকে কুরআনের সঠিক পাঠপদ্ধতি, অনুধাবন এবং বিশ্বাস ও কর্ম হাতেকলমে শিক্ষা দেবেন—মহান আল্লাহর যেখানে যেমন উদ্দেশ্য। উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ বিষয়ে কুরআনে আরো বহুসংখ্যক আয়াত বিদ্যমান।

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমনটি হয়ে থাকে, প্রথমে ধারণা-অনুমান করা হয়। তারপর দীর্ঘদিনের গবেষণায় একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় এবং সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল চলতে থাকে। তারপর কয়েক প্রজন্ম পর হয়তো নতুন কোনো গবেষণায় ধরা পড়ে আগের সিদ্ধান্ত আংশিক কিংবা পুরোপুরি ভুল ছিল।

কুরআন অনুধাবনের জন্যেও যদি কোনো অথরিটি না থাকে, বরং প্রত্যেককে তার নিজ নিজ বুঝের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে ব্যক্তি হয়তো আজ নিজ গবেষণালব্ধ এক বুঝের উপর আমল শুরু করল, কিছুদিন পর তার মনে হলো, পূর্বের বুঝ ভুল ছিল। এখন সে নতুন বুঝ অনুযায়ী তার বিশ্বাস ও কর্ম পরিবর্তন করে নিল। এভাবে তার গবেষণা চলতে থাকবে আর বিশ্বাস ও কর্ম নিয়ত পরিবর্তন হতে থাকবে। ইসলামি আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগি এভাবে নিছক ছেলেখেলা ও তামাশার বিষয়ে পরিণত হবে। একটা ইসলামি সমাজে দেখা যাবে সকলেই গবেষক। প্রত্যেকেই নিজ গবেষণালব্ধ বুঝের উপর আমল করছে। দেখা যাবে প্রত্যেকেরই আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদত-বন্দেগির পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। একটি আমল একেকজন একেকভাবে করছে। অথচ প্রত্যেকেরই দলীল একই আয়াত।

জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভুলের হয়তো ক্ষতিপূরণ আছে। অন্তত পক্ষে সে ক্ষতির সীমা আছে। কিন্তু হাশরের মাঠে যদি কোনো গবেষক দেখেন তার কুরআন গবেষণার সিদ্ধান্তগুলো ভুল ছিল। ভুল ছিল তার বিশ্বাস ও কর্ম। এ ভুলের কি কোনো ক্ষতিপূরণ বা সীমা আছে? মহান দয়াময় মাবুদ কি তাঁর বান্দাকে এমন দিশাহীন অনিশ্চিত অবস্থায় ছেড়ে রাখতে পারেন?

না, দয়াময় মাবুদ তাঁর বান্দাদেরকে এমন দিশাহীন অনিশ্চিত অবস্থায় ছেড়ে দেননি। তিনি তাঁর রাসূলকে দিয়ে বান্দাদেরকে এ মসিবত থেকে

উদ্ধার করেছেন। এবার সূরা আল ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতটি আবার পড়ুন। এটা মুমিনদের উপর মহান আল্লাহর এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর কিতাব শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উপর অর্পিত এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। তিনি জীবনব্যাপী তাঁর কথা, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে মানুষকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। এজন্য তাঁর জীবনই হয়ে উঠেছিল আল কুরআনের সমার্থক। আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, 'তাঁর আখলাক হলো আল কুরআন'।[২৩]

সুতরাং হাদীস অস্বীকারকারীরা যে দাবি করেন, কুরআন বোঝার জন্য হাদীসের কোনো প্রয়োজন নেই, এক্ষেত্রে নবীজির বিশেষ কোনো অথরিটি নেই, যে কেউই তা পাঠ করে বুঝতে পারবে, কেননা কুরআনকে আল্লাহ সহজ করেছেন—তাদের এ দাবি আল কুরআন ও বাস্তবতার আলোকে ভুল প্রমাণিত হলো।

হাদীস অস্বীকারকারী কেউ কেউ অবশ্য বলেন, কোনো বিষয়ে কুরআনে বর্ণিত তথ্যগুলো সামনে রেখে ব্যক্তি যখন সে ক্ষেত্রে আল্লাহর উদ্দেশ্য বুঝতে চেষ্টা করে তখন তার কাছে যেটা সঠিক মনে হবে সে অনুযায়ীই আমল করবে। সেটাই তার জন্য আল্লাহর বিধান। কেননা আল্লাহ দেখেন নিয়ত ও প্রচেষ্টা।

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভুল ও বাতিল। কেননা সদিচ্ছা ও নিয়তের বিশুদ্ধতার দাবি হচ্ছে সাধ্যমতো চেষ্টা করা। আর সাধ্যমতো প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে কোনো বিষয় যথাযথভাবে বুঝতে ও সঠিক বুঝ পেতে চাইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অভিজ্ঞ মানুষের শরণাপন্ন হওয়া। এটা আল কুরআনেরও নির্দেশনা। মহান আল্লাহ বলেন :

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"তোমরা না জানলে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো।"[২৪]

জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার জন্য এ নীতি প্রযোজ্য। কোনো শাস্ত্রই এর

---

২৩. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৪৬০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭৪৬।

২৪. সূরা [১৬] নাহল, আয়াত : ৪৩; সূরা [২১] আম্বিয়া', আয়াত : ০৭।

ব্যতিক্রম নয়। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তিই এর ব্যতিক্রম দাবি করেন না। কোনো ছাত্র যদি কোনো শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞের পাঠ গ্রহণ না করে এবং পরীক্ষার খাতায় নিজের ব্যক্তিগত আন্তরিক প্রচেষ্টার ভুল বুঝ লিখে দিয়ে আসে কোনো যুক্তিতেই কি সে মার্ক পাওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে?

কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, কুরআন বুঝতে হবে নবীজির কাছ থেকে এবং কুরআনের বিধানের উপর আমল করতে হবে নবীজির নমুনায়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বিভিন্ন আমল উল্লেখ করে করে বলেছেন, তোমরা এ বিষয়টি আমার কাছ থেকে শিখে নাও, এ আমলটি আমার অনুকরণে এভাবে আদায় করো। যেমন হজ্জ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

خُذُوْا عَنِّيْ مَنَاسِكَكُمْ لَعَلِّيْ لَا أَرَاكُمْ بَعْدَ عَامِيْ هٰذَا.

তোমরা আমার কাছ থেকে হজ্জের নিয়মাবলি শিখে নাও। সম্ভবত এ বছরের পর তোমাদের সাথে আমার আর দেখা হবে না।[২৫]

সালাত আদায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.

তোমরা সালাত আদায় করবে যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখলে।[২৬]

নবীজির অনুকরণে তাঁর সুন্নাহ মোতাবেক ইবাদত পালন করা এতটাই অপরিহার্য যে, এর ব্যতিক্রম করে ইবাদত পালন করাকে তিনি ইবাদত পালন বলেই গ্রহণ করেননি। এক ব্যক্তি নবীজির উপস্থিতিতে সালাত আদায় করে তাঁকে সালাম দিল। তিনি উত্তর দিয়ে বললেন, যাও, আবার সালাত আদায় করো; তুমি সালাত আদায় করোনি। এভাবে সে ব্যক্তি তিনবার সালাত আদায় করল। নবীজি তিনবারই তাকে বললেন, তুমি সালাত আদায় করোনি। অবশেষে তিনি নিজেই তাকে সালাত আদায়ের পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন।[২৭]

---

২৫. বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস : ৯৫২৪; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ৩/২৮৫। হাদীসটি কাছাকাছি শব্দে মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ি প্রমুখ ইমাম বর্ণনা করেছেন।

২৬. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৬৩১; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ৫/৫৭৬।

২৭. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৯৬৩৫; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৭৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৩৯৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৮৫৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩০৩।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারছি, কুরআন নবীজি যেভাবে বুঝেছেন এবং যেভাবে পালন করেছেন আমাদেরকেও সেভাবে বুঝতে হবে এবং পালন করতে হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের বিপরীতে হাদীস অস্বীকারকারী অর্বাচীনদের এই দাবির কী মূল্য আছে যে, কুরআন নিজে পড়ে যে যা বুঝবে সেভাবে পালন করলেই তা আল্লাহর বিধান পালন বলে গণ্য হবে?

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস শাফিয়ি (রাহ.) বলেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের বক্তব্যে আল্লাহর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাতা—কোন বিধানটি ব্যাপক আর কোনটি বিশেষ তার নির্ধারক। আল্লাহ তাঁর কিতাবে সুন্নাহকে হিকমাহর সাথে সংযুক্ত করেছেন এবং কিতাব শব্দটির অব্যবহিত পরেই তার উল্লেখ করেছেন। এ অধিকার আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টিতে তাঁর রাসূল ছাড়া আর কাউকে দেননি।[২৮]

রাসূলের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের কারণ

উপরের আলোচনার মাঝে এ বিষয়টিও পরিষ্কাররূপে বিবৃত হয়েছে। সূরা নাহলের উল্লেখিত ৪৪ ও ৬৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি রাসূলের মধ্যস্থতায় কুরআন এজন্যই নাযিল করেছেন যে, তিনি মানুষদের জন্য এ কিতাব ব্যাখ্যা করবেন আর মানুষ সে অনুযায়ী কিতাব বুঝবে ও তার বিধান প্রতিপালন করবে। আল কুরআনের বক্তব্যের আলোকে এ কথাও বোঝা যায় যে, রাসূল কর্তৃক মানুষের জন্য কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজন না হলে রাসূলের মাধ্যমে কুরআন নাযিলেরও দরকার পড়ত না। সুতরাং যারা কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে রাসূলের ব্যাখ্যা অর্থাৎ হাদীস অস্বীকার করে, তারা রাসূলের মাধ্যমে কুরআন নাযিলের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে চায়।

সূরা নাহলের উপর্যুক্ত আয়াত উল্লেখ করে মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রাহ.) [১৯৮৭ খ্রি.] লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য কথা এই যে, জনগণের সম্মুখে কুরআনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাই রাসূলের প্রতি কুরআন নাযিল করার আসল উদ্দেশ্য। বস্তুত কোনো

---

২৮. শাফিয়ি, আর রিসালাহ, পৃ. ৭৩।

বিষয়কে সঠিকরূপে ও পূর্ণাঙ্গভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তিনটি কাজ একান্ত অপরিহার্য :

প্রথমত, মুখের কথা দ্বারা তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা, আলোচনার মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপ উদ্‌ঘাটন করা। দ্বিতীয়ত, নিজ জীবনের কাজকর্ম ও বাস্তব জীবনধারার সাহায্যে তার ব্যবহারিক মূল্য ও গুরুত্ব উজ্জ্বল করে তোলা। তৃতীয়ত, লোকদের দ্বারা তাকে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করার জন্য চেষ্টা করা, সঠিকরূপে তারা তার মর্মার্থ অনুধাবন ও অনুসরণ করছে কিনা সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা, যাচাই ও পরীক্ষাকার্যে আত্মনিয়োগ করা এবং সঠিকরূপে কার্যকর হতে দেখলে তাকে সমর্থন ও অনুমোদন দান করা আর কোনোরূপ ভুলভ্রান্তি বা ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে তার সংশোধন করা।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কুরআন নাযিল হওয়ার এ উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছে যে, তিনি কুরআনকে এ তিনটি দিক দিয়ে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করে জনসম্মুখে তুলে ধরবেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তেইশ বছরের নবুওয়াতি জীবনে এ দায়িত্ব পূর্ণমাত্রায় ও যথাযথভাবে পালন করেছেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি যা কিছু বলেছেন বা করেছেন তার নির্ভরযোগ্য রেকর্ড হচ্ছে হাদীস।[২৯]

ওহি-ই কুরআন ব্যাখ্যার মূলসূত্র

উপরের আলোচনায় আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে আমাদের কাছে এ বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে যে, কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে, আর এ ব্যাখ্যার অথরিটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ জন্যই তাঁর মাধ্যমে কুরআন নাযিল হয়েছে, উম্মাত রাসূলের কাছ থেকে ব্যাখ্যা শিখে নেবে এবং সে অনুযায়ী বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম পরিচালিত করবে। এবং এ কথাও আমরা জানতে পেরেছি যে, রাসূল সে ব্যাখ্যা কেবল নিজের ধারণা অনুযায়ী মনগড়াভাবে করবেন না; বরং মহান আল্লাহর দেওয়া শিক্ষার আলোকে করবেন। আর আল্লাহ নিজেই তাঁকে ব্যাখ্যা শেখানোর ওয়াদাও করেছেন। এছাড়া অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

---

২৯. আবদুর রহীম, হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ৭৯-৮০।

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا.

"নিশ্চয় আমি আপনার নিকট সত্যসহ কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের মাঝে ফায়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে প্রদর্শন করেছেন তার আলোকে। আপনি খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বী হবেন না।"[৩০]

অর্থাৎ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই কুরআন ব্যাখ্যা করতে হয়েছে ওহির মাধ্যমে। আল্লাহ প্রদর্শিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি কুরআন মোতাবেক ফায়সালা করেছেন। তাহলে একজন সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞানহীনভাবে নিজের বুঝ অনুযায়ী মনগড়া ব্যাখ্যা করা কীভাবে বৈধ হতে পারে?

কোনো ব্যক্তির প্রদত্ত বক্তব্যের যে অংশের ব্যাখ্যা প্রয়োজন তার সঠিক মর্ম কেবল তিনিই জানেন। তাই কথা ও কর্মের মাধ্যমে তার দেওয়া ব্যাখ্যাই কেবল যথার্থ। অন্যের করা ব্যাখ্যায় ভুলের সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। তাই আল কুরআনের নির্ভুল মর্ম উপলব্ধির জন্য স্বয়ং মহান আল্লাহর ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সে কাজটি মহান আল্লাহ করেছেন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে। তাই উম্মাতকে রাসূলের ব্যাখ্যা অনুযায়ীই কুরআন বুঝতে হবে। নিজেদের বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্ম সে অনুযায়ীই পরিচালিত করতে হবে। এমনকি পরবর্তীদের জন্য কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে তাঁর ব্যাখ্যার আলোকেই ব্যাখ্যা করতে হবে।

হাদীস অর্থাৎ ওহির নির্দেশনা বাদ দিয়ে নিজের বুঝ অনুযায়ী কুরআন বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে গেলে তা যেমন হতে পারে ভুল বুঝ ও অপব্যাখ্যা, তেমনি ক্ষেত্রবিশেষে আল্লাহর প্রতি অপবাদ আরোপও। কেননা এতে ব্যক্তির বুঝ ও ব্যাখ্যা আল্লাহর উদ্দিষ্ট মর্মের সম্পূর্ণ বাইরে চলে যেতে পারে। তখন তা হবে আল্লাহর নামে এমন কথা আরোপ করা যা তিনি কখনো বলেননি এবং কোনো বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্যও নেননি। এটা যেমন পথভ্রান্ত হওয়ার কারণ, তেমনি মারাত্মক অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন :

৩০. সূরা [৪] নিসা, আয়াত : ১০৫।

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ.

"তার চেয়ে বড় জালিম আর কে, যে ব্যক্তি জ্ঞানহীনভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথের দিশা দেন না।"[৩১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার অধিক বড় জালিম আর কে? জালিম কখনোই সফল হয় না।"[৩২]

এ অর্থে আরো অসংখ্য আয়াত বিদ্যমান। এ সকল আয়াতের ব্যাখ্যায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ওহির ইলম ব্যতীত কুরআনের ব্যাখ্যা করবে নিজের মনগড়া তার ঠিকানা জাহান্নাম। ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ (بِغَيْرِ عِلْمٍ) فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তি ইলম ব্যতীত নিজের মত অনুযায়ী কুরআনের বিষয়ে কথা বলবে সে যেন জাহান্নামকে নিজের ঠিকানা হিসাবে জেনে রাখে।[৩৩]

জুনদুব ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ.

---

৩১. সূরা [৬] আনআম, আয়াত : ১৪৪।

৩২. সূরা [৬] আনআম, আয়াত : ২১।

৩৩. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২০৬৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৯৫০, ২৯৫১; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস : ২৫৮৫। ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন; ইবন কাত্তান সহীহ বলেছেন।

যে ব্যক্তি কুরআন বিষয়ে নিজের ধারণা অনুযায়ী কথা বলবে, তার কথা সঠিক হলেও ভুল বলে গণ্য হবে।[৩৪]

দীনের বিষয়ে অনুমান করে বলা কথা সঠিক হলেও এই কর্মটি ভুল ও অপরাধ বলে গণ্য। কেননা দীনের নামে কোনো কিছু বলার অর্থ হচ্ছে বক্তব্যটি মহান আল্লাহর বলে দাবি করা। আর আল্লাহর নামে কেবল নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতেই কথা বলা বৈধ। এক্ষেত্রে ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে কিছু বলাটাই মারাত্মক অপরাধ। এতে মহান আল্লাহ ও তাঁর দীন ছেলেখেলায় পরিণত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَتَّخِذُوْا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا.

"তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে খেল-তামাশার বিষয়ে পরিণত কোরো না।"[৩৫]

মহান আল্লাহ আরো বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ.

"(হে নবী) আপনি বলে দিন, আমার প্রতিপালক প্রকৃতপক্ষে হারাম করেছেন : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, গোনাহ, অন্যায় সীমালঙ্ঘন, আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন করা—যার দলীল তিনি নাযিল করেননি—এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলা যা তোমরা জানো না।"[৩৬]

আল কুরআনের কোনো আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার অর্থ হচ্ছে, উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহর উদ্দিষ্ট মর্ম ব্যক্ত করা। সুতরাং নিশ্চিত জ্ঞান ছাড়া নিজের ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে কুরআনের ব্যাখ্যা করা মানে আল্লাহর নামে না জেনে কথা বলা। নিশ্চিত জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত

---

৩৪. সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৫২; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৯৫২; শুআবুল ইমান, হাদীস : ২০৮১।

৩৫. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ২৩১।

৩৬. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত : ৩৩।

ওহির জ্ঞান। কেননা কেবল মহান আল্লাহই জানেন আল কুরআনের কোন বক্তব্যে তাঁর উদ্দিষ্ট মর্ম কী? তিনি তাঁর নবীকে সে মর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। আর নবী উম্মাতকে শিখিয়েছেন। সুতরাং নববি ব্যাখ্যা বা হাদীস পরিত্যাগ করে কুরআন বুঝতে যাওয়া ও ব্যাখ্যা করা আল্লাহর নামে এমন আন্দাজে কথা বলা যা তিনি সুস্পষ্টরূপে হারাম করেছেন। এ কাজ যারা করে তারা আল্লাহর সুস্পষ্ট নির্দেশ অমান্য করে শয়তানের নির্দেশ প্রতিপালন করে। মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ . إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

"হে লোকসকল, তোমরা জমিনের বৈধ পবিত্র জিনিস ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো তোমাদেরকে আদেশ করে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহর নামে এমন কথা বলতে, যা তোমরা জানো না।"[৩৭]

সুতরাং যারা কুরআন বোঝায় ও ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে অস্বীকার করে, তারা মহান আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধু ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে। আর মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধু-অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করল, সে প্রকাশ্য ক্ষতির মধ্যে নিপতিত হলো।"[৩৮]

হাদীস অস্বীকারকারীদের ভাঁওতাবাজি

কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—হাদীস অস্বীকারকারীদের এ দাবিটি যে একটা অবাস্তব ভাঁওতাবাজি, এ কথা তারা নিজেরাও বোঝেন। দাবিটি

---

৩৭. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ১৬৮-১৬৯।

৩৮. সূরা [৪] নিসা, আয়াত : ১১৯।

তারা কুরআনের আলোকে প্রমাণ করতে চান। কুরআনের কিছু আয়াত তারা এর স্বপক্ষে উল্লেখ করেন। তারপর আয়াত দ্বারা কীভাবে দাবিটি প্রমাণিত হয় তা বোঝাতে ঘন্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করেন বা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখতে থাকেন।

আমাদের কথা হচ্ছে, কুরআনের সবকিছু যদি এত সহজ হয় যে, যে কেউ পড়েই সবকিছু বুঝে ফেলবে, তাহলে তারা তাদের দাবির পক্ষে একটি দুটি আয়াত উদ্ধৃত করে আয়াত দ্বারা কীভাবে দাবি প্রমাণিত হলো তা বোঝানোর জন্য কেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা করেন? কেন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা লিখতে থাকেন? আয়াত বলে দিলেই তো মানুষের বুঝে নেওয়ার কথা! তবে কি তারা বলতে চান, কুরআন বোঝার জন্য ব্যাখ্যা তো লাগবে, তবে সে ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার তাদের, আল্লাহর রাসূলের কোনো অধিকার নেই? এ থেকেই কি তাদের মতলববাজি সুস্পষ্ট হয় না?

আল কুরআন আল্লাহর বাণী। এ বাণী তিনি জিবরীল (আ.)-এর মাধ্যমে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাযিল করেছেন এবং তাঁকে এর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন ও মানব জাতিকে শেখানোর দায়িত্ব দিয়েছেন, যা আমরা উপরের আলোচনায় দেখেছি। হাদীস অস্বীকারকারীরা মহান আল্লাহর উদ্দিষ্ট বিশুদ্ধ এই ব্যাখ্যা থেকে বিচ্যুত করে নিজেদের মতলব-মতো ব্যাখ্যা গিলিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায়। নিজেদের মনমতো কুরআন বিকৃতির পথে হাদীস বাধা বলেই তারা হাদীসের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। অন্যথায় আয়াতের ব্যাখ্যা তো তারাও করেন।

তাই আমাদেরকে থাকতে হবে ওই শরীআতের উপর, মহান আল্লাহ যা আমাদেরকে দিয়েছেন তাঁর রাসূলের মাধ্যমে। অজ্ঞ-বিভ্রান্তদের মনগড়া কোনো মতাদর্শের উপরে নয়। মহান আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"অতঃপর (হে নবী) আমি আপনাকে দীনের এক বিশেষ শরীআতের উপর রেখেছি। সুতরাং আপনি তারই অনুসরণ করুন। আর যারা প্রকৃত জ্ঞান রাখে না তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।"[৩৯]

---

৩৯. সূরা [৪৫] জাসিয়াহ, আয়াত : ১৮।

হাদীস অস্বীকারকারীই হাদীস অপরিহার্যতার প্রমাণ

আমরা দেখছি, কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে এবং সে ব্যাখ্যা হতে হবে ওহির আলোকে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত কুরআনের অতিরিক্ত ওহির মাধ্যমে কুরআনের যথার্থ ব্যাখ্যা উম্মাতকে শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তী উম্মাত সে ব্যাখ্যার আলোকে কুরআন বুঝেছে এবং ব্যাখ্যা করেছে। সে জন্য তারা আল কুরআনে মহান আল্লাহর উদ্দিষ্ট মর্ম অনুধাবন করতে পেরেছে এবং সে অনুযায়ী বিশ্বাস ও কর্ম পরিচালিত করতে সক্ষম হয়েছে। এ কারণে হাদীসকে বর্জন করে নিজের বুঝ ও ধারণা অনুযায়ী কুরআন বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে চাইলে সে বুঝ হবে ভুল এবং ব্যাখ্যা হবে অপব্যাখ্যা এবং মহান আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ।

জুমহূর উম্মাত এ মতের উপরই আছে। তবে নিজেকে মুসলিম বলে দাবিকারী কিছু লোক—যারা নিজের জ্ঞানবুদ্ধির উপর প্রচণ্ডরূপে আস্থাশীল—তারা দাবি করেন, কুরআন বোঝার জন্য কুরআনের বাইরের কিছুরই প্রয়োজন নেই, শুধু নিজের বুদ্ধি-প্রজ্ঞা আর কমনসেন্স দিয়েই যথার্থভাবে কুরআন বোঝা সম্ভব। এরা 'আহলে কুরআন', 'মুনকিরীনে হাদীস' বা 'হাদীস অস্বীকারকারী' নামে পরিচিত।

আমরা তাদের কুরআন বোঝার নমুনার দিকে তাকালে দেখতে পাব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির আলোকে কুরআনের যে আয়াতের যে মর্ম বুঝেছেন, উম্মাতের জুমহূর উলামা যে মর্ম গ্রহণ করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বুঝ এর সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরোধী। আমরা কিছুতেই নবীজি ও জুমহূর উম্মাতের বিপরীতে এই কতিপয় অর্বাচীন বিভ্রান্ত লোকের বুঝকে সঠিক বলতে পারি না। অর্থাৎ আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে চাই, যেখানেই তারা জুমহূর উম্মাতের খেলাফ করেছে সেখানে নিশ্চিত ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছে।

এই সমস্ত লোক—যারা নিজেদের বুঝবুদ্ধিকে সর্বাধিক আস্থাযোগ্য আশ্রয় মনে করেন—হাদীস বর্জন করে কুরআন বুঝতে গিয়ে তাদের যখন এই দশা, তবে কি তাদের এই হালত এ কথা প্রমাণ করে না যে, নির্ভুলরূপে কুরআন বুঝতে নবীজির হাদীস অপরিহার্য? জি, এ জন্যই আমরা বলি, হাদীস অস্বীকারকারীই কুরআন বুঝতে হাদীস অপরিহার্য হওয়ার অন্যতম প্রমাণ।

তাদের এই যে দাবি, *কুরআনই যথেষ্ট, কুরআনের বাইরে কিছুরই দরকার নেই*—এই কথা নাকি তারা কুরআনের কিছু আয়াত থেকেই বুঝেছেন। অথবা আমরা বলতে পারি, তাদের এ দাবির পক্ষে তারা কুরআনের কিছু আয়াত পেশ করে থাকেন। এ দাবির পক্ষে তাদের উদ্ধৃত কিছু আয়াত আমরা দেখে নিই :

১. সূরা [২৯] আনকাবূত, আয়াত-৫১ :

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

"তাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তাদের কাছে আবৃত্তি করার জন্য আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি? নিশ্চয় তাতে রয়েছে করুণা এবং মুমিনদের জন্য উপদেশ।"

২. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত-৩ :

اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.

"তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো, তাকে বাদ দিয়ে অন্যসব অভিভাবকের অনুসরণ কোরো না। তোমরা কমই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো।"

৩. সূরা [১০] ইউনুস, আয়াত-১৫ :

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

"যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে আবৃত্তি করা হয়—যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না—তখন তারা বলে, এটি ব্যতীত অন্য কোনো কুরআন নিয়ে এসো, অথবা একে বদলে দাও। আপনি বলে দিন, আমি নিজের পক্ষ থেকে তা

বদলানোর অধিকার রাখি না। আমার নিকট যা ওহি হয় আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে তো আমি এক কঠিন দিবসের শাস্তির ভয় করি।"

৪. সূরা [৬] আনআম, আয়াত-১৫৫ :

وَهٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.

"এটি এক কল্যাণময় গ্রন্থ, তা আমি নাযিল করেছি। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে। তাতে করুণাপ্রাপ্ত হবে।"

প্রথমত, আমরা দেখব এই চারটি আয়াত থেকে কোনোভাবেই প্রমাণিত হয় না যে, হাদীস মানতে হবে না। প্রথম আয়াতটি নাযিল হয়েছে কাফিরদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে। তারা কিছু নিদর্শন অবতরণের দাবি জানিয়েছিল। এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাদের জবাব দিয়ে বলেছেন যে, নিদর্শন হিসাবে কুরআনই যথেষ্ট। হাদীস মান্য করা না-করার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এর আগের আয়াতটি পড়লেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, একমাত্র আল্লাহর নাযিলকৃত ওহির অনুসরণ করতে হবে। আমরা দেখেছি, কুরআন দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট প্রমাণিত যে, হাদীসও নাযিলকৃত ওহি। সুতরাং এ দুটি আয়াত হাদীস অস্বীকার তো দূরের কথা, বরং কুরআন ও হাদীস উভয়ই অনুসরণের নির্দেশ প্রদান করে।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাবের অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি, আল্লাহর কিতাবে তাঁর নবীর প্রতি নাযিলকৃত কুরআনের অতিরিক্ত ওহিরও আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। সুতরাং এই আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী কিতাবের অনুসরণ করতে হলে কিতাবের নির্দেশ মোতাবেক হাদীস মান্য করতে হবে।

অর্থাৎ হাদীসের বিপরীতে তাদের উল্লেখকৃত এ চারটি আয়াতের কোনোটিই হাদীস অস্বীকারের ক্ষেত্রে তাদের মতাদর্শের দলীল নয়। তাদের পেশকৃত বাকি দলীলগুলোর অবস্থাও এর থেকে ভিন্ন নয়।

দ্বিতীয়ত, এ সকল আয়াত থেকে তারা যে মর্ম বুঝেছে তা আল্লাহর রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিগণ (রা.)-সহ জুমহূর উম্মাতের বুঝের বিপরীত। তাদের এ বিভ্রান্তির কারণ কী? কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কুরআনের মালিক মহান আল্লাহ কুরআনের অতিরিক্ত যে ওহি নাযিল করেছেন, যার ভিত্তিতে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেকোনো আয়াতের বক্তব্যের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর উদ্দিষ্ট মর্ম কী তা উম্মাতকে শিক্ষা দিয়েছেন, ওহির এই দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ হাদীসকে অস্বীকার করাই তাদের বিভ্রান্তির কারণ। হাদীস অস্বীকার করার কারণে তাদের এই যে বিভ্রান্তি, এটাও প্রমাণ করে যে, কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীস অপরিহার্য।

কুরআনের শব্দ ও অর্থ সংরক্ষণ

মহান আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন। তিনি বলেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

> "নিশ্চয় আমি এই উপদেশগ্রন্থ নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।"[৪০]

আমরা আগেই আলোচনা করেছি, আল কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্য নাযিল হয়নি। বরং অর্থ অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী বিশ্বাস ও কর্মকে পরিচালনা করাও তার অন্যতম মৌলিক দাবি। সুতরাং আল কুরআন সংরক্ষণ মানে শুধু তার শব্দের সংরক্ষণ নয়; বরং অর্থ ও মর্মেরও সংরক্ষণ। কেননা অর্থ ও মর্মের সংরক্ষণ ছাড়া তো তার দাবি অনুযায়ী বিশ্বাস ও কর্মকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

তাছাড়া এ আয়াতে অর্থ ও মর্ম সংরক্ষণের দিকে বিশেষভাবে ইঙ্গিতও করা হয়েছে। আয়াতটিতে আল কুরআনকে 'যিকির' শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। যিকির কুরআনের একটি নাম। এর অর্থ উপদেশ। আর উপদেশও শুধু শব্দ দ্বারা হয় না। বরং অর্থ অনুধাবন ও মর্ম উপলব্ধি করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং শব্দ ও অর্থ উভয় সংরক্ষণই এ আয়াতের ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া যদি শুধু শব্দ সংরক্ষণ করা হয় আর অর্থ বিকৃতির পথ খোলা রাখা হয় তবে সংরক্ষিত হওয়ার অর্থই অর্থহীন বলে গণ্য হয়।

---

৪০. সূরা [১৫] হিজর, আয়াত : ০৯।

দেখা যাবে, কুরআনের শব্দের তো সঠিক আবৃত্তি চলছে, কিন্তু কুরআনের উপর আমলের নামে যা চলছে তার সাথে মহান আল্লাহর চাওয়ার কোনো মিল নেই।

অথরিটি হিসাবে কথা ও কর্মের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল কুরআনের প্রয়োজনীয় স্থানের মর্ম বুঝিয়েছেন, হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন এবং একাধিক সম্ভাবনাময় অর্থের মধ্য থেকে আল্লাহর উদ্দিষ্ট ও তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য অর্থ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এবং অন্যরা আল কুরআন পড়ে যা বুঝেছেন তার গ্রহণযোগ্য অংশকে তিনি অনুমোদন করেছেন। এভাবে কথা, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল কুরআনের যে ব্যাখ্যা করেছেন তা মহান আল্লাহই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন এবং উম্মাতকে শিখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছেন। নবীজির এই কথা, কর্ম ও অনুমোদন হাদীস বা সুন্নাহর উল্লেখযোগ্য অংশ। কুরআনের সঠিক অর্থ সংরক্ষণের জন্য যা সংরক্ষণ করা অতিশয় জরুরি। এ ছাড়া কুরআন সংরক্ষণের অর্থ অর্থপূর্ণ হয় না।

কেননা আমরা দেখেছি, এ সকল হাদীস যদি সংরক্ষণ করা না হয় এবং কুরআন বোঝার জন্য তা মানতে বাধ্য করা না হয়—বরং প্রত্যেককে যার যার ইচ্ছামতো কুরআন বুঝে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়—তবে তো কুরআনের অর্থ বিকৃতির নানান দরজা খুলে যাবে। যার যেমন ইচ্ছা কুরআনের ব্যাখ্যা করবে—না-বুঝ ব্যাখ্যা, ভুল ব্যাখ্যা, মতলবি ব্যাখ্যা আরো কত কী! সুতরাং হাদীস ও সুন্নাহর এই অংশটি সংরক্ষণ করা কুরআন সংরক্ষণে মহান আল্লাহর ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। কেননা হাদীস-সুন্নাহর এই অংশ সংরক্ষণের মাধ্যমেই কুরআনের বাণীতে আল্লাহর উদ্দিষ্ট ও অনুমোদিত অর্থ সংরক্ষিত হয়।

আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করেন না

মহান আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের ওয়াদা করেছেন। উপরের আলোচনায় আমরা নিশ্চিত হয়েছি, কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই এ ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহর শান ওয়াদা রক্ষা করা। তিনি মুসলিম উম্মাহকে কুরআন সংরক্ষণে এমন কর্মযোগ দান করেছেন, যা পৃথিবীতে অপূর্ব ও অনন্য এবং অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর জন্য এক বিপুল বিস্ময়।

আল কুরআনের তিলাওয়াত সংরক্ষণের জন্য কিরাআত ও তাজবীদ সংক্রান্ত কিছু শাস্ত্র গড়ে উঠেছে। যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য পৃথিবীর সকল কাল ও ভূখণ্ডের মানুষ যেন কুরআন ঠিক সেভাবে তিলাওয়াত করতে পারে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে। যেভাবে জিবরীল আমীন (আ.)-এর কাছ থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখেছেন। যেভাবে তিনি সাহাবিদেরকে শিখিয়েছেন। এভাবে কুরআনের পাঠ ও পঠন সংরক্ষিত হয়েছে। যেকোনো কালের, যেকোনো ভূখণ্ডের যেকোনো মানুষ চাইলে এ শাস্ত্র ও শাস্ত্রজ্ঞের সহযোগিতায় হুবহু সেভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম হবে যেভাবে তা নাযিল হয়েছে।

কুরআনের অর্থ ও মর্ম, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবিদেরকে শিখিয়েছেন, তাও হাদীসশাস্ত্রের মাধ্যমে যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে। এর মাধ্যমে পৃথিবীর যেকোনো দেশ ও কালের মানুষ কুরআনের যেকোনো আয়াতের সেই মর্ম বুঝতে পারবে যা মহান আল্লাহর উদ্দিষ্ট, যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহির মাধ্যমে জেনেছিলেন ও বুঝেছিলেন, যা তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে শিখিয়েছিলেন।

কুরআনের যে অংশের মর্ম কর্মগত নমুনার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার দরকার ছিল, সাহাবিগণ (রা.) যা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মের মাধ্যমে শিখেছিলেন, পরবর্তীদেরকেও তো তা কর্মগত নমুনার মাধ্যমেই শিখতে হবে। মহান আল্লাহ আল কুরআনের এই কর্মগত ব্যাখ্যাকেও সংরক্ষণ করেছেন। উম্মাতের প্রত্যেক প্রজন্ম তার পূর্ব প্রজন্মের কর্মের মাধ্যমেই এইসব ব্যাখ্যা শিখে আসছে। এরপরও কোনো ভুলভ্রান্তির অনুপ্রবেশ ঘটলে তা পরিশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَتَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ.

এই ইলমকে বহন করবে প্রত্যেক উত্তর-প্রজন্মের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গ। তারা সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার ও মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে ইলমকে পরিচ্ছন্ন রাখবে।[৪১]

---

৪১. তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস : ৩৮৮৪; ইবন আদি, আল কামিল : ১/২৪৭-২৪৯;

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا.

আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে সংস্কারক পাঠান। যিনি তাদের জন্য দীনকে সংস্কার করেন।[৪২]

ওয়াদা মোতাবেক মহান আল্লাহ এভাবেই আল কুরআনের সকল দিক অবিকল সংরক্ষণ করেছেন। তিনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তাঁর নিজের সম্পর্কে তিনিই তো যথার্থ বলতে পারেন। তিনি বলেছেন :

وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

"এটা আল্লাহর কৃত ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"[৪৩]

আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَّمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا.

"আল্লাহর ওয়াদা যথার্থ। আর কে আছে আল্লাহর থেকে অধিক সত্যবাদী।"[৪৪]

ইবন আব্দিল বার্‌র, আত তামহীদ, ১/৫৯। সালাহুদ্দীন আলায়ি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমাদ সহীহ বলেছেন। কাসতাল্লানি বলেছেন, হাদীসটির সকল সনদেই দুর্বলতা রয়েছে। তবে একাধিক সনদ একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। সুতরাং হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত, যেমনটি আলায়ি বলেছেন। এছাড়াও একাধিক হাদীস বিশারদ হাদীসটি দিয়ে দলীল দিয়েছেন। বিস্তারিত দেখুন : আলায়ি, বুগয়াতুল মুলতামিস,পৃ. ৩৪-৩৫; ইবনুল মুলাক্কিন, আল বাদরুল মুনীর ১/২৫৯; ইরাকি, আত তাকয়ীদ, পৃ. ১৩৮; কাসতাল্লানি, ইরশাদুস সারি ১/৪; সানআনি, ফাতহুল গাফফার, ৪/২১৮৫; আলী মুত্তাকি, কানযুল উম্মাল, ১০/১৭৬।

৪২. সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪২৯১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৮৫৯২; বাইহাকি, মা'রিফাতুস সুনান : ১/২০৮। হাদীসটিকে ইরাকি (ফায়যুল খাতীর : ২/২৮২), ইবন হাজার (তাওয়ালিত তা'সীস, পৃ. ৪৯), সাখাবি (আল মাকাসিদুল হাসানাহ : ২৩৮), ইবনুদ দাইবা' (তাময়ীযুত তয়্যিব, পৃ. ৩৮)-সহ আরো অনেকে প্রমাণিত বলেছেন।

৪৩. সূরা [৩০] রূম, আয়াত : ০৬।

৪৪. সূরা [৪] নিসা, আয়াত : ১২২।

ওহির ব্যাখ্যায় ওহি : সাহাবিদের বুঝ

প্রখ্যাত তাবিয়ি হাসান বাসরি (রাহ.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশিষ্ট সাহাবি ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) আমাদেরকে নবীজির সুন্নাহ বর্ণনা করছিলেন। তখন এক লোক বলে উঠল, আমাদেরকে কুরআনের কথা বলুন। তখন ইমরান (রা.) বললেন, তুমি আর তোমার সাথিরা তো খুব কুরআন পড়ো! সালাত ও হদের বিস্তারিত বিধিবিধান কি তুমি আমাকে শিখিয়েছিলে? স্বর্ণ, উট, গাভি এবং অন্যান্য সম্পদের যাকাত কেমন হবে তা কি তুমি আমাকে বর্ণনা করেছিলে? করোনি। যখন এসব বর্ণনা করা হচ্ছিল তখন আমি উপস্থিত ছিলাম, তুমি নও। তারপর তিনি বলেন :

فَرَضَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الزَّكَاةِ كَذَا وَكَذَا.

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতের ক্ষেত্রে এই এই বিষয় আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন।' তাঁর কথা শুনে লোকটি বলে, আপনি আমার মাঝে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়েরাখুন।[৪৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, সাহাবি ইমরান ইবন হুসাইন (রা.) একটি জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, আপনি কুরআন থেকে বলুন। আপনারা আমাদেরকে এমন হাদীসও বলেন যার কোনো ভিত্তি আমরা কুরআনে পাই না। এ কথায় ইমরান (রা.) রেগে গেলেন। বললেন, তুমি তো দেখছি বড় আহম্মক। তুমি কি আল্লাহর কিতাবে পেয়েছ যে, জুহরের সালাত চার রাকআত এবং তাতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়া যায় না? এভাবে তিনি তাকে সব ওয়াক্তের সালাত ও যাকাতের নিসাব ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর তিনি বললেন,

أَتَجِدُ هٰذَا فِيْ كِتَابِ اللهِ مُفَسَّرًا؟ إِنَّ كِتَابَ اللهِ أَبْهَمُ هٰذَا وَإِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ ذٰلِكَ.

---

৪৫. তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, ১৮/১৬৫, হাদীস : ৩৬৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩৭২; নাদরাতুন নাঈম, ৭/২৯৭০। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবি তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

তুমি কি এসব কিছু আল্লাহর কিতাবে ব্যাখ্যা-সংবলিত বিস্তারিত পেয়েছ? পাওনি। হ্যাঁ, আল্লাহর কিতাব এমনই সংক্ষিপ্ত। রাসূলের সুন্নাহ তাকে ব্যাখ্যা করেছে।[৪৬]

কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে এমনই ছিল সাহাবিদের স্বীকৃতি ও মান্যতা। এ বিষয়ে এমনই ছিল তাঁদের আকীদা-বিশ্বাস। আর আমাদেরকে তাঁদের মতো ঈমান-আকীদা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ.

"তোমরা ঈমান আনো যেমন ঈমান এনেছে ওইসব লোকেরা।"[৪৭]

নববি ভাষ্য ও সাহাবিদের বুঝ প্রত্যাখ্যানের ফল

যুগে যুগে মহান আল্লাহ মানব জাতির হিদায়াতের জন্য নবী-রাসূল (আ.) প্রেরণ করেছেন। তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের উম্মাত পথ হারিয়ে ফেলেছে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তাঁর উম্মাতও পথ হারিয়ে বহুধা বিভক্ত হয়ে যাবে। এইসব দল-উপদলের মধ্যে শুধু তারাই হকের উপর টিকে থাকতে পারবে যারা তাঁর ও তাঁর সাহাবিদের পথের উপর থাকবে। হাদীস শরীফে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلٰى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلٰى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً قَالُوْا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

বনি ইসরাঈল ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সকলেই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ছাড়া। সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই দলটি কারা? তিনি বললেন,

---

৪৬. আজুররি, আশ শারীআহ, হাদীস : ৯৮; খতীব বাগদাদি, আল ফকীহ আল মুতাফাক্কিহ: ১/২৩৬। হাদীসটি কিছুটা ভিন্নতাসহ আরো বিস্তারিতভাবেও বর্ণিত হয়েছে। দেখুন : সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ১৫৬১; আল মু'জামুল কাবীর : ১৮/২১৯; আল ইবানাতুল কুবরা : ১/২৩৩।

৪৭. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ১৩।

আমি ও আমার সাহাবিগণ যে মতের উপর আছি।[৪৮]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে। তাঁর ইন্তিকালের পর সাহাবিদের যুগ থেকে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি শুরু হয়। বিভ্রান্তরা বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভ্রান্তি ও বিভক্তির বিস্তারিত ইতিহাস ও কার্যকারণ বর্ণনা ও পর্যালোচনার অবকাশ এ পুস্তকে নেই। আমরা শুধু বিভ্রান্তির একটি কারণের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব।

এই সকল বিভ্রান্ত উপদলগুলোর মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে ভয়ংকর সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনাকারী খারিজি সম্প্রদায়। তাদের বিভ্রান্তির অন্যতম প্রধান কারণ কুরআন ও ইসলাম বোঝার ক্ষেত্রে নববি ব্যাখ্যা ও সাহাবিদের বুঝ প্রত্যাখ্যান করা।

আলী (রা.) ইয়ামান থেকে মাটি মিশ্রিত কিছু স্বর্ণ প্রেরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে উক্ত স্বর্ণ চারজন নওমুসলিম আরব নেতার মধ্যে বণ্টন করে দেন। এতে উপস্থিতির মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—কেন তিনি সকল যোদ্ধাকে না দিয়ে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে মাত্র চারজনকে দিলেন! প্রশ্ন করে এটা জেনে নেওয়ার অধিকারও তাদের আছে।

কিন্তু খারিজি সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুজন যুল খুওয়াইসিরার মনে কোনো খটকা জাগে না। তিনি বুঝে নেন যে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্যায় বণ্টন করেছেন। আর নিজের বুঝকেই চূড়ান্ত সঠিক ধরে নিয়ে নবীর সামনে 'নাহি আনিল মুনকার' করে বসেন,

يَا رَسُوْلَ اللهِ اتَّقِ اللهَ [وَاللهِ مَا عَدَلْتَ].

হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহর কসম, আপনি ন্যায়বিচার করলেন না।[৪৯]

---

৪৮. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৩১; লালাকায়ি, শরহু উসুলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, হাদীস : ১৪৫-১৪৭। লালাকায়ি, জাওরাকনি (আল আবাতীল : ২৮৩), বাগাবি (শারহুস সুন্নাহ : ১/২১৩), ইরাকি (তাখরীজুল ইহয়া', পৃ. ১১৩৩) সাখাবি (আল আজবিবাতুল মারযিয়্যাহ : ১৪৭) মুহাম্মাদ তাহির পাট্টানি (তাযকিরাতুল মাওযূআত, পৃ. ১৫) প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে প্রমাণিত বলেছেন।

৪৯. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৩৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৬৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৭৬৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ২৬৫৯।

এ ঘটনা যখন সংঘটিত হয় তখনও খারিজি সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেনি। তবে এই ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্য থেকে একটি বিভ্রান্ত দলের উদ্ভব ঘটবে মর্মে ভবিষ্যদ্‌বাণী করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئِ هٰذَا قَوْمٌ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ رَطْبًا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْنِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

এই ব্যক্তির অনুগামীদের মধ্য থেকে একদল মানুষ বের হবে, যারা সর্বদা হৃদয়গ্রাহীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করবে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না। তারা দীন থেকে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকারের দেহ ভেদ করে বের হয়ে যায়।[৫০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ভবিষ্যদ্‌বাণীতে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, যে কেউ কেবল অধিকহারে কুরআন অধ্যয়ন করলেই সঠিক বুঝ পাবে না এবং সঠিক পথে চলতেও পারবে না। বরং সে দীন থেকে সম্পূর্ণ বের হয়েও যেতে পারে। এ হাদীস থেকে আমরা এ কথাও জানতে পারছি যে, তাদের এ পরিণতির অন্যতম কারণ নিজের বুঝকে সঠিকতার চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করা এবং তার আলোকে নবীর বুঝকে শরীআত-বিরোধী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা—কুরআন ও হাদীসের মাঝে সংঘর্ষ আবিষ্কার করা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মুখোমুখি দাঁড় করানো।

৩৫ হিজরিতে ইসলামি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান খলীফা উসমান (রা.) কতিপয় বিদ্রোহীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। তারপর আলী (রা.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এ সময় উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের বিচার করার আগে মুআবিয়া (রা.) আলী (রা.)-এর আনুগত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। আলী (রা.)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার আগে বিদ্রোহীদের বিচার শুরু করলে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পেতে পারে। কাজেই আগে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এ মতভিন্নতার ফলে সিফফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। একপর্যায়ে উভয় পক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য একটি সালিশি মজলিস গঠন করে।

---

৫০. প্রাগুক্ত।

এ সময় আলী (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্য থেকে কয়েক হাজার মানুষ তাঁর দল ত্যাগ করে। ইসলামের ইতিহাসে এদেরকে খারিজি অর্থাৎ দলত্যাগী বা বিদ্রোহী বলা হয়। তারা দাবি করে যে, একমাত্র কুরআনের আইন ও আল্লাহর বিধান ছাড়া কিছুই চলতে পারে না। কেননা আল্লাহ বলেছেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ.

"হুকুম শুধুই আল্লাহর।"[৫১]

তারা বলেন, মুআবিয়া (রা.)-এর দল সীমালঙ্ঘনকারী। কাজেই আত্মসমর্পণ না করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। এ বিধান আল্লাহ তাআলার। সুতরাং আত্মসমর্পণের আগেই যুদ্ধ থামানো বা এ বিষয়ে মানুষকে সালিশ বানানো আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের বিরোধিতা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْءَ إِلٰى أَمْرِ اللّٰهِ.

"মুমিনদের দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। তবুও যদি একটি দল অন্য দলের উপর সীমালঙ্ঘন করে, তাহলে যারা সীমালঙ্ঘন করছে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে আসে।"[৫২]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ.

"আর যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান ফায়সালা বিচার করে না, তারা কাফির।"[৫৩]

এ সকল আয়াত উল্লেখ করে খারিজিরা দাবি করেন যে, আলী, মুআবিয়া (রা.) ও তাঁদের অনুসারীগণ সকলেই কুরআন অমান্য করে কাফির হয়ে গেছেন। এরপর তারা তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন।

---

৫১. সূরা [৬] আনআম, আয়াত : ৫৭; সূরা [১২] ইউসুফ, আয়াত : ৪০ ও ৬৭।
৫২. সূরা [৫৯] হুজুরাত, আয়াত : ০৯।
৫৩. সূরা [৫] মায়িদাহ, আয়াত : ৪৪।

সাহাবিদের অনেকেই তাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, আল্লাহর কালাম বোঝার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পারঙ্গম হলেন আল্লাহর রাসূলের সাহাবাগণ। কেননা কুরআন তাঁদের সামনে নাযিল হয়েছে এবং তাঁরা সরাসরি নবীজির কাছ থেকে এর মর্ম জেনেছেন। সাহাবিদের বুঝের বিপরীতে তোমরা কুরআনের যে মর্ম বুঝেছ তা সঠিক হতে পারে না। বরং তোমাদের বুঝের বিপরীতে তাঁদের ব্যাখ্যাই সঠিক।

আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইরের সময় খারিজি সম্প্রদায়ের দুজন লোক ইবন উমার (রা.)-এর কাছে এসে বলেন, মানুষেরা শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর আপনি নবীর সাহাবি, কেন যুদ্ধে বের হচ্ছেন না? তিনি বলেন, আমি যুদ্ধে বের হচ্ছি না, কেননা আল্লাহ আমার ভাইয়ের রক্ত হারাম করেছেন। তখন তারা বলেন, আপনি এ কথা বলছেন, কেন আল্লাহ কি যুদ্ধের নির্দেশ দিয়ে বলেননি :

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ.

"এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকো, যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং দীন কেবল আল্লাহর জন্য হয়।?"[৫৪]

তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) তাদেরকে বলেন :

قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ وَكَانَ الدِّيْنُ لِلهِ وَأَنْتُمْ تُرِيْدُوْنَ أَنْ تُقَاتِلُوْا حَتَّى تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِغَيْرِ اللهِ.

আমরা যুদ্ধ করেছিলাম, তাতে ফিতনা দূরীভূত হয়েছিল এবং আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আর তোমরা চাও যে, তোমরা যুদ্ধ করবে যাতে ফিতনা প্রতিষ্ঠিত হয় আর দীন আল্লাহর ছাড়া অন্যের হয়ে যায় (অর্থাৎ তোমাদের এ-জাতীয় কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর দীন নয়, বরং ফিতনাই প্রতিষ্ঠিত হবে)।[৫৫]

সাহাবিদের এভাবে বোঝানোর কারণে কিছু মানুষ উগ্রতা ত্যাগ করলেও বাকিরা তাদের নিজেদের মতকেই সঠিক বলে গণ্য করতে থাকে। এবং সাহাবিদেরকে দালাল, আপসকামী ও অন্যায়ের সহযোগী ইত্যাদি

৫৪. সূরা [৮] আনফাল, আয়াত : ৩৯।

৫৫. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৫১৩।

আখ্যায়িত করে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের হাতে খলীফাতুল মুসলিমীন আলী (রা.)-সহ অসংখ্য মুসলিম শাহাদত-বরণ করেন।

এই খারিজি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ সদস্য ছিল যুবক। এদের ধার্মিকতা ও সততা ছিল অতুলনীয়। রাতদিন নফল সালাতে দীর্ঘ সিজদার কারণে তাদের কপালে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তাদের ক্যাম্পের পাশ দিয়ে গেলে কেবল কুরআন পাঠের আওয়াজই কানে আসত। কুরআন পাঠ করলে বা শুনলে তারা কাঁদতে কাঁদতে বেহুঁশ হয়ে যেত। ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক।[৫৬]

এতৎসত্ত্বেও তারা কেন এভাবে বিভ্রান্ত হয়ে গেল! উপরের আলোচনায় এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। তারা কুরআন ও ইসলাম বোঝার ক্ষেত্রে সাহাবিদের বুঝকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের বুঝকেই চূড়ান্ত গণ্য করেছে। এতে তারা সঠিক মর্ম বুঝতে না পেরে ভুল বুঝে, এক স্থানের বিষয় অন্য স্থানে প্রয়োগ করে ভ্রান্ত পথে চলে গেছে। আলী (রা.) তাদের বিভ্রান্তির কারণ উল্লেখ করে বলেছেন :

قـومٌ أصابَتْهم فِتْنَةٌ فَعَمُوْا وَصَمُّوْا.

এই সম্প্রদায় (নিজ মতের পূজার) ফিতনায় নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়েগেছে।[৫৭]

আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেছেন :

إِنَّهُمُ انْطَلَقُوْا إِلَى آيَاتٍ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

যে সকল আয়াত কাফিরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এরা সে সকল আয়াত নিয়ে মুমিনদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে।[৫৮]

---

৫৬. খারিজিদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন : ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ : একটি পর্যালোচনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬ (লেখক, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ.)। আরো দেখুন :

الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل , الخوارج نشأتهم، فرقهم، صفاتهم والرد على أبرز عقائدهم للدكتور سليمان بن صالح الغصن.

৫৭. ইবনুল আসীর, আন নিহায়াহ, ২/১৪৯; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক : ১৮৬৫৬; ইবন আব্দুল বার্‌র, আত তামহীদ : ২৩/৩৩৫।

৫৮. ইবন আব্দুল বার্‌র, আত তামহীদ : ২৩/৩৩৪, ৩৩৫। সহীহ বুখারিতে (৯/১৬) তা'লীকান

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে বলেছেন :

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ يَتَسَلَّلُوْنَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

"(হে লোকসকল) তোমরা নিজেদের ক্ষেত্রে রাসূলের আহ্বানকে তোমাদের পারস্পরিক আহ্বানের মতো মামুলি বিষয় মনে করবে না। আল্লাহ যথার্থই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা বিভিন্ন বাহানায় সটকে পড়ে। সুতরাং যারা তার নির্দেশের বিরুদ্ধগামী হয় তারা যেন শঙ্কিত হয়—তারা ফিতনায় নিপতিত হতে পারে অথবা তাদের পাকড়াও করতে পারে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"[৫৯]

জি, আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণই তাদের ফিতনাগ্রস্ত ও বিভ্রান্ত হওয়ার মূল কারণ। তারা কুরআন বুঝতে রাসূলের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেনি। তাঁর ব্যাখ্যাকে তারা তাদের নিজেদের ব্যাখ্যার মতো মামুলি মনে করেছে, যা অন্যের জন্য মান্য করা আবশ্যক নয়। যা দুনিয়াতে তাদেরকে ফিতনাগ্রস্ত করেছে আর আখিরাতে অপেক্ষা করছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

তাদের এ বিভ্রান্তি এমন মারাত্মক ফিতনা যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশকিছু হাদীসে উম্মাতকে তাদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এমনকি এ কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, আমি তাদেরকে পেলে হত্যা করব, তোমরাও তাদেরকে পেলে হত্যা করবে। তিনি বলেছেন :

لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُوْدَ (قَتْلَ عَادٍ).

আমি তাদেরকে পেলে হত্যা করে নির্মূল করব যেভাবে সামূদ বা আদ জাতিকে হত্যা করে নির্মূল করা হয়েছে।[৬০]

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন :

আসারটি উল্লেখ করা হয়েছে। ইবন হাজার এর সূত্রকে সহীহ বলেছেন। দেখুন : তাগলীকুত তা'লীক : ৫/২৫৯; ফাতহুল বারি : ১২/২৮৬।

৫৯. সূরা [২৪] নূর, আয়াত : ৬৩।

৬০. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৩৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৬৪।

فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

তোমরা তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। কেননা যে তাদেরকে হত্যা করবে তার জন্য কিয়ামতের দিন এই হত্যার প্রতিদান রয়েছে।[৬১]

জনৈক মহাপণ্ডিত তার লেখা ও বক্তৃতায় অনর্গল বলে চলেছেন, *মুসলিম বিশ্বে ধর্মীয় উগ্রতা সৃষ্টির কারণ হাদীস। কুরআনকে সিন্দুকে তুলে রেখে হাদীসের তালীম দিয়েই উগ্রবাদী জঙ্গি ও আত্মঘাতী খুনি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।*

কিন্তু উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম, মুসলিম বিশ্বের এই প্রথম ভয়ংকর সন্ত্রাসী খারিজি গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে মূলত হাদীসের বুঝ গ্রহণ না করে নিজের মতো করে কুরআন বুঝতে গিয়ে। এখনকার চিত্রও এর থেকে ভিন্ন নয়। বাস্তবতা হচ্ছে, উগ্রতার জন্য কুরআন-হাদীস নয়, বরং দায়ী হচ্ছে অজ্ঞতা—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) হয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় চলে আসা স্বীকৃত তুরাসি বুঝকে প্রত্যাখ্যান করা।

৬১. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৩৬১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৬৬।

কুরআনের অতিরিক্ত ওহি

আল কুরআনে আলোচিত বিধিবিধানের বাইরেও অতিরিক্ত ওহি মহান আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর নাযিল করেছেন। আল কুরআনেও তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করছি।

কিতাব ও হিকমত

আল কুরআনের বেশকিছু আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের দায়িত্ব-কর্তব্যের কথা আলোচনা করেছেন। সেসব দায়িত্বের মধ্যে দুটি হচ্ছে, মানব জাতিকে 'কিতাব' শিক্ষা দেওয়া এবং 'হিকমত' শিক্ষা দেওয়া। যেমন একটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.

"তিনি উম্মিদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও তারা ইতঃপূর্বে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।"[৬২]

---

৬২. সূরা [৬২] জুমুআহ, আয়াত : ০২।

এই কিতাব এবং হিকমত উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলের নিকট অবতীর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

"আর আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত নাযিল করেছেন।"[৬৩]

তিনি আরো বলেন :

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ.

"তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তোমাদেরকে উপদেশ দানের জন্য তোমাদের উপর যে কিতাব ও হিকমত তিনি নাযিল করেছেন তা স্মরণ রেখো।"[৬৪]

এই কিতাব এবং হিকমত নাযিল করে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ করেছেন তিনি যা কিছু নাযিল করেছেন তা মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিতে এবং তাদেরকে তা শিক্ষা দিতে। তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ.

"হে রাসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দিন।"[৬৫]

অর্থাৎ উম্মাত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত দুটি জিনিস পেয়েছে : কিতাব ও হিকমত। কিতাব হচ্ছে আল কুরআন। আর কুরআনের বাইরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত যা কিছু উম্মাতের কাছে সংরক্ষিত আছে ইসলামের পরিভাষায় সেগুলোকে একত্রে হাদীস বা সুন্নাহ বলা হয়।

আল কুরআনে বারবার আল্লাহর প্রতি ঈমানের নির্দেশের সাথে সাথে রাসূলের প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ উল্লেখিত হয়েছে। তেমনি বারবার আল্লাহর আনুগত্যের নির্দেশের সাথে সাথে রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর এ সকল আয়াতে বারবার কিতাবের সাথে সাথে

---

৬৩. সূরা [৪] নিসা, আয়াত : ১১৩।
৬৪. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ২৩১।
৬৫. সূরা [৫] মায়িদাহ, আয়াত : ৬৭।

হিকমত নাযিল হওয়া এবং কিতাব শিক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে হিকমত শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের বিধান কীভাবে আদায় হবে? আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, অর্থাৎ এই কিতাব ও হিকমত মান্য করার মাধ্যমে।

ঈমান ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে যেমন বলা যায় না যে, আল্লাহ এবং রাসূল আলাদা নয়, বরং একই, আল্লাহর উপর ঈমান আনলেই এবং তাঁর আনুগত্য করলেই রাসূলের উপর ঈমান আনা এবং আনুগত্য করা হয়ে যায়। তেমনি যা মান্য করার মাধ্যমে এই বিধান আদায় হবে সেই কিতাব ও হিকমতও আলাদা। কিতাব হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন আর হিকমত হচ্ছে রাসূলের সুন্নাত। 'কুরআন-বহির্ভূত ওহি নাযিলের কারণ কী' শিরোনামের আলোচনায় আমরা দেখব, রাসূলের আনুগত্যের পরীক্ষা দিতে হয় কুরআনের অতিরিক্ত ওহির বিধান মান্য করার মাধ্যমেই।

আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত এই বিষয়টির ব্যাখ্যাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ।[৬৬]

এই বিষয়টি উল্লেখ করলে কেউ কেউ বলেন, কিতাব ও হিকমত আলাদা বিষয় নয়। বরং কিতাবই হিকমত। কেননা আল কুরআনের অনেক স্থানে কিতাব বা কুরআনকে হাকীম বা হিকমতপূর্ণ বলা হয়েছে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পেলাম, তাদের এ দাবি সঠিক নয়। কুরআন অবশ্যই হাকীম বা হিকমতপূর্ণ গ্রন্থ। তবে এ সকল আয়াতে বর্ণিত কিতাব ও হিকমত আলাদা। কেননা এ বিষয়ক প্রত্যেকটি আয়াতে কিতাব ও হিকমত আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখিত।

আল কুরআনে তো মহান আল্লাহকেও হাকীম বা প্রজ্ঞাময় বলা হয়েছে।

---

৬৬. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ১৮৭৪।

তিনি অবশ্যই হাকীম বা প্রজ্ঞাময়। তাই বলে কি আমরা বলতে পারি মহান আল্লাহ আল কুরআনের সমার্থক? তিনি ও তাঁর প্রেরিত কিতাব আল কুরআন এক ও অভিন্ন?

তাছাড়া তাদের বুঝের বিপরীতে রয়েছে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা। আমরা কিছুতেই মহান আল্লাহ নিয়োজিত ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যার বিপরীতে এসব ব্যক্তির বুঝ গ্রহণ করতে পারি না।

তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি

উপরের আলোচনায় কুরআনে বর্ণিত কিতাব ও হিকমতের ব্যাখ্যায় আমরা ইমাম মালিক কর্তৃক মুআত্তায় সংকলিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস উল্লেখ করেছি— *তোমাদের কাছে দুটি জিনিস রেখে গেলাম, তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে ধরে রাখবে কিছুতেই পথভ্রষ্ট হবে না, তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ।*

এই হাদীসের '*এবং তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ*' অংশটি মিথ্যাচার বলে দাবি করে জনৈক পণ্ডিত লিখেছেন, *নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের ভাষণে কুরআন এবং সুন্নাহ বা হাদীস অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন বলে প্রতিষ্ঠিত জনমত আছে। কিন্তু বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে হাদীসের সর্বোচ্চ ডিগ্রি কামেল বা মাস্টার্স অব হাদীসের সিলেবাসভুক্ত ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ [বুখারি, মুসলিম, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি, ইবন মাজাহ], এমনকি হাদীসের এনসাইক্লোপিডিয়া মুসনাদ আহমাদেও এ অংশটুকু নেই। সিহাহ সিত্তাহে দুটি সহীহ হাদীস আছে, যাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিদায় হজ্জের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। তাতে সংশ্লিষ্ট অংশে কেবল আল্লাহর কিতাব অনুসরণের কথা বলা আছে।... ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত মুসলিম ও আবু দাউদ শরীফে বাংলায় লেখা আছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে বলেছেন কেবল আল্লাহর কিতাব অনুসরণ করলে আমরা পথভ্রষ্ট হব না। কিন্তু আমাদের শোনানো হয় উল্টা কথা। লক্ষাধিক সাহাবির উপস্থিতিতে দেওয়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঐতিহাসিক ভাষণ নিয়ে*

যারা মিথ্যা বলে বা সত্য গোপন করে তারা আমাদের হাজার বছর আগের হাদীস বর্ণনাকারীদের সত্যবাদিতার গ্যারান্টি-ওয়ারেন্টি দিচ্ছেন।

উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, এই পণ্ডিত মহাশয়ের হাদীসশাস্ত্রের প্রাথমিক জানাশোনাও নেই। কোনো বিশেষ গ্রন্থে থাকা না-থাকার সাথে হাদীস বিশুদ্ধ হওয়া না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহ পূরণ করলেই কেবল সহীহ বলে গণ্য হয়, তা যে কিতাবেই থাকুক। কোনো বিশেষ কিতাবে থাকা বা কোনো ব্যক্তি বিশেষের দাবি যথেষ্ট নয়। শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করার মানসে 'সহীহ' শিরোনামে পুস্তক প্রণয়ন করেছেন ইমাম বুখারি, মুসলিম, ইবন খুযাইমা, ইবন হিব্বান (রাহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিস ইমাম। কিন্তু তাঁরা প্রচেষ্টা করেছেন আর দাবি করেছেন বলেই মুসলিম উম্মাহ বিনা বিচারে তাঁদের কথা মেনে নেননি। তাঁদের পর শত শত মুহাদ্দিস ইমাম তাঁদের কিতাবের সকল হাদীস বারবার শাস্ত্রীয় মূলনীতির আলোকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এভাবে তারা নিশ্চিত হয়েছেন ইমাম বুখারি ও মুসলিমের দাবি যথার্থ এবং তাঁদের প্রচেষ্টা সফল। উম্মাত যে বলে, বুখারি-মুসলিমে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ, এটা এ কারণে নয় যে, এ গ্রন্থদ্বয় ইমাম বুখারি ও মুসলিম সংকলন করেছেন। বরং এ কারণে যে, এ উভয় কিতাবের হাদীস শাস্ত্রীয় নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং এ কারণেই ইবন খুযাইমা ও ইবন হিব্বানের সকল হাদীস উম্মাত বিশুদ্ধ বলে মেনে নেয়নি।

তাছাড়া বিশুদ্ধ হাদীস কোনো একক বা কিছু নির্বাচিত গ্রন্থে সীমাবদ্ধ নয়। কোনো সংকলক বা নিরীক্ষক মুহাদ্দিস ইমাম তা দাবিও করেননি। ইমাম বুখারি ও মুসলিম দাবি করেছেন তাদের কিতাবে তারা কেবল সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। কিন্তু তারা এ দাবি করেননি যে, এর বাইরে আর কোনো সহীহ হাদীস নেই। সুতরাং কোনো হাদীস যদি শাস্ত্রীয় শর্তসমূহ পূরণ করে তবে তা সহীহ বলে গৃহীত হবে, যে কিতাবেই থাক না কেন।

এবং এ কথাও হাদীসশাস্ত্রের ছাত্রমাত্রই জানেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা পূর্ণাঙ্গ হাদীস বলেন না। বরং কখনো কখনো অংশবিশেষ বলেন, শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু বলেই থেমে যান। কখনো পরবর্তী বর্ণনাকারীদের কেউ কেউ সংক্ষেপ করেন। সুতরাং কোনো বর্ণনায় কোনো অংশ না থাকা

মানেই এ নয় যে, সে অংশ মিথ্যা বা ভুল। বরং এই অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রেও হাদীসশাস্ত্রে সুনির্ধারিত নীতিমালা আছে।

তাছাড়া আমাদের উদ্ধৃত হাদীসটিতে এ কথা নেই যে, তা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জে বলেছেন। হতে পারে তিনি অন্য কোনো সময় এ হাদীসটি বলেছেন। তাই বিদায় হজ্জের হাদীসগুলোতে উদ্দিষ্ট অংশটুকু না থাকাতে তার অস্তিত্ব সন্দেহযুক্ত হয়ে যায় না। তাছাড়া বিদায় হজ্জের ভাষণে নবীজি শুধু আল্লাহর কিতাবের কথা বলে থাকলেও তাতে সুন্নাহর অনুসরণ নাকোচ হয়ে যায় না। কারণ কুরআন-সুন্নাহয় এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, একই বিধানের এক অংশ আজ এখানে বলা হয়েছে, আর তার বাকি অংশ অন্য কোনো সময়ে অন্য কোথাও বলা হয়েছে।

আমরা হাদীসটি উদ্ধৃত করেছি ইমাম মালিকের মুআত্তা গ্রন্থ থেকে। এখন আমরা দেখব হাদীসশাস্ত্রে মুআত্তা মালিকের অবস্থান কী এবং উদ্ধৃত হাদীসটির মান সম্পর্কে শাস্ত্রজ্ঞ মুহাদ্দিস ইমামদের মতামত কী? এ বিষয়ক আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায়, ইনশাআল্লাহ, স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এ বর্ণনার উদ্দিষ্ট অংশটুকু অসত্য বা মিথ্যাচার নয়; বরং সুপ্রমাণিত নববি বাণী। এ বিষয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব না, শুধু কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ ইমামের বক্তব্য উদ্ধৃত করব। মহান আল্লাহ তাওফীক দাতা।

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইদরীস শাফিয়ি (রাহ.) বলেছেন :

مَا مِنْ كِتَابٍ أَكْثَرُ صَوَابًا بَعْدَ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ كِتَابِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ يَعْنِي الْمُوَطَّأَ.

মহান আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের পর ইমাম মালিক ইবন আনাসের মুআত্তার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ কিতাব আর নেই।[৬৭]

কাযি আবু বাকর ইবনুল আরাবি (রাহ.) বলেছেন :

اَلْمُوَطَّأُ هُوَ الْأَصْلُ الْأَوَّلُ وَاللُّبَابُ وَكِتَابُ الْبُخَارِيِّ هُوَ الْأَصْلُ الثَّانِي فِيْ هٰذَا الْبَابِ وَعَلَيْهِمَا بَنَى الْجَمِيْعُ.

---

৬৭. জাওহারি, মুসনাদুল মুআত্তা, বর্ণনা নং ৭৭; আবু নুআইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ৬/৩২৯।

মুআত্তা হলো প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উৎস। এবং বুখারির কিতাব এ বিষয়ে দ্বিতীয় উৎস। বাকি সব এ দুটির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[৬৮]

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতি (রাহ.) বলেছেন :

مَا مِنْ مُرْسَلٍ فِي الْمُوَطَّأِ إِلَّا وَلَهُ عَاضِدٌ أَوْ عَوَاضِدُ فَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُوَطَّأَ صَحِيْحٌ كُلُّهُ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ.

মুআত্তায় সংকলিত সকল মুরসাল বর্ণনার এক বা একাধিক সমর্থক বর্ণনা আছে। সুতরাং বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, মুআত্তা পুরোটাই বিশুদ্ধ। একটি বর্ণনাও এর ব্যতিক্রম নয়।[৬৯]

শায়খ সালিহ ইবন মুহাম্মাদ ফুল্লানি (রাহ.) বলেছেন :

فَظَهَرَ بِهٰذَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُوَطَّأِ وَالْبُخَارِيِّ وَصَحَّ أَنَّ مَالِكًا أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيْحِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ الْعَرَبِيِّ الْقَاضِي وَالسُّيُوْطِيُّ وَمُغْلَطَايْ وَغَيْرُهُمْ.

(মুআত্তার সনদ-বিচ্ছিন্ন বর্ণনার পর্যালোচনা শেষে তিনি বলেন) সুতরাং পরিস্ফুট হলো যে, মুআত্তা ও বুখারির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। বিশুদ্ধ কথা এই যে, ইমাম মালিকই প্রথম বিশুদ্ধ হাদীসের পুস্তক সংকলন করেন। যেমনটি বলেছেন, ইবন আব্দুল বার্‌র, কাযি ইবনুল আরবি, সুয়ূতি, মুগলাতাই প্রমুখ মুহাদ্দিস।[৭০]

যে সকল কিতাবে হাদীস সংকলিত হয়েছে শুদ্ধতার মান অনুযায়ী সে সকল কিতাবকে মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালি উল্লাহ দেহলভি (রাহ.) পাঁচ স্তরে বিন্যস্ত করেছেন। প্রথম স্তরে শুধু তিনটি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। এর প্রথমটি হচ্ছে মুআত্তা মালিক। অন্য দুটি হচ্ছে সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম। এরপর ইমাম শাফিয়ির বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন :

وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْحَدِيْثِ عَلَى أَنَّ جَمِيْعَ مَا فِيْهِ صَحِيْحٌ عَلَى رَأْيِ مَالِكٍ

৬৮. লাখলবি, আত তা'লীকুল মুমাজ্জাদ, ১/৭৩।
৬৯. লাখলবি, আত তা'লীকুল মুমাজ্জাদ, ১/৭৫।
৭০. কাত্তানি, আর রিসালাতুল মুস্তাতরাফাহ, পৃ. ০৬; শিনকীতি, দালীলুস সালিক, পৃ. ২১।

وَمَنْ وَافَقَهُ وَأَمَّا عَلَى رَأْيِ غَيْرِهِ فَلَيْسَ فِيْهِ مُرْسَلٌ وَلَا مُنْقَطِعٌ إِلَّا قَدِ اتَّصَلَ السَّنَدُ بِهِ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى فَلَا جَرَمَ أَنَّهَا صَحِيْحَةٌ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ.

হাদীসশাস্ত্রের ইমামগণ একমত যে, মুআত্তার সকল বর্ণনা ইমাম মালিক ও তাঁর সমমনাদের নিকট সহীহ। আর অন্যদের মতেও মুআত্তার সনদ-বিচ্ছিন্ন সকল বর্ণনা অন্য বিভিন্ন সূত্রে মুত্তাসিল-অবিচ্ছিন্ন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকেও মুআত্তা বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ।[৭১]

মুহাদ্দিস ইমামদের এই সকল বক্তব্য থেকে আমরা হাদীসশাস্ত্রে মুআত্তা মালিকের উচ্চতর মর্যাদা ও অবস্থানের কথা জানতে পারলাম। কোনো কোনো ইমাম মুআত্তাকে সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম থেকেও এগিয়ে রেখেছেন। কেননা মুআত্তাই হচ্ছে এ দুটি কিতাবের মূল। এবং ইমাম বুখারি ও মুসলিম এ কিতাবের রীতি অনুসরণ করেই তাদের কিতাব সংকলন করেছেন। মুআত্তা গ্রন্থিত হয়েছে সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদ আহমাদ সংকলনের বেশ আগে।

সিহাহ সিত্তাহর সংকলক ইমামগণ জন্মগ্রহণ করেছেন মুআত্তা সংকলক ইমাম মালিকের অনেক পরে। এ ছয় ইমামের প্রথম ব্যক্তি ইমাম বুখারি (রাহ.) জন্মগ্রহণ করেছেন ১৯৪ হিজরিতে। তার ১৫ বছর আগে ১৭৯ হিজরিতে ইমাম মালিক (রাহ.) ইন্তিকাল করেছেন। তখন ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের বয়স মাত্র ১৫ বছর। সুতরাং মুআত্তা মালিকের ঐতিহাসিক মর্যাদা কিছুতেই সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদ আহমাদ থেকে কম নয়। আর যে হাদীসটি মুআত্তায় সংকলিত হয়েছে সে হাদীস সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদ আহমাদের অস্তিত্বের আগেই গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে।

কেউ যদি এ প্রশ্ন করে যে, ইমাম বুখারি ও মুসলিম যেহেতু মুআত্তা মালিকের রীতি অনুসরণ করে কিতাব সংকলন করেছেন এবং মুআত্তার হাদীস তাদের 'সহীহ' শিরোনামের কিতাবে সংকলন করেছেন তবে মুআত্তার এই এত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসটি এই শব্দে তারা কেন সংকলন করেননি? তবে কি তাদের মতে এটি গ্রহণযোগ্য ছিল না?

---

৭১. দেহলভি, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, ১/২৩১।

প্রশ্নকর্তার জ্ঞাতার্থে আমরা প্রথমেই বলে রাখি, গুরুত্বপূর্ণ হাদীসকে বিশেষ কোনো গ্রন্থে সংকলিত হতে হবে বা কোনো বিশেষ গ্রন্থে সংকলিত হলেই হাদীসটি গুরুত্বপূর্ণ হবে—এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এবং এ ধারণাও ভুল যে, ইমাম বুখারি ও মুসলিম যে হাদীস সংকলন করেননি সে হাদীস তাদের নিকট অগ্রহণযোগ্য বা সে হাদীসের বিশুদ্ধতার মান বুখারি-মুসলিমে সংকলিত হাদীসের থেকে কম। বরং হাদীসের গুরুত্ব ও বিশুদ্ধতার মান নির্ধারণে যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত শাস্ত্রীয় মানদণ্ড আছে। যার সাথে বিশেষ ব্যক্তি দ্বারা বিশেষ কোনো কিতাবে সংকলিত হওয়া না-হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইমাম বুখারি ও মুসলিমও দাবি করেননি যে, তাদের কিতাবে সংকলিত হাদীসের বাইরে কোনো সহীহ হাদীস নেই। বরং তারা সুস্পষ্ট করে বলেছেন, তাদের কিতাবে সংকলিত সকল হাদীস সহীহ। এবং এর বাইরেও প্রচুর সহীহ হাদীস আছে। ইমাম বুখারি (রাহ.) বলেছেন :

لَمْ أَخرِّجْ فِي الْكِتَابِ إِلَّا صَحِيْحًا وَمَا تركتُ مِنَ الصَّحِيْحِ أَكْثَرُ.

আমি এই কিতাবে শুধু সহীহ হাদীসই সংকলন করেছি। আর যে সকল সহীহ হাদীস আমি আনিনি তার সংখ্যাই বেশি।[৭২]

কেন তিনি অনেক সহীহ হাদীস সহীহ বুখারিতে আনেননি তার কারণও বলেছেন :

وَتَرَكْتُ مِنَ الصِّحَاحِ لِحَالِ الطُّوْلِ.

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক সহীহ হাদীস ত্যাগ করেছি।[৭৩]

ইমাম মুসলিম (রাহ.) বলেছেন :

إِنَّمَا أَخْرَجْتُ هٰذَا الْكِتَابَ وَقُلْتُ هُوَ صِحَاحٌ وَلَمْ أَقُلْ أَنَّ مَا لَمْ أُخْرِجْهُ مِنَ الْحَدِيْثِ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ ضَعِيْفٌ وَلٰكِنِّيْ إِنَّمَا أَخْرَجْتُ هٰذَا مِنَ الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ لِيَكُوْنَ مَجْمُوْعًا عِنْدِيْ

৭২. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০/১২০, ১২/৪৭১।
৭৩. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১/৫২; তারীখ বাগদাদ, ২/৩২২।

وَعِنْدَ مَنْ يَكْتُبُهُ عَنِّيْ فَلَا يَرْتَابُ فِيْ صِحَّتِهَا وَلَمْ أَقُلْ إِنَّ مَا سِوَاهُ ضَعِيْفٌ.

আমি এই কিতাব সংকলন করেছি এবং বলেছি, এর হাদীসগুলো সহীহ। তবে এ কথা তো বলিনি যে, আমি এই কিতাবে যে হাদীস সংকলন করিনি তা দুর্বল। আমি সহীহ হাদীসের এই সংকলন এ জন্য প্রস্তুত করেছি যাতে আমার কাছে এবং আমার কাছ থেকে যারা কপি করে নেবে তাদের কাছে একটা সংগ্রহ থাকে, যার বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ থাকবে না। আর আমি বলিনি যে, এর বাইরের সব হাদীস দুর্বল।[৭৪]

আমাদের উল্লেখিত হাদীসটি ইমাম মালিক (রাহ.) তাঁর মুআত্তা গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি যদিও হাদীসটির সনদ উল্লেখ করেননি, কিন্তু আমরা দেখেছি, মুহাদ্দিস ইমামগণ বলেছেন, মুআত্তার সকল সনদ-বিচ্ছিন্ন হাদীসও সহীহ, কেননা অন্য সূত্রে তার অবিচ্ছিন্ন সনদ আছে। উপরন্তু ইবন আব্দিল বার্‌র (রাহ.) হাদীসটির অবিচ্ছিন্ন সনদ উল্লেখ করেছেন—কাসীর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবন আওফ তার বাবা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে।[৭৫]

তাছাড়া এ শব্দে হাদীসটির বর্ণনাকারী হিসাবে সাহাবি আমর ইবন আওফ (রা.) একক নন। আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস, আবু হুরাইরা (রা.) প্রমুখ সাহাবি থেকেও এ শব্দে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। হাকিম, বাইহাকি, বাযযার, আবু বাকর শাফিয়ি, ইবন শাহীন, দারাকুতনি, লালকায়ি, মুরশিদ বিল্লাহ শাজারি প্রমুখ মুহাদ্দিস তা সংকলন করেছেন।[৭৬]

হাদীসের এনসাইক্লোপিডিয়া মুসনাদ আহমাদ এবং সিহাহ সিত্তাহর সহীহ মুসলিম ও সুনান তিরমিযিতে এ হাদীসের সমর্থক একাধিক বর্ণনা রয়েছে।

---

৭৪. তারীখ বাগদাদ, ৫/৪৫০; হাফিয মিযযি, তাহযীবুল কামাল, ১/৪২০।

৭৫. ইবন আব্দুল বার্‌র, তামহীদ : ২৪/৩৩১; সুয়ূতি, তানবীরুল হাওয়ালিক, ২/২০৮; যুরকানি, শারহুল মুআত্তা, ৪/৩৮৭।

৭৬. মুসনাদ বাযযার, হাদীস : ৮৯৯৩; শাফিয়ি, কিতাবুল ফাওয়ায়িদ, হাদীস : ৬৩২; ইবন শাহীন, আত তারগীব ফী ফাযায়িলিল আ'মাল, হাদীস : ৫২৮; শারহু মাযাহিবি আহলিস সুন্নাহ, হাদীস : ৪৪; সুনান দারাকুতনি, হাদীস : ৪৬০৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩১৮ ও ৩১৯; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস : ২০৩৩৬, ২০৩৩৭; আল ই'তিকাদ, পৃ. ২২৮; ইবন আব্দিল বার্‌র, জামিউ বায়ানিল ইলম, হাদীস : ১৩৮৯, ১৮৬৬; লালাকায়ি, শারহু উসূলিল ই'তিকাদ, হাদীস : ৯০; শাজারি, তারতীবুল আমালি, হাদীস : ৭৫৩;।

কয়েকটি বর্ণনা দেখুন :

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدِي الثَّقَلَيْنِ وَأَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِيْ أَهْلُ بَيْتِيْ.

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে দুটি গুরুভার বিষয় রেখে যাচ্ছি। আমার পর তোমরা তা আঁকড়ে ধরে রাখলে পথভ্রষ্ট হবে না। তার একটি অপরটি থেকে বড়। ১. আল্লাহর কিতাব, তা আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত প্রলম্বিত রশি, এবং ২. আমার আহ্‌ল বা পরিজন।[৭৭]

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ اللهِ وَأَهْلُ بَيْتِيْ.

যাইদ ইবন সাবিত (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দুটি প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি—আল্লাহর কিতাব ও আমার আহলে বাইত বা পরিজন।[৭৮]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوْا: كِتَابَ اللهِ وَعِتْرَتِيْ أَهْلَ بَيْتِيْ.

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর হজ্জে আরাফার দিন কাসওয়া উষ্ট্রীর উপর ভাষণ দিতে দেখেছি। সে ভাষণে তাঁকে বলতে শুনেছি, হে লোকসকল, আমি তোমাদের মধ্যে এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা আঁকড়ে ধরে রাখলে তোমরা

৭৭. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১১১০৪, ১১২১১, ১১৫৬১।
৭৮. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১২৫৭৮, ২১৬৫৪।

বিপথগামী হবে না। ১. আল্লাহর কিতাব ও ২. আমার আহ্‌ল-পরিজন।[৭৯]

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ... أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ ... ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ.

যাইদ ইবন আরকাম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শুনে রাখো, হে লোকসকল, আমি মানুষ। অচিরেই আমার নিকট আমার রবের দূত এসে যাবে। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দেব। এমতাবস্থায় আমি তোমাদের মাঝে দুটি গুরুভার জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি আল্লাহর কিতাব। তার মাঝে পথনির্দেশ ও আলো আছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাব গ্রহণ করো এবং আঁকড়ে ধরো। এরপর তিনি বলেন, এবং আমার আহলে বাইত বা পরিজন। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।...[৮০]

এ হাদীসগুলোতে আল্লাহর কিতাবের সাথে সাথে 'আহলে বাইত বা নবী-পরিবার'কে আঁকড়ে ধরতে বলা হয়েছে। আহলে বাইত বা নবী-পরিবার প্রধানত তাঁর স্ত্রীগণ। কেননা আল কুরআনে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে আহলে বাইত বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল উভয়ের আনুগত্যের ব্যাপারে আদিষ্ট এবং কুরআন ও হিকমত বা সুন্নাহ স্মরণ রাখতে ও শিক্ষা দিতে নির্দেশিত। সুতরাং তাঁদেরকে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দানের অর্থ হচ্ছে, কুরআন ও হিকমত তথা হাদীস বা সুন্নাহ উভয়কে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেন :

يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ

---

৭৯. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩৭৮৬।

৮০. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৪০৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৯২৬৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩৭৮৮।

بِالْقَــوْلِ فَيَطْمَعَ الَّــذِىْ فِىْ قَلْبِهٖ مَــرَضٌ وَّقُلْنَ قَــوْلًا مَّعْرُوْفًــا . وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُــنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّــةِ الْأُوْلٰى وَأَقِمْنَ الصَّــلَاةَ وَآتِيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُــوْلَهٗ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰــهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْــسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُــمْ تَطْهِيْرًا . وَاذْكُرْنَ مَــا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَــاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللّٰــهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا.

"হে নবী-পত্নীগণ, তোমরা সাধারণ নারীদের মতো নও, যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো। সুতরাং তোমরা কোমল স্বরে কথা বোলো না, তাতে যার অন্তরে ব্যাধি আছে সে লালায়িত হবে। আর ন্যায়সংগত কথা বলো। নিজ গৃহে অবস্থান করো। প্রাচীন জাহিলি যুগের মতো সাজসজ্জা প্রদর্শন কোরো না। সালাত কায়িম করো, যাকাত আদায় করো। এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো। হে নবী-পরিবার, আল্লাহ তো চান, তোমাদের থেকে মলিনতাকে দূরে রাখতে এবং সর্বতোভাবে তোমাদেরকে পবিত্রতা দান করতে। তোমাদের গৃহে আল্লাহর যে আয়াতসমূহ ও হিকমত পাঠ করা হয় তোমরা তা স্মরণ রেখো বা বর্ণনা কোরো। নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞ।"[৮১]

যে হাদীসটি একাধিক সাহাবি থেকে বর্ণিত, বহু সনদে বহুসংখ্যক কিতাবে, এমনকি সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদ আহমাদের অস্তিত্ব লাভেরও আগে মুআত্তা মালিকে সংকলিত, সিহাহ সিত্তাহ ও মুসনাদ আহমাদেও যার সমর্থক বর্ণনা বিদ্যমান, একাধিক শাস্ত্রজ্ঞ ইমাম যার বিশুদ্ধতা ও গ্রহণযোগ্যতার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, মুহাদ্দিসদের নিকট সুপ্রসিদ্ধ এমন একটি সুপ্রমাণিত হাদীসে নববিকে বিশেষ কোনো কিতাবে নেই কেন প্রশ্ন তুলে মিথ্যা বলা বা বাতিল করে দেওয়া নিতান্তই অজ্ঞতা অথবা বিশেষ কোনো মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে গায়ের জোরে সত্যকে বা মেঘমুক্ত দিনের দুপুরে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বহ্নিমান সূর্যকে অস্বীকার করার নামান্তর।

এ ধরনের বর্ণনা তো সনদের কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও অন্যান্য সূত্রের সমর্থনে বিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণ বলে গণ্য হয়। প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ মুআত্তা

৮১. সূরা [৩৩] আহযাব, আয়াত : ৩২-৩৪।

মালিকের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবন আব্দিল বার্‌র (রাহ.) এ হাদীসের ব্যাপারে বলেছেন :

هٰذَا مَحْفُوْظٌ مَعْرُوْفٌ مَشْهُوْرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ شُهْرَةً يَكَادُ يُسْتَغْنٰى بِهَا عَنِ الْإِسْنَادِ وَرُوِيَ فِيْ ذٰلِكَ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ أَحَادِيْثُ.

এ বর্ণনাটি সংরক্ষিত এবং হাদীস বিশারদদের নিকটে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস হিসাবে এমন পরিচিত ও প্রসিদ্ধ যে, এর প্রসিদ্ধিই সনদতুল্য। এছাড়া এ বিষয়ে আরো কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৮২]

এ সকল আলোচনার পর আশা করি, পাঠকের নিকট পরিষ্কার হয়েছে যে, হাদীসের এই মর্মটি সুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রমাণিত। এ পর্যায়ে আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, এ হাদীসের বক্তব্যই আল কুরআনে বর্ণিত কিতাব ও হিকমতের যথার্থ ব্যাখ্যা। অন্য একটি হাদীসে নবীজি বলেছেন :

أَلَا إِنِّيْ أُوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

শুনে রাখো, নিশ্চয় আমাকে দেওয়া হয়েছে কুরআন এবং তার সাথে তার অনুরূপ ওহি।[৮৩]

বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে গেলে স্ববিরোধী এলোমেলো কথার গোঁজামিল দিতে হয়। হাদীস বিরোধীদেরও এ কাজ করতে হয়। এবং এ কাজে তারা যথেষ্ট পারদর্শীও বটে। মুআত্তা মালিক নিয়ে বাংলাদেশি হাদীস অস্বীকারকারীদের গোঁজামিলের একটি উদাহরণ দিই। আমাদের আলোচ্য হাদীসটি তাদের দাবির পক্ষে একটি বড় বাধা। এজন্য তারা এ হাদীসটি এবং একই কারণে মুআত্তা মালিককে বাতিল ও অস্বীকার করতে চায়। তারা বলে, *মুআত্তা মালিক হাদীসের কোনো গুরুত্বপূর্ণ কিতাব নয়। এজন্যই মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে হাদীসের সর্বোচ্চ ডিগ্রি কামেল বা মাস্টার্স অব হাদীসে এ কিতাব পড়ানো হয় না।*

৮২. ইবন আব্দিল বার্‌র, আত তামহীদ, ২৪/৩৩১; সানআনি, জামিউল উসূল, ১/২৭৭; আলবানি, সহীহুল জামি', ১/৫৬৬; সিলসিলাহ সহীহাহ, ৪/৩৫৫-৩৬১।

৮৩. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭১৭৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৬০৪।

আবার কখনো তারা বলে, হাদীস সত্যায়ন বা গ্রহণ-বর্জনের কোনো নীতিমালা নেই। এখানে সম্পূর্ণই তুঘলকি কর্মকাণ্ড চলে। নিজের মতাদর্শের পক্ষের হলে সে হাদীস বা হাদীস গ্রন্থকে সহীহ বলে গ্রহণ করা হয় আর বিপক্ষের হলে জাল বা যয়ীফ বলে বাতিল করে দেওয়া হয়। যে কারণে মক্কা-মদীনায় মুআত্তা মালিক সর্বজনগ্রাহ্য হলেও আমাদের দেশে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি, এদেশের কামিল ফিল হাদীসের সিলেবাসভুক্তও করা হয়নি। কারণ আমরা হানাফি কোম্পানি, আমরা মালিকি কোম্পানির খবরে বিশ্বাস করতে পারি না।

তাদের এ কথাগুলো নিতান্তই প্রলাপ। মালিক ইবন আনাস (রাহ.) মালিকি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম। মুআত্তা তাঁর সংকলিত হাদীসের কিতাব। এ দেশে আমরা অধিকাংশই হানাফি মাযহাবের অনুসারী। যদি এ কারণেই বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের কামিল ফিল হাদীসের সিলেবাসে মুআত্তা মালিক রাখা না হয় তবে তো সিহাহ সিত্তাহ নামে প্রসিদ্ধ হাদীসের ছয় কিতাবও সিলেবাসে থাকার কথা নয়। কেননা ওই ছয় কিতাবের সংকলক ছয় ইমাম কেউ-ই হানাফি ছিলেন না।

বাংলাদেশসহ আমাদের সমগ্র উপমহাদেশে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও একনিষ্ঠভাবে হানাফি মাযহাব চর্চা হয় দেওবন্দি ধারার কওমি মাদরাসাগুলোতে। এ মাদরাসাগুলোতে অতিশয় গুরুত্বের সাথে মুআত্তা মালিকের একাধিক ভার্সন পড়ানো হয়। এদেশের হানাফি মুসলিমরা ইমাম মালিক, মালিকি মাযহাব ও মুআত্তা মালিককে প্রত্যাখ্যান করবে কেন? হানাফি মাযহাবের প্রধান তিন ইমামের অন্যতম ইমাম মুহাম্মাদ ইবন হাসান শাইবানি (রাহ.) দীর্ঘ তিন বছর ইমাম মালিকের সান্নিধ্যে থেকে তাঁর দরসে বসে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে সম্পূর্ণ মুআত্তার পাঠ গ্রহণ করেছেন এবং সংকলন করেছেন। যে সংকলনটি 'মুআত্তা মুহাম্মাদ' নামে সমধিক পরিচিত। এবং তাঁর বরাতে মালিকি মাযহাবের ফিকহও সংকলিত হয়েছে।[৮৪]

কুরআনের অতিরিক্ত ওহিতে শরয়ি বিধান

আল কুরআনের অতিরিক্ত ওহিতে মহান আল্লাহ শরয়ি বিধান নাযিল

৮৪. যাহিদ কাওসারি, বুলূগুল আমানি, পৃ. ১৮।

করেছেন। এর অনেক প্রমাণ আল কুরআনে বিদ্যমান। কলেবর বৃদ্ধি এড়াতে এ সংক্রান্ত শুধু দুটি প্রমাণ আমরা উল্লেখ করছি :

প্রমাণ-০১ : মদীনার প্রসিদ্ধ ইয়াহুদি গোত্র বনু নযীরকে অবরোধের সময় তাদের অস্ত্র সমর্পণে বাধ্য করার জন্য মুসলিমগণ দুর্গের আশপাশের কিছু খেজুর গাছ কেটে দেয়। যুদ্ধ শেষে ইয়াহুদিরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করে, আপনি তো বিপর্যয় ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে নিষেধ করেন, তাহলে আমাদের খেজুর গাছগুলো কাটার অনুমতি দিলেন কীভাবে? তাদের অভিযোগের জবাবে মহান আল্লাহ মুসলিমদের সম্বোধন করে বলেন :

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى أُصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِيْنَ.

"তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর গাছ কেটে দিয়েছ এবং কিছু না কেটে মূলের উপর রেখে দিয়েছ—তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদের লাঞ্ছিত করেন।"[৮৫]

এ আয়াত থেকে আমরা দেখছি যে, অবরোধকালে মুসলিমগণ কর্তৃক কিছু বৃক্ষ কর্তন ও কিছু বৃক্ষ কর্তন না করার বিষয়টি মহান আল্লাহর নির্দেশে হয়েছিল। কিন্তু আল কুরআনের কোথাও এ নির্দেশটি উল্লেখিত হয়নি। তাহলে বোঝা যায়, আল্লাহর এ নির্দেশটি ছিল কুরআন-বহির্ভূত ওহিরনির্দেশ।[৮৬]

প্রমাণ-০২ : যেসব মুনাফিক হুদাইবিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেনি তারা গনীমতের লোভে খায়বার অভিযানে শরিক হতে চায় এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তিনি তাদের অনুমতি না দিয়ে ঘোষণা করে দেন, এ অভিযানে শুধু তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবে যারা হুদাইবিয়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। কেননা আগে থেকেই মহান আল্লাহ এ বিধান দিয়ে রেখেছিলেন এবং প্রভূত গনীমতের

---

৮৫. সূরা [৫৯] হাশর, আয়াত : ০৫।

৮৬. তাবারি, জামিউল বায়ান : ২৩/২৭১-২৭৩; কুরতুবি, আল জামি' লি-আহকামিল কুরআন : ১৮/৬-৮; ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম : ৮/৬১-৬২; তাকি উসমানি, হাদীসের প্রামাণ্যতা : ৪৫-৪৬।

প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এ ঘটনাটি আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ.

"তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা (হুদাইবিয়ার সফরে) পেছনে থেকে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরও তোমাদের সাথে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলে দিন, তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যাবে না; আল্লাহ আগে থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন।"[৮৭]

মহান আল্লাহ আগে থেকেই বিষয়টি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই পূর্বোক্ত বিধান ও প্রতিশ্রুতি আল কুরআনের কোথাও উল্লেখ নেই। এখানে কোনো অস্পষ্টতা নেই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসা এই বিধানটি ছিল কুরআন-বহির্ভূত ওহি।[৮৮]

কুরআনের অতিরিক্ত ওহিতে সংবাদ প্রদান

এছাড়া কুরআনের অতিরিক্ত ওহিতে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বিভিন্ন সুসংবাদ ও ঘটে যাওয়া বিষয়ের সংবাদ ইত্যাদিও প্রদান করেছেন। এ বিষয়েও আমরা দুটি প্রমাণ উপস্থাপন করছি।

প্রমাণ-০১ : বদর যুদ্ধে মহান আল্লাহ ফেরেশতা পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের মনোবল চাঙা রাখার জন্য বদরের সাহায্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এ যুদ্ধের প্রাক্কালে আয়াত নাযিল হয় :

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"আল্লাহ তো বদরে তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন, যখন তোমরা ছিলে দুর্বল। সুতরাং আল্লাহর প্রতি তাকওয়া অবলম্বন করো। যাতে তোমরা শুকুরগুজার হতে পারো।"[৮৯]

---

৮৭. সূরা [৪৮] ফাতহ, আয়াত : ১৫।

৮৮. তাকি উসমানি, তাওযীহুল কুরআন : ৩/৩৪৩-৩৪৪।

৮৯. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ১২৩।

বদরের যুদ্ধে যে মহান আল্লাহ ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করবেন যুদ্ধের আগেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে এই সুসংবাদ শুনিয়ে দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন :

إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ . بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ.

"(হে নবী) যখন আপনি মুমিনদেরকে বলছিলেন, তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের প্রতিপালক তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য করবেন? অবশ্যই, তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো, তাকওয়া অবলম্বন করো আর এ মুহূর্তে যদি অতর্কিতে তারা তোমাদের উপর হামলা করে তাহলে তোমাদের রব তোমাদেরকে সাহায্য করবেন চিহ্নিত পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে।"[৯০]

বদর যুদ্ধের প্রক্কালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে এই যে সুসংবাদ শোনালেন, কুরআন মাজীদের কোথাও এ সুসংবাদ উল্লেখিত হয়নি। অথচ মহান আল্লাহ এই বিষয়টিকে নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে বলেন :

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ.

"আল্লাহ এ ব্যবস্থা করেছিলেন তোমাদের জন্য সুসংবাদ-স্বরূপ এবং তোমাদের অন্তরের স্থিরতার জন্য। আর সাহায্য তো কেবল পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[৯১]

তাহলে এই সুসংবাদ নবীজি নিজের পক্ষ থেকে দিয়েছিলেন নাকি ওহির মাধ্যমে? যদি বলি, ওহির মাধ্যমে দিয়েছিলেন, তবে মানতে হবে, তাঁর নিকট কুরআনের অতিরিক্ত ওহি নাযিল হতো। আর যদি বলি, তিনি

---

৯০. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ১২৪ ও ১২৫।

৯১. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ১২৬।

নিজের পক্ষ থেকে এ সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন, তবে আমাদের মানতে হবে, নবীজির নিজের কথাকেও মহান আল্লাহ তাঁর নিজের কথা বলে গ্রহণ করেছেন। তবে দ্বিতীয় মতটি এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা আল্লাহ সাহায্য করবেন কি না, কীভাবে করবেন—তা ওহি ছাড়া নবীজির জন্য জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ এই সুসংবাদ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের অতিরিক্ত ওহির মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন।

প্রমাণ-০২ : নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার তাঁর এক স্ত্রীকে একটি গোপন কথা বলেন। এ নিয়ে এক অপূর্ব ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ.

"নবী যখন একটি কথা তাঁর এক স্ত্রীকে বলেন। অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দেয় আর আল্লাহ তা নবীর কাছে প্রকাশ করে দেন তখন নবী কিছু কথা বলেন আর কিছু কথা উহ্য রাখেন। যখন তিনি স্ত্রীকে তা বলেন, স্ত্রী তাঁকে বলে, এ কথা আপনাকে কে জানাল? নবী বলেন, আমাকে জানিয়েছেন সর্বজ্ঞ মহাজ্ঞানী।"[৯২]

দেখুন, নবীজির বলা গোপন কথা যখন তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী প্রকাশ করে দেন তখন মহান আল্লাহ সংবাদটি নবীজিকে জানিয়ে দেন। কিন্তু এ সংবাদ আল কুরআনের কোথাও সংকলিত নেই। সুতরাং এ সংবাদ মহান আল্লাহ কুরআনের অতিরিক্ত ওহির মাধ্যমেই তাঁর নবীকে জানিয়েছিলেন।

হাদীসের বিধান কুরআনের স্বীকৃতি

অনেক বিধান এমন আছে যা প্রথমত কুরআনের অতিরিক্ত ওহি দ্বারা সাব্যস্ত ও প্রচলিত হয়েছে। পরে কুরআনে তার নির্দেশ বা স্বীকৃতি নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা যেমন কুরআনের অতিরিক্ত ওহি নাযিল হওয়া প্রমাণিত হয়, তেমনি তার মর্যাদাও বোঝা যায়। দুটি প্রমাণ দেখুন।

---

৯২. সূরা [৬৬] তাহরীম, আয়াত : ০৩।

প্রমাণ-০১ : ইসলামের প্রথম যুগে মাক্কি জীবনেই ওযুর বিধান প্রদত্ত হয়। তা সাব্যস্ত হয় কুরআনের অতিরিক্ত ওহি দ্বারা। আর ওযু সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত নাযিল হয় মদীনায় হিজরতের অনেক পরে।

মাক্কি জীবনে মিরাজের পর থেকে যখন সালাত ফরয হয় তখন থেকেই তা ওযুসহ আদায়ের বিধান দেওয়া হয়। মাদানি জীবনে নবীজি সাহাবিদের নিকট থেকে এ বিষয়ক প্রশ্নের সম্মুখীন হন যে, আমরা পানি ব্যবহারে অক্ষম হলে কী করব? তখন তায়াম্মুমের বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ সূরা মায়িদাহর ৬ নং আয়াতটি নাযিল করেন। এ আয়াতে প্রসঙ্গক্রমে ওযুর বিধানও আলোচিত হয়। এর আগে আল কুরআনে কোথাও ওযুর বিধান আলোচিত হয়নি। অথচ এ আয়াত থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আয়াতটি নাযিলের আগ থেকেই ওযুর বিধান কার্যকর ছিল। সাহাবিরা অপরাগতার কারণে ওযু করতে না পারলে করণীয় জানতে চাইলে আয়াতটি নাযিল হয়।[৯৩]

প্রমাণ-০২ : মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারছি, তখন কোনো সালাতের ওয়াক্ত হলে 'اَلصَّلَاةُ جَامِعَةٌ' বলে ঘোষণা দেওয়া হতো।[৯৪] হিজরতের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করে সালাতের দিকে আহ্বানের জন্য আযান চালু করেন। সালাতের জন্য ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে এবং তার পদ্ধতি বাতলে দিয়ে আল কুরআনে কোনো আয়াত নাযিল হয়নি। কিন্তু সালাতের জন্য ঘোষণা দেওয়াকে শরীআতের সাধারণ বিধান হিসাবে আল কুরআনের একাধিক আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ.

"যখন তোমরা সালাতের প্রতি আহ্বান করো, তারা এটাকে খেল-তামাশার বিষয় হিসাবে গ্রহণ করে। কেননা তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।"[৯৫]

---

৯৩. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৬০৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৩৬৭; ইবনুল আরাবি, আহকামুল কুরআন ২/৪৭।

৯৪. সহীহ ইবন হিব্বান : ২৮৮৪।

৯৫. সূরা [৫] মায়িদাহ, আয়াত : ৫৮।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

"হে মুমিনগণ, জুমুআহর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও এবং ব্যবসা পরিত্যাগ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে পারো।"[৯৬]

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের অতিরিক্ত ওহির মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল বিধান প্রবর্তন করেছেন কুরআনের দৃষ্টিতে সে সকল বিধানও শরীআতের সাধারণ বিধানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কুরআনে উল্লেখিত ও হাদীসে উল্লেখিত বিধানের মাঝে মর্যাদাগত তারতম্য নেই। উভয় বিধানই ওহি দ্বারা সাব্যস্ত।

শরীআত প্রণয়নে নবীজির অধিকার

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, মহান আল্লাহ আল কুরআনের বাইরেও শরীআতের বিধান-সংবলিত ওহি নাযিল করেছেন। সুতরাং শরয়ি বিধান জানার জন্য শুধু কুরআনের উপর নির্ভর করা যথেষ্ট নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের অতিরিক্ত ওহির মাধ্যমে অনেক শরয়ি বিধান বর্ণনা করেছেন, আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারামের বিধান প্রদান করেছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

قَالَ عَذَابِيْ أُصِيْبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ. الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ

৯৬. সূরা [৬২] জুমুআহ, আয়াত : ০৯।

أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"তিনি (আল্লাহ) বলেন, আমি যাকে চাই আমার আযাবে নিপতিত করি, আর আমার দয়া সকল কিছুতে পরিব্যাপ্ত। অতঃপর তা আমি লিপিবদ্ধ করি তাদের জন্য যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত প্রদান করে এবং আমার আয়াতে বিশ্বাসী ওই সমস্ত লোকের জন্য যারা এই রাসূলের অনুসরণ করে, যিনি উম্মি নবী, যার কথা তারা তাদের কাছে থাকা তাওরাত ও ইনজীলে লিখিত পায়। এই রাসূল তাদের সৎকাজের আদেশ করেন, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দেন আর নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি তাদের ভার ও গলার বেড়ি নামিয়ে দেবেন, যা তাদের উপর চাপানো ছিল। সুতরাং যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে, তাঁর পক্ষাবলম্বন করেছে, তাঁকে সাহায্য করেছে এবং তাঁর সাথে অবতীর্ণ জ্যোতির অনুসরণ করেছে, তারাই কৃতকার্য।"[৯৭]

এ আয়াতে হালাল-হারামের সম্পর্ক কিতাবের সাথে করা হয়নি, বরং রাসূলের সাথে করা হয়েছে। আয়াতে উল্লেখিত (يُحِلُّ) 'হালাল করে দেন' ও (يُحَرِّمُ) 'নিষিদ্ধ করে দেন' ক্রিয়াপদ দুটির কর্তা মহান আল্লাহ নন, বরং উম্মি নবী। উপরন্তু কুরআনের আলোকে প্রমাণিত ন্যায় ও অন্যায় কাজের আদেশ-নিষেধ থেকে পৃথক করে এই হারাম-হালালের বিধান দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

"কিতাবিদের মধ্যে যারা ঈমান রাখে না আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তাকে হারাম মনে করে না আর গ্রহণ করে না সত্য দীনকে, তাদের সাথে

৯৭. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত : ১৫৬ ও ১৫৭।

যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না তারা হেয় হয়ে নিজ হাতে জিযিয়া প্রদান করে।"[৯৮]

এ আয়াতে আল্লাহর সাথে রাসূলকেও 'হারাম করেছেন' ক্রিয়ার কর্তা বানানো হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ أَمْرًا أَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا.

"যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন কোনো মুমিন নারী ও পুরুষের অন্যথা করার অধিকার নেই। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলো সে তো সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হলো।"[৯৯]

এ আয়াতেও আল্লাহর সাথে তাঁর রাসূলকে 'ফায়সালা করেন' ক্রিয়ার কর্তা বানানো হয়েছে। এবং উভয়ের মাঝে রয়েছে 'ও' (وَ) সংযোজক অব্যয়।

আয়াতগুলোর সরল অর্থের আলোকে বিধান প্রণয়নে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিপূর্ণ অধিকার সাব্যস্ত হয়। তবে অন্যান্য দলীলের সমন্বয়ে আমরা বিশ্বাস করি, এক্ষেত্রে মহান আল্লাহর অধিকার যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ, নবীজির অধিকার তেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তবে এ কথা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয় যে, এসব আয়াতের অর্থ মূলত মহান আল্লাহ আল কুরআনে যেসব বিধান উল্লেখ করেছেন নবীজি কেবল তার প্রচারক। কেননা এ কথা যেমন আয়াতের ব্যাকরণ-সম্মত ও উম্মাহর সর্বজনস্বীকৃত অর্থের পরিপন্থী, তেমনি এ কথার দ্বারা সরল অর্থ সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং আয়াতের এ সংক্রান্ত আলোচনা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে।

আয়াতগুলোর যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা রয়েছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসে। তিনি বলেছেন :

أَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى أَرِيْكَتِهِ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ

---

৯৮. সূরা [৯] তাওবাহ, আয়াত : ২৯।

৯৯. সূরা [৩৩] আহযাব, আয়াত : ৩৬।

شَيْئًا إِلَّا مَا فِيْ هٰذَا الْقُرْآنِ أَلَا وَإِنِّيْ وَاللهِ قَدْ وَعَظْتُ وَأَمَرْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ أَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ أَوْ أَكْثَرُ.

"তোমাদের কেউ কি আপন আসনে হেলান দিয়ে ধারণা করে যে, এই কুরআনে যা আছে তা ছাড়া আর কিছুই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেননি? শুনে রাখো, আল্লাহর কসম, নিশ্চয় আমিও তোমাদের উপদেশ দিয়েছি, অনেক কিছুর আদেশ করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি—তা কুরআনের অনুরূপ অথবা তারও অধিক।"[১০০]

হাদীসের এই বাচনভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, আল কুরআনের অতিরিক্ত যেসব বিধিবিধান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন তা তাঁর নিজের কথা নয়; বরং মহান আল্লাহরই বিধান। কেননা প্রথমে তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'তোমাদের কেউ কি... ধারণা করে যে, কুরআনে যা আছে তা ছাড়া আর কিছুই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেননি?' এ প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ আল কুরআনের বাইরেও অনেক বিধান দিয়েছেন। কিন্তু সে সকল বিধান তিনি কীভাবে দিয়েছেন? এ প্রশ্নের জবাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'আমিও তোমাদের... অনেক কিছুর আদেশ করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি—তা কুরআনের অনুরূপ অথবা তার অধিক।' অর্থাৎ কুরআনের বাইরে আল্লাহ তাআলা যে সকল বিধান দিয়েছেন সেগুলোই আমি তোমাদের জানিয়েছি।

আরো খেয়াল করুন, আল্লাহর দেওয়া কুরআন-বহির্ভূত বিধান বর্ণনা করাকে নবীজি বলছেন, 'আমিও... অনেক কিছুর আদেশ করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি'। অর্থাৎ কুরআনের অতিরিক্ত ওহির বিধান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক উম্মাতকে শোনানোই নবীজির বিধান দান হিসাবে সাব্যস্ত।

রাসূলের আনুগত্য ও অনুসরণ-অনুকরণ

আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বারবার তাঁর নিজের আনুগত্যের নির্দেশ

১০০. সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩০৫০। হাদীসটিকে আব্দুল হক ইশবীলি প্রমাণিত হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং আলবানি এর সনদকে হাসান বলেছেন। দেখুন : আল আহকামুল উসতা : ১/১০৫; সিলসিলাহ সহীহাহ : ২/৫৪১-৫৪২।

দেওয়ার সাথে সাথে তাঁর রাসূলের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। সংক্ষেপণের জন্য আমরা মাত্র দুটি আয়াতের অনুবাদ উল্লেখ করছি। তিনি বলেন :

وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হও।"[১০১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং শোনার পরও তোমরা তা থেকে বিমুখ হোয়ো না।"[১০২]

এভাবে কুরআন মাজীদে যেখানেই আল্লাহ তাআলা নিজের আনুগত্যের কথা বলেছেন সেখানে রাসূলের আনুগত্যের কথাও বলেছেন। একটি স্থানও এমন নেই যেখানে তিনি নিজের আনুগত্যের কথা বলেছেন কিন্তু রাসূলের আনুগত্যের কথা বলেননি। তবে এমন কিছু আয়াত আছে যেখানে রাসূলের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর আনুগত্যের কথা বলা হয়নি। যেমন একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَأَقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

"তোমরা সালাত আদায় করো, যাকাত প্রদান করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো—তাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে।"[১০৩]

এছাড়া আল কুরআনে রাসূলের আনুগত্যকেই আল্লাহর আনুগত্য বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও আল্লাহর আনুগত্যকে রাসূলের আনুগত্য বলা হয়নি। ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ.

---

১০১. সূরা [৮] আনফাল, আয়াত : ০১।
১০২. সূরা [৮] আনফাল, আয়াত : ২০।
১০৩. সূরা [২৪] নূর, আয়াত : ৫৬।

"যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল।"[১০৪]

তাছাড়া অনেক আয়াতে রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ইতাআত বা আনুগত্য বলা হয় আদেশ-নিষেধ মান্য করাকে আর ইত্তিবা' বা অনুসরণ বলা হয় কাউকে অনুকরণ করে হুবহু তার মতো কর্ম করাকে। আল কুরআনে বারবার এভাবে রাসূলের কর্মের অনুসণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। আমরা শুধু দুটি আয়াত উল্লেখ করছি। আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"(হে নবী) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তাহলে আমার অনুসরণ করো। এতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।"[১০৫]

অন্যত্র মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَآمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ.

"আপনি বলে দিন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূল, যিনি সমস্ত আসমান-জমিনের মালিক, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, যিনি উম্মি নবী, যিনি নিজে আল্লাহ ও তাঁর বাণীসমূহে ঈমান রাখেন। এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ করো, তাতে তোমরা পথের দিশা পাবে।"[১০৬]

১০৪. সূরা [৪] নিসা, আয়াত : ৮০।
১০৫. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ৩১।
১০৬. সূরা [৭] আ'রাফ, আয়াত : ১৫৮।

যে ব্যক্তি ইত্তিবা' বা অনুসরণ শব্দের অর্থ জানেন তিনি কিছুতেই বলতে পারেন না যে, রাসূলের কর্মের অনুকরণ ছাড়া শুধু কুরআন মানলেই তাঁর ইত্তিবা' হয়ে যাবে। কেননা কুরআনে রাসূলের কর্ম বর্ণিত হয়নি। রাসূলের কথা, কর্ম ও কর্মপদ্ধতি হাদীস ও সুন্নাহ নামে সংকলিত হয়েছে এবং আমালে মুতাওয়ারাসের মাধ্যমে প্রজন্ম পরম্পরায় সকল যুগের উম্মাতের কাছে পৌঁছেছে।

এবং শুধু কুরআন মান্য করা বা আল্লাহর আনুগত্যের মাধ্যমে রাসূলেরও আনুগত্য হয়ে যায়—কুরআনের আলোকে এ দাবিও করা যায় না। কেননা কুরআনে কোথাও আল্লাহর আনুগত্যকে রাসূলের আনুগত্য বলে সাব্যস্ত করা হয়নি। বরং বিপরীতে রাসূলের আনুগত্যকে আল্লাহর আনুগত্য বলে গণ্য করা হয়েছে। সুতরাং কুরআনের আলোকে এ দাবি যথার্থ যে, রাসূলের আনুগত্য করলে বা হাদীস-সুন্নাহ মেনে চললে যেমন আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য হয়, তেমনি রাসূলের অনুসরণ ও অনুকরণ হয়ে যায় এবং পরিপূর্ণরূপে কুরআনও মান্য করা হয়ে যায়। কেননা নবীজি ছিলেন পরিপূর্ণ জীবন্ত কুরআন। আর হাদীস শরীফে নবীজির আনুগত্যের জন্য তাঁর কর্মের প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত বর্ণনা সংরক্ষিত রয়েছে।

এ কথাও স্মর্তব্য যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিয়ন, রাষ্ট্রপতি বা রাষ্ট্রদূতের সাথে তুলনীয় নন। পিয়ন শুধুই সংবাদবাহক। ভেতরের সংবাদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। বহন করা সংবাদের সে ব্যাখ্যাকারও নয়, তার বিধিবিধানের উপর আমল করার নমুনাও নয়। তেমনি রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ আইন বটে। তবে তিনি নাগরিকদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ নন। আর রাষ্ট্রদূত তো কেবলই সংশ্লিষ্ট দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের বক্তব্য-বিবৃতির প্রতিনিধি। পক্ষান্তরে আল কুরআনের আলোকে আল্লাহর রাসূল বার্তাবাহক, তার অনুমোদিত ও নির্বাচিত ব্যাখ্যাকার এবং তার উপর আমল করার একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ। আল কুরআনের আলোকে এটাও প্রমাণিত যে, মহান আল্লাহর প্রেরিত বার্তা কেবল আল কুরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। কুরআনে সংকলিত বার্তার বাইরেও তিনি অনেক বার্তা প্রেরণ করেছেন। নবীজিই এ সকল বার্তার বাহক এবং পালনের আদর্শ।

রাসূলের আনুগত্য সর্বকালে আবশ্যক

মহান আল্লাহ তাঁর নিজের আনুগত্যের মতোই তাঁর রাসূলের আনুগত্য ফরয করেছেন। এ আনুগত্য তাঁর দলনেতা বা রাষ্ট্রনেতা হিসাবে নয়, বরং রাসূল হিসাবে। এ বিষয়ক নির্দেশনায় আল কুরআনে সর্বত্র 'রাসূল' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন, রাসূলের রিসালাতে বিশ্বাসী, সে যে দেশ-কালের মানুষই হোক না কেন, তার উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য আবশ্যক। কেননা যে কারো যেকোনো ধরনের নেতৃত্ব তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত তাঁর জীবদ্দশা ও মৃত্যু-পরবর্তী কাল—সর্বকাল পরিব্যাপ্ত।

কেউ কেউ দাবি করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য এবং তাঁর ব্যাখ্যা মান্য করার আবশ্যকতা কেবল তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর আনুগত্য আবশ্যক নয়। এ কথা কুরআন বিরোধী। কেননা কুরআন আদেশ করেছে, রাসূলের আনুগত্য করো। আর এ রাসূলের রিসালাতের মেয়াদ রেখেছে সর্বকালব্যাপী। কুরআনের কোনো একটি আয়াতে ইশারায়ও বলা হয়নি যে, রাসূলের এই আনুগত্য শুধু তাঁর জীবদ্দশার সাথে সম্পৃক্ত।

এই ভাইয়েরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা বা অনেক হাদীসকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক দাবি করে বাতিল করে দেন। এখন আমরা দেখব তাদের কৃত আয়াতে কারীমার এই ব্যাখ্যা কতটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা তা যতক্ষণ আঁকড়ে থাকবে পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত।[১০৭]

---

১০৭. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ১৮৭৪।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন :

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে বেঁচে থাকবে সে অসংখ্য মতবিরোধ দেখতে পাবে। তখন তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত আঁকড়ে ধরা। তোমরা তা দাঁতে কামড়ে ধরে রাখবে।[১০৮]

অন্য হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.

যে অস্বীকার করল সে ব্যতীত আমার সকল উম্মাত জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, কে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল আর যে আমার অবাধ্য হলো সে অস্বীকার করল।[১০৯]

এ সকল হাদীস দ্বারা আল কুরআনের রাসূলের আনুগত্য বিষয়ক নির্দেশনার এই অর্থ সুস্পষ্ট হলো যে, তাঁর সকল উম্মাত সর্বকালে—তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরেও—তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ-অনুকরণ করতে বাধ্য। এ আনুগত্য ও অনুসরণ-অনুকরণের সম্পর্ক রাসূল ও উম্মাতের সাথে। যতদিন তাঁর রিসালাত থাকবে ততদিন তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণ আবশ্যক থাকবে। আর যে ব্যক্তিই নিজেকে তাঁর উম্মাত বলে দাবি করবে তার উপরেই তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ বাধ্যতামূলকভাবে সাব্যস্ত হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে তো তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী কালে আনুগত্যের কথা সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে।

---

১০৮. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭১৪৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৬০৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৭৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ৫; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩৩১, ৩৩২। ইমাম তিরমিযি, ইবন হিব্বান, হাকিম, আবু নুআইম, ইবনুল মুলাক্কিন, ইবন হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে প্রমাণিত বলেছেন।

১০৯. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৭২৮০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৮৭২৮।

কুরআন মানলেই কি রাসূলের আনুগত্য পরিপূর্ণ হয়

কুরআন মানলেই কি রাসূলের আনুগত্য পরিপূর্ণ হয়?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পূর্বের আলোচনায় পেয়ে গেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আনুগত্য ও অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে নাযিল হওয়া আয়াতগুলোকে যখন হাদীস মান্য করার আবশ্যকতার পক্ষে উদ্ধৃত করা হয় তখন হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন মানতে আদিষ্ট ছিলেন। সারা জীবন তিনি কুরআনই মান্য করে গেছেন। তাই কুরআন মানলেই তাঁর আনুগত্য হয়ে যায়। সুতরাং এ সকল আয়াত দ্বারা হাদীস মান্য করার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না। তাদের এ দাবির ভ্রান্তিও উপরের আলোচনায় প্রস্ফুটিত হয়েছে।

তাছাড়া 'কুরআন-বহির্ভূত ওহি নাযিলের কারণ কী' শিরোনামের আলোচনায় আমরা দেখব, মহান আল্লাহ রাসূলের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে চায় কুরআন-বহির্ভূত ওহির নির্দেশনা প্রতিপালনের মাধ্যমে। সুতরাং কেউ কুরআনের অতিরিক্ত ওহি, অর্থাৎ হাদীস না মানলে নবীজির আনুগত্যের পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহি মানতে আদিষ্ট ছিলেন। তাই তিনি মহান আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসাবে ওহির নির্দেশনা পরিপূর্ণরূপে প্রতিপালন করেছেন—সে ওহি আল কুরআনে সংকলিত হোক অথবা আল কুরআনের অতিরিক্ত হোক। অতএব কেউ যদি শুধু আল কুরআনে বর্ণিত বিধিবিধান প্রতিপালন করে আর হাদীস অমান্য করে সে যেমন আংশিক ওহি মান্য করল তেমনিভাবে আল্লাহ ও রাসূলেরও আংশিক ও খণ্ডিতভাবে আনুগত্য করল। সে 'কুরআন দ্বারা প্রমাণিত' কুরআন-বহির্ভূত ওহিকে অস্বীকার করল। এবং যে সকল আয়াতে কুরআন-বহির্ভূত ওহি মানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আল কুরআনের সেসব আয়াতকেও অস্বীকার করল। কুরআনের আলোকে এটা ভয়ংকর অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ.

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করবে আর কিছু অংশ

> অস্বীকার করবে? তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এমনটি করবে তার প্রতিদান এ ছাড়া আর কী হবে যে, পার্থিব জীবনে তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনা আর কিয়ামতের দিন তাকে নিয়ে যাওয়া হবে কঠোর আযাবের দিকে!"[১১০]

তাছাড়া হাদীস মান্য করা ব্যতীত কুরআনের উপর আমল করা এবং এ পরিমাণ নবীজির আনুগত্য করাও সম্ভব নয়। কেননা কুরআনে বর্ণিত কোন বিধানটির কী মর্ম তিনি বুঝেছেন এবং কীভাবে তার উপর আমল করেছেন তা হাদীস ছাড়া কুরআন থেকে জানা যায় না। আর ঐতিহাসিক সূত্রে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীন হিসাবে কুরআন-বহির্ভূত অনেক কিছু পালন করেছেন। অথচ আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) তাঁর সমগ্র জীবনকেই 'কুরআন' বলে দাবি করেছেন। কেননা তাঁর কুরআনের অতিরিক্ত আমলগুলোও ওহির নির্দেশনা। আর কুরআনের অতিরিক্ত এই সকল ওহি মান্য করা আল কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াতের নির্দেশনা।

সা'দ ইবন হিশাম (রাহ.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন :

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللهِ: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

তাঁর আখলাক ছিল কুরআন। তুমি কি কুরআন কারীমে মহান আল্লাহর এই বাণী পড়োনি, 'নিশ্চয় আপনি আছেন সুমহান আখলাকের উপর।'?[১১১]

সুতরাং হাদীস অস্বীকার করে কুরআন মানা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের দাবি করা বাতুলতা এবং অর্থহীন প্রলাপ মাত্র।

কুরআন-বহির্ভূত ওহির গুরুত্ব ও মর্যাদা

আমরা দেখছি, আল কুরআনের বেশ কিছু আয়াত সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআনের

---

১১০. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ৮৫।

১১১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৪৬০১।

অতিরিক্ত ওহি নাযিল করেছেন। আর এর ব্যাখ্যায় হাদীস শরীফ আমাদের জানাচ্ছে, তার পরিমাণ কুরআনের অনুরূপ বা তারও অধিক।

এখন কোনো ব্যক্তি যদি এ দাবি করে যে, আমি কুরআনের অতিরিক্ত ওহি তথা হাদীস মানি না, তবে কুরআন মানি। তার এ দাবি যথার্থ নয়। সে মূলত ওহিই অস্বীকারকারী। আল কুরআনের এ সকল আয়াত অস্বীকারের পাশাপাশি এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত বিপুল সংখ্যক (অর্থাৎ কুরআনের সমপরিমাণ বা তারও অধিক) ওহি সে অস্বীকার করছে।

ওহি, যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, তা কুরআনে সংকলিত হোক আর না হোক, বিশ্বাসে ও বিধান প্রণয়নে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা অপরিসীম। বেশ কিছু হাদীসে কুরআন-বহির্ভূত ওহিকে কুরআনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অন্য হাদীসে এসেছে, মিকদাম (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

أَلَا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ.

"শুনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল যা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন তা মহান আল্লাহ নিষিদ্ধ করার মতোই।"[১১২]

আমরা আল কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে জানি। হাদীস শরীফে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের অতিরিক্ত ওহিকেও 'আল্লাহর কিতাব' বলে অভিহিত করেছেন। আবু হুরাইরা (রা.) ও যাইদ ইবন খালিদ জুহানি (রা.) বলেন :

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِيْ كَانَ عَسِيْفًا عَلٰى هٰذَا فَزَنٰى بِامْرَأَتِهِ فَقَالُوْا لِيْ: عَلٰى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ

১১২. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৬৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ১২; সুনান দারিমি, হাদীস : ৬০৬। ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন; ইবনুল মুলাক্কিন, আলবানি প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

فَقَالُوْا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هٰذَا فَارْجُمْهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

এক বেদুইন এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করে দিন। তখন তার প্রতিপক্ষ দাঁড়িয়ে বলল, জি, সে ঠিকই বলেছে, আপনি আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব মোতাবেক ফায়সালা করুন। তারপর বেদুইন লোকটি বলল, আমার ছেলে এই লোকটির বাড়িতে কাজ করত। এমতাবস্থায় সে লোকটির স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করে। লোকেরা বলল, তোমার ছেলের উপর রজম আবশ্যক হয়ে গেছে। তখন আমি একশত ছাগল ও একটি দাসীর বিনিময়ে এর কাছ থেকে ছেলেকে মুক্ত করে আনি। তারপর আলিমদের জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন, তোমার ছেলের উপর একশ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন ওয়াজিব হয়েছে। এসব শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে 'আল্লাহর কিতাব' অনুযায়ী ফায়সালা করব। দাসী ও ছাগল তুমি ফেরত পাবে। আর তোমার ছেলেকে একশ বেত্রাঘাত ও এক বছরের নির্বাসন দেওয়া হবে। আর তুমি হে উনাইস, এই লোকের স্ত্রীর কাছে যাবে এবং তাকে রজম করবে। উনাইস তার নিকট গিয়ে তাকে রজম করে।[১১৩]

ইমাম কুরতুবি (রাহ.) বলেন, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমাদের মাঝে 'আল্লাহর কিতাব' অনুযায়ী ফায়সালা করে দেব। অতঃপর রজমের ফায়সালা করেছেন। কিন্তু রজমের বিধান আল কুরআনে লিপিবদ্ধ নেই। অর্থাৎ এখানে তিনি 'আল্লাহর কিতাব' বলে 'আল্লাহর বিধান' বুঝিয়েছেন।[১১৪] যে বিধান আল কুরআনে উল্লেখ নেই, বরং কুরআনের অতিরিক্ত ওহির মাধ্যমে এসেছে।

---

১১৩. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ১৭৬০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭০৪২; সহীহ বুখারি, হাদীস : ২৬৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৯৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪৪৪৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ১৪৩৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস : ৫৪১১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ২৫৪৯।

১১৪. কুরতুবি, আল জামি' লি-আহকামিল কুরআন : ২০/১৪৩।

আল কুরআনেও 'আল্লাহর কিতাব' শব্দবন্ধ 'আল্লাহর বিধান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ.

> "এবং তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়েছে তারা ব্যতীত সকল সধবা নারী তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ; এটা তোমাদের উপর (কিতাবুল্লাহ বা) আল্লাহর বিধান।"[১১৫]

কুরআন-বহির্ভূত ওহি নাযিলের কারণ কী

এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, মহান আল্লাহ শরীআতের বিধান-সংবলিত সকল ওহি আল কুরআনের অন্তর্ভুক্ত না করে কিছু বিধান কুরআনের বাইরে কেন রাখলেন, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কুরআন' বলে দাবি না করে উম্মাতকে শিক্ষা দিলেন—যা আমাদের কাছে 'হাদীস' বা 'সুন্নাহ' নামে সংকলিত?

আল্লাহর আনুগত্যের পাশাপাশি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যও আবশ্যক। আল কুরআনে মহান আল্লাহ বারংবার নিজের আনুগত্যের সাথে সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। বিশ্বাসী মানুষ আল্লাহর হুকুম আল্লাহর জন্য পালন করে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে। এ বিধান নবীজিই মানুষকে জানান এবং আমলের পদ্ধতিও তিনিই শেখান। এভাবে নবীজির দেওয়া সংবাদের উপর বিশ্বাস করে তাঁর শেখানো পদ্ধতিতে আমল করার দ্বারা যদিও নবীজির আনুগত্য প্রকাশ পায়, তবুও মহান আল্লাহ চান, আরো সুস্পষ্টভাবে নবীজির আনুগত্যের বিষয়টি পরখ করতে। এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু ওহি এমনভাবে নাযিল করেন, যা কুরআন হিসাবে উদ্ধৃত না করে বিবৃত বিধানকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই ঘোষণা করেন। বিষয়টি আল কুরআনে সুস্পষ্টরূপেই বর্ণিত হয়েছে।

মাদানি জীবনের শুরুতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে মুসলিমদের নিয়ে সালাত আদায় করতেন।

---

১১৫. সূরা [৪] নিসা, আয়াত : ২৪। আরো দেখুন : সূরা [৮] আনফাল, আয়াত : ৭৫; সূরা [৩৩] আহযাব, আয়াত : ০৬।

সতেরো মাস পর কুরআন কারীম এ বিধানকে রহিত করে নতুন বিধান জারি করে :

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ.

"(হে নবী) আমি বারবার আপনার চেহারাকে আকাশের দিকে ফেরাতে দেখছি। সুতরাং আমি আপনাকে আপনার পছন্দনীয় কিবলার দিকেই ফিরিয়ে দেব। সুতরাং আপনি এবার আপনার চেহারাকে মসজিদুল হারামের দিকে ফেরান। আর তোমরা যেখানেই থাকো তোমাদের চেহারাকে সেদিকেই ফেরাবে।"[১১৬]

বাইতুল্লাহ বা কা'বাকে কিবলা করার এই বিধান আসার পর কিছু মানুষ নানাভাবে আপত্তি উত্থাপন করতে থাকে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের জবাবে বলেন :

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ.

"আপনি পূর্বে যে কিবলার উপর ছিলেন আমি তা নির্ধারণ করেছিলাম এ কথা জেনে নিতে যে, কে রাসূলের আনুগত্য করে আর কে পিছুটান দেয়।"[১১৭]

এ আয়াতে দুটি বিষয় লক্ষ করুন : ১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্বে যে কিবলার উপর ছিলেন, অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস, মহান আল্লাহ বলেন, 'এ বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমিই কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করেছিলাম।' কিন্তু আল কুরআনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করার নির্দেশ বিষয়ক কোনো আয়াত নেই। তাহলে বোঝা গেল, এ বিধান নির্ধারিত হয়েছিল কুরআন-বহির্ভূত ওহির মাধ্যমে। ২. তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন, এ বিধানটি আমি এভাবে দিয়েছিলাম এ কথা জেনে নিতে যে, কে আমার রাসূলের আনুগত্য করে আর কে পিছুটান দেয়। অর্থাৎ এ কথা পরিষ্কার যে, কুরআন-বহির্ভূত এ ওহি ছিল মানুষের

---

১১৬. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ১৪৪।

১১৭. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ১৪৩।

কাছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের পরীক্ষা নেবারজন্য।[১১৮]

সুতরাং যারা কুরআনের অতিরিক্ত ওহি, অর্থাৎ হাদীসকে অস্বীকার করে তারা মহান আল্লাহর এ পরীক্ষায় অকৃতকার্য, অনুত্তীর্ণ—আল কুরআনের অগণিত স্থানে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে, মহান আল্লাহর সে আদেশ অমান্যকারী বলে গণ্য।

কুরআনের অতিরিক্ত ওহি : সাহাবিদের বুঝ

তাবিয়ি আলকমা (রাহ.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) হাদীসে নিষিদ্ধ কিছু কাজ সম্পাদনকারী নারীর উপর অভিশাপ করেন। তখন বনি আসাদের উম্মু ইয়াকুব নামের এক মহিলা এসে তাঁকে বলেন, আপনি নাকি এই এই নারীর উপর অভিশাপ করেন? তিনি বলেন, কেন তাকে অভিশাপ করব না, যাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন? যার কথা আল্লাহর কিতাবে আছে? তখন ওই মহিলা বলেন, আমি পুরো কুরআন পড়েছি। কিন্তু আপনি যা বলছেন তা তাতে কোথাও পাইনি। ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, তুমি যদি কুরআন পড়তে তবে অবশ্যই পেতে। তুমি কি পড়োনি, মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

> "যা রাসূল নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।?"[১১৯]

তখন মহিলাটি বললেন, অবশ্যই। ইবন মাসউদ (রা.) বললেন, জি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো সম্পর্কে নিষেধ করেছেন।[১২০]

দেখুন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) এ আয়াতটিকে হাদীসের প্রামাণ্যতার পক্ষে—হাদীসের ওহি হওয়া, শরীআতের দলীল হওয়ার পক্ষে—প্রমাণ

---

১১৮. ইবন কাসীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম : ১/৪৫৭-৪৫৮; মাওদূদি, সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা, পৃ. ৮৩-৮৩ ও ১৯০-১৯৫; তাকি উসমানি, হাদীসের প্রামাণ্যতা, পৃ. ৩৮-৪০।

১১৯. সূরা [৫৯] হাশর, আয়াত : ০৭।

১২০. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৮৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১২৫।

হিসাবে পেশ করছেন এবং হাদীসের বিধিবিধানকে কুরআনে থাকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করছেন। কিন্তু হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় আয়াতের এ ব্যাখ্যা মানেন না। তারা বলেন, এ আয়াত হাদীসের প্রামাণ্যতার দলীল নয়। কেননা আয়াতে বলা হয়েছে, 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ করো। আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।' রাসূল নিয়ে এসেছেন কুরআন আর কুরআনের আদেশ-নিষেধই তিনি প্রচার করেছেন। সুতরাং এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে, তোমরা রাসূলের নিয়ে আসা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। এর বাইরের কিছু মান্য করার কথা এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় না।

কিন্তু আমরা তো কিছুতেই এ কথা মানতে পারি না যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবিদের থেকে এইসব হাদীস অস্বীকারকারী ব্যক্তিবর্গ কুরআনের মর্ম ভালো বোঝেন। কুরআন নাযিল হয়েছে তাঁদের সামনে, তাঁরা রাসূলের কাছ থেকে তার ব্যাখ্যা শিখেছেন, তাঁরাই কুরআনের বিশুদ্ধ মর্মের উপর সব থেকে নিখুঁতভাবে আমলকারী, যে কারণে আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে তাঁদের উপর নিজের সন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন। উপরন্তু এই ব্যাখ্যা তো সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَا حَدَّثَكُمْ ابْنُ مَسْعُوْدٍ فَصَدِّقُوْهُ.

ইবন মাসউদ তোমাদেরকে যা বর্ণনা করে তোমরা তা সত্য বলে মেনে নেবে।[১২১]

[তাবিয়ি প্রজন্মও সূরা হাশরের ৭ নং আয়াতটি হাদীসের প্রামাণ্যতার পক্ষে দলীল বলে বিশ্বাস করতেন। যেমন তাবিয়ি ইসমাঈল ইবন উবাইদুল্লাহ (রাহ.) বলেন :

يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نَحْفَظَ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحْفَظُ الْقُرْآنُ لِأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ.

১২১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৩২৭৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩৭৯৯। সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ৩৯০২। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযি ও ইবন হিব্বান প্রমাণিত বলেছেন।

আমাদের কর্তব্য কুরআনের মতোই গুরুত্ব দিয়ে হাদীস মুখস্থ ও সংরক্ষণ করা। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তোমরা তা গ্রহণ করো।][১২২]

তাবিয়ি উমাইয়া ইবন আব্দুল্লাহ (রাহ.) আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-কে বলেন, আমরা আবাসের সালাতের কথা এবং ভীতির সালাতের কথা কুরআনে পেয়েছি, কিন্তু সফরের সালাতের কথা তো কুরআনে পাইনি? উত্তরে ইবন উমার (রা.) বলেন :

يَا ابْنَ أَخِيْ! إِنَّ اللهَ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ.

হে ভাতিজা, আল্লাহ আমাদের নিকট মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন, তখন আমরা তো কিছুই জানতাম না। তাই আমরা তেমন আমল করি তাঁকে যেমন করতে দেখেছি।[১২৩]

কুরআনের অতিরিক্ত ওহির ব্যাপারে সাহাবিদের ঈমান-আকীদা এমনই ছিল। আর আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে তাঁদের মতো ঈমান-আকীদা গ্রহণের। তাঁদের বিপরীত ঈমান-আকীদা ধারণকারীর ঈমানের দাবিকে নাকোচ করে দিয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ.

"কিছু মানুষ দাবি করে, আমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান এনেছি; কিন্তু তারা মুমিন নয়।" [১২৪]

১২২. খতীব বাগদাদি, আল কিফায়াহ : ১৭; ইবন আসাকির, তারীখ দিমাশ্‌ক, ৮/৪৩৬; মিয্‌যি, তাহযীবুল কামাল, ৩/১৪।

১২৩. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ৩৭৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৫৬৮৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস : ১৪৩৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ১০৬৬; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস : ৯৪৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ১৪৫১, ২৭৩৫, মুস্তাদরাক, হাদীস : ৯৪৬; জিয়া মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ : ১৩/১৩৭। হাদীসটিকে ইবন খুযাইমা, ইবন হিব্বান, হাকিম, জিয়া মাকদিসি প্রমুখ মুহাদ্দিস প্রমাণিত বলেছেন।

১২৪. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ০৮।
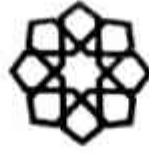
হাদীস সুসংরক্ষিত

উপরের আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে, হাদীসও ওহি। কুরআনের অতিরিক্ত ওহি। এ ওহির মাধ্যমেও মহান আল্লাহ্ অনেক বিধিবিধান প্রদান করেছেন। এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য তা মান্য করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীস সংরক্ষিত থাকা জরুরি। কেননা যে বিধান সংরক্ষিত থাকবে না তার উপর আমল করা সম্ভব হবে না। আর মহান আল্লাহ্ অসম্ভব কোনো বিধান প্রদান করেন না। তিনি বলেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

> "আল্লাহ্ কারো উপর তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না।" [১২৫]

আমরা হাদীস সংরক্ষণের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব, হাদীস এমন সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে মানব ইতিহাসের অন্য কোনো পর্ব, এমনকি কোনো একটি তথ্যও এত মজবুতভাবে সংরক্ষিত হতে পারেনি। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য অবশ্যমান্য এ সকল হাদীস সংরক্ষণে ছিল মহান আল্লাহর কুদরতি ইশারা। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত-বিস্তারিত প্রচুর বই-পুস্তক লেখা হয়েছে। আমাদের এ পুস্তকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা শুধু সংক্ষিপ্ত

---

১২৫. সূরা [২] বাকারাহ্, আয়াত : ২৮৬।

ইঙ্গিত দিয়ে যাব। মৌলিক ধারণা লাভ এবং আশ্বস্ত হবার জন্য এতটুকু আলোচনাও যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ। তবে যারা বিস্তারিত ও পরিপূর্ণরূপে জানতে চান তাদের জন্য কর্তব্য শাস্ত্রীয় কিতাবাদি পর্যাপ্ত অধ্যয়ন করা।

হাদীস সংরক্ষণে নবীজির নির্দেশনা

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মূর্ত ইসলাম। মানব জাতি ইসলাম প্রতিপালনের ক্ষেত্রে এই জীবন্ত ইসলামের অনুসরণ-অনুকরণে আদিষ্ট। কেবল সাহাবায়ে কিরাম নয়, পরবর্তী সকল যুগের সকল মানুষও এই বিধানের আওতাভুক্ত। সাহাবিগণ তো সরাসরি তাঁকে দেখে তাঁর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু পরবর্তী মানব সমাজও যেন তাঁর জীবনাদর্শ তথা হাদীস-সুন্নাহ জানতে ও মানতে পারে এজন্য তিনি সাহাবিদেরকে তাঁর সুন্নাহ সংরক্ষণ ও পরবর্তীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বিভিন্নভাবে নির্দেশ, নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন।

প্রথমত, কর্মের মাধ্যমে সংরক্ষণ। কোনো বিষয় প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিনিয়ত প্রতিপালন করলে তা ভুলে যাওয়ার বা তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না; বরং অবিকল সংরক্ষিত হয়ে থাকে। সাহাবিগণ (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাচার অনুপুঙ্খ প্রতিপালনে আদিষ্ট ছিলেন—একে তো শরয়ি নির্দেশনা, দ্বিতীয়ত ভালোবাসার দাবি। মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.

"(হে নবী) আপনি বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তবে আমার অনুসরণ করো। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি মার্জনা করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। (আরো) বলে দিন, তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। আর যদি বিমুখ হও, তবে (জেনে রাখো) আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ভালোবাসেন না।"[১২৬]

---

১২৬. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ৩১-৩২।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنِ اسْتَنَّ بِيْ فَهُوَ مِنِّيْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

যে ব্যক্তি আমার জীবনাচার প্রতিপালন করে সে আমার উম্মাত, আর যে আমার জীবনাচার থেকে বিমুখ থাকল তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।[১২৭]

তিনি আরো বলেছেন :

مَنْ أَحْيَا سُنَّتِيْ فَقَدْ أَحَبَّنِيْ وَمَنْ أَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ.

যে ব্যক্তিজীবনে প্রতিপালনের মাধ্যমে আমার জীবনাচারকে জীবিত রাখল সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সাথে জান্নাতেথাকবে।[১২৮]

দ্বিতীয়ত, মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ। সাহাবিদের নিকট নবীজির ব্যক্তিত্ব সাধারণ কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাঁর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা যেমন অতুলনীয় ছিল, তেমনিভাবে তাঁরা সমস্ত অন্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন যে, এই মহান ব্যক্তির অনুসরণ ও অনুকণের মধ্যেই রয়েছে তাঁদের জীবনের একমাত্র সফলতা। তাই তাঁরা তাঁর সকল কর্ম যেমন গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করতেন, তেমনি তাঁর কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতেন। এবং তা আত্মস্থ ও মুখস্থকরণে সবিশেষ প্রচেষ্টা নিবিষ্ট রাখতেন। উপরন্তু তাঁরা এ বিষয়ে আদিষ্ট ছিলেন।

নবীজির মজলিসে কখনো কখনো ইয়াহুদিরাও বসতো। তারা নবীজিকে লক্ষ করে বলত, 'রায়িনা'। এ শব্দের সাধারণ অর্থ 'আমাদের প্রতি লক্ষ করুন'। শব্দটির আরেকটি অর্থ 'আমাদের রাখাল' বা 'নির্বোধ ব্যক্তি'। বাহ্যিকভাবে তারা প্রথম অর্থ বোঝালেও, তাদের উদ্দিষ্ট ছিল দ্বিতীয় অর্থ। এভাবে তারা নবীজিকে নিয়ে উপহাস করত। সাহাবিদের কেউ কেউ সরলভাবে প্রথম অর্থে শব্দটি নবীজির উদ্দেশে প্রয়োগ করতেন। মহান

---

১২৭. জামি' মা'মার ইবন রাশিদ, হাদীস : ২০৫৬৮ (মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১১/২৯১)। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহ.) বলেন, হাদীসটির সনদ মুরসালরূপে সহীহ। এছাড়া বিভিন্ন সনদের আলোকে হাদীসটি মুত্তাসিল হিসাবেও গ্রহণযোগ্য। দেখুন : এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৫৯।

১২৮. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৭৮; তাবারানি, আল মু'জামুস সগীর, হাদীস : ৮৫৬।

আল্লাহ সাহাবিদের এই শব্দ ব্যবহার সংশোধন করে দিয়ে 'রায়িনা'র পরিবর্তে ওই অর্থে 'উনযুরনা' শব্দ ব্যবহারের নির্দেশ দেন এবং আরো নির্দেশ দেন, 'وَاسْمَعُوا' এবং তোমরা শ্রবণ করো।

এখানে যদিও 'শ্রবণ করো' ক্রিয়ার কর্ম উল্লেখ নেই, তবুও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় সুস্পষ্টই বোঝা যায়, এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা নবীর কথা শ্রবণ করো—এমনভাবে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো যেন পুনরায় জিজ্ঞাসা করা না লাগে।[১২৯] অর্থাৎ আল কুরআনেই মহান আল্লাহ সাহাবিদেরকে বিশেষ মনোনিবেশ সহকারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন, যেন বোঝার জন্য দ্বিতীয়বার আর প্রশ্ন করা না লাগে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ [كَمَا سَمِعَهُ].

আল্লাহ ওই ব্যক্তিকে প্রফুল্ল রাখুন, যে আমার কোনো হাদীস শুনল এবং মুখস্থ করল, অতঃপর যেমনটি শুনেছে হুবহু অপরের কাছে পৌঁছে দিল।[১৩০]

তৃতীয়ত, লেখার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা। লিখে রাখা কোনো কিছু সংরক্ষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখার মাধ্যমেও তাঁর হাদীস সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) বলেন, নবীজি তাঁর ঠোঁট দুটির দিকে ইশারা করে বলেন :

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِمَّا بَيْنَهُمَا إِلَّا حَقٌّ فَاكْتُبْ.

যার হাতে আমার প্রাণ সেই সত্তার কসম, আমার মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া কিছুই বের হয় না। সুতরাং তা লিখে রাখবে।[১৩১]

আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আনসারি এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে বসে হাদীস শুনত। তা তার খুব ভালো লাগত।

---

১২৯. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ১০৪; ইদরীস কান্ধলভি, মাআরিফুল কুরআন, ১/৩৫৩-৩৫৪।

১৩০. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৫৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৬০; সুনান দারিমি, হাদীস : ২৩৬; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস : ৫২৯৬।

১৩১. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩৫৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৪৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৬৫১০।

কিন্তু সে মনে রাখতে পারত না। একদিন সে নবীজিকে নিজের অবস্থা জানাল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত দিয়ে লেখার ইঙ্গিত করে বললেন :

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ عَلٰى حِفْظِكَ.

তুমি সংরক্ষণের জন্য তোমার ডান হাতের সাহায্য নেবে। অর্থাৎ লিখে রাখবে।[১৩২]

এ ধরনের আরো অনেক বর্ণনা হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু লিখে রাখার বা লিখে দেওয়ার বিশেষ নির্দেশও নবীজি দিতেন। যেমন ইয়ামানি এক ব্যক্তির জন্য মক্কা বিজয়ের সময় প্রদত্ত ভাষণ লিখে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে তিনি বলেন :

اُكْتُبُوْا لِأَبِيْ شَاهٍ.

(এ ভাষণটি) আবু শাহের জন্য লিখে দাও।[১৩৩]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, মৃত্যুশয্যায় যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগযন্ত্রণা তীব্র হয় তখন তিনি বলেন :

اِئْتُوْنِيْ بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَّا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ.

আমার কাছে তোমরা লেখার কিছু নিয়ে এসো। তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখিয়ে দেব পরবর্তীকালে তোমরা পথহারা হবে না।[১৩৪]

চতুর্থত, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা। কোনো বিষয় মানুষের নিত্যদিনের পারস্পরিক আলোচনায় পরিণত হলে তা ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এমনিভাবে কোনো বিষয় একক বা কতিপয় ব্যক্তির মাধ্যমে সংরক্ষিত হওয়ার চেয়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে সংরক্ষিত হওয়ার শক্তি অনেক বেশি। এ বিষয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

১৩২. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৬৬; মুসনাদ বাযযার, হাদীস : ৮৯৮৯। হাদীসটির সনদ দুর্বল। তবে এর সমর্থক সহীহ বর্ণনা রয়েছে। দেখুন : ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ৮/২৫; সাখাবি, আল মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ. ১০৮-১১০; আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ, ৬/২৮১-২৮২।

১৩৩. সহীহ বুখারি, হাদীস : ২৪৩৪, ৬৮৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৩৫৫।

১৩৪. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১১৪; মুসনাদ আহামাদ, হাদীস : ১৯৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৩৭।

ওয়া সাল্লাম নির্দেশনা ও উৎসাহ দিয়েছেন, যারা তাঁর কাছ থেকে কোনো কথা শুনবে তারা যেন যারা শোনেনি তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এভাবে সমাজের সকলের কাছে এটা পৌঁছে যাবে এবং নিয়মিত তার আলোচনা হতে থাকবে। তিনি বলেছেন :

نَضَّرَ اللهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَوَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إِلٰى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا.

আল্লাহ ওই বান্দাকে প্রফুল্ল রাখুন, যে আমার বক্তব্য শুনল এবং স্মরণ রাখল। অতঃপর যে শোনেনি তার কাছে পৌঁছে দিল।[১৩৫]

বিভিন্ন প্রসঙ্গে উপস্থিত সাহাবিদের মাঝে বক্তব্য দিয়ে তিনি তাঁদের নির্দেশ দিতেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দিতে, বলতেন :

أَلَا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

শোনো, উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেবে।[১৩৬]

এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন :

فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسٰى أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعٰى لَهُ مِنْهُ.

হয়তো উপস্থিত শ্রোতার চেয়ে যার কাছে সে পৌঁছে দেবে সে হবে অধিক স্মরণশক্তিরঅধিকারীসচেতনসংরক্ষণকারী।[১৩৭]

এভাবে বারবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতিতে হাদীস সংরক্ষণের নির্দেশ ও নির্দেশনা সাহাবিদেরকে দিয়েছেন। এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের কিতাবে বিদ্যমান। এ পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। তবে বাস্তবতা বোঝার জন্য আশা করি এতটুকু আলোচনাই যথেষ্ট হবে।

---

১৩৫. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৬৭৩৮; মুসনাদ দারিমি, হাদীস : ২৩৪; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস : ৭৪১৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ২৯৪। ইমাম হাকিম, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১৩৬. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৪০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৭৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ১২৭৮; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৭৮০৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৫৮১১।

১৩৭. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৬৭৯।

পরবর্তীদের নিকট হাদীস পৌছানোর নির্দেশ

উপরের আলোচনায় আমরা দেখেছি, নবীজি হাদীস সংরক্ষণের জন্য বিভিন্নভাবে বারবার তাকিদ দিয়েছেন। এ বিষয়ে উদ্ধৃত একাধিক হাদীসে পরবর্তীদের নিকট হাদীস পৌছে দেওয়ার নির্দেশও রয়েছে। এ মর্মে আরো অনেক হাদীস বিদ্যমান। একটি হাদীসে এসেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنِّيْ لَأُحَدِّثُكُمُ الْحَدِيْثَ فَلْيُحَدِّثِ الْحَاضِرُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ.

আমি তোমাদেরকে হাদীস শিক্ষা দিচ্ছি। এভাবে তোমরা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট হাদীস বর্ণনা করবে।[১৩৮]

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন :

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً.

আমার পক্ষ থেকে যা জানো পৌছে দাও, এমনকি যদি শুধু একটি বাণীও হয়।[১৩৯]

হাদীস কীভাবে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মের নিকট পৌছে যাবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে তিনি সাহাবিদেরকে বলেন :

تَسْمَعُوْنَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَّسْمَعُ مِنْكُمْ.

তোমরা শুনবে এবং তোমাদের কাছ থেকেও শোনা হবে। এরপর তাদের কাছ থেকে শোনা হবে।[১৪০]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বারবার বিভিন্নভাবে এই নির্দেশ দেওয়া থেকে আমরা বুঝতে পারছি, হাদীস সংরক্ষণ করা, প্রজন্ম পরম্পরায় উম্মাতের নিকট পৌছে দেওয়া এবং সর্বযুগের সকল উম্মাতের জন্য হাদীস মান্য করা তাঁর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

---

১৩৮. বুখারি, খলকু আফআলিল ইবাদ, পৃ. ৯১; মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস : ৪০৬। হাইসামি বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। দেখুন : মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/১৩৯।

১৩৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৬৪৮৬; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৩৪৬১; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৬৯; সুনান দারিমি, হাদীস : ৫৫৯।

১৪০. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৯৪৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৫৯; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ৬২; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩২৭।

হাদীস সংরক্ষণ ও সম্প্রচারে সাহাবিগণ

এ কথা বলা বাহুল্য যে, সাহাবিগণ তাঁদের সর্বসাধ্য দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ করেছেন এবং পরবর্তীদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতেন, নবীজির অনুসরণ-অনুকরণেই রয়েছে তাঁদের দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তি ও সফলতা। তাঁরা এ কথাও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, তাঁদের স্কন্ধে এক গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে—তাঁরা হবেন পরবর্তীদের নিকট ইসলাম পৌছানোর মাধ্যম এবং তাদের ইসলাম প্রতিপালনের আদর্শ। তাঁদেরকে মহান আল্লাহ বিশেষভাবে নির্বাচন করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন মানব সভ্যতার সর্বাধিক দায়িত্বশীল প্রজন্ম।

আমরা ইসলাম পালন করি দুনিয়ার ফাঁকে ফাঁকে। আর তাঁরা শুধুই ইসলাম পালন করতেন। তাঁরা তাঁদের দুনিয়াকেও আখিরাত বানিয়ে নিয়েছিলেন। নবীর সুন্নাহ বা আদর্শ প্রতিপালন ছাড়া তাঁদের জীবনে আর কোনো কাজ ছিল না। তিনি কখন কী বলেন, কখন কী করেন তা শোনা ও দেখার জন্য আবাসে-প্রবাসে সর্বদা তাঁর চারপাশে তাঁরা ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। এমনকি তাঁর অন্দরমহলের কাজও স্ত্রীদের দ্বারা রেকর্ড হতো। তাঁরা সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন, নবীর কোনো কথা-কাজ যেন জানার বাইরে না থাকে। এজন্য যারা সর্বদা তাঁর পাশে থাকতে পারতেন না তাঁরা কেউ কেউ অন্যের সাথে পালা করে নিতেন। এক সময় নিজে থাকতেন আর এক সময় তাকে রাখতেন। অনুপস্থিত ব্যক্তি উপস্থিত ব্যক্তির কাছ থেকে এ সময়ের কথাকর্ম জেনে নিতেন। উমার (রা.) যেমনটি তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছেন :

كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِيْ مِنَ الأَنْصَارِ فِيْ بَنِيْ أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِيْنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُوْلَ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

আমি ও আমার এক আনসারি প্রতিবেশী মদীনার উপকণ্ঠে বনি উমাইয়া ইবন যাইদে বাস করতাম। আমরা দুজন পালাক্রমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হতাম। একদিন তার পালা

আর একদিন আমার পালা। যেদিন আমার পালা হতো সেদিনের ওহি ও অন্যান্য বিষয়ের খবর নিয়ে আমি তার কাছে পৌছে দিতাম। আর তার পালার দিন তিনিও এমনই করতেন।[১৪১]

তাঁরা যখন নবীর কোনো নির্দেশনা শুনতেন, অথবা কোনো কাজ দেখতেন, আর জানতেন যে, এ কর্মটি নবীর জন্য খাস নয়, তা নির্দ্বিধায় পালন করে যেতেন। তার যৌক্তিকতা, উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তার বিবেচনা তাদেরকে দ্বিধান্বিত করত না। যেমন উমার (রা.) বলেছেন :

شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন এমন একটি কর্মও আমরা পরিত্যাগকরতেচাইনা।[১৪২]

তাবিয়ি মুজাহিদ (রাহ.) বলেন :

كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ لِمَ فَعَلْتَ؟
فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا فَفَعَلْتُ.

আমরা এক সফরে আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর সাথে ছিলাম। এক স্থান অতিক্রমের সময় তিনি একটু ঘুরে গেলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এমন করলেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন করতে দেখেছি, তাই আমিও করলাম।[১৪৩]

নবীর কথা শোনা ও মান্য করা তাঁদের কাছে নিজের জীবন থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নবীজি যখন কথা বলতেন তাঁরা পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে কান পেতে পিনপতন নীরবতার সাথে শুনতেন। যেমন উসামা ইবন শারীক (রা.) বলেছেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوْسِهِمُ الطَّيْرُ.

---

১৪১. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৮৯।
১৪২. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১৬০৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস : ৯২৭৭।
১৪৩. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৪৮৭০।

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলাম। তখন তাঁর চারপাশে সাহাবিগণ এমন স্থির হয়ে বসে ছিলেন, যেন তাঁদের মাথার উপর পাখিবসেআছে।[১৪৪]

প্রত্যেক সাহাবি তাঁর জানা ইলম মুখস্থ ও বিশুদ্ধ রাখার মেহনত করতেন, তার উপর আমল করতেন এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিতেন। মুআবিয়াহ (রা.) বলেন :

كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِقَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قُعُوْدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُقْعِدُكُمْ؟ قَالُوْا: صَلَّيْنَا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

একদিন আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন কিছু মানুষ মসজিদে বসে ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কী কাজে বসে আছো? তাঁরা বললেন, আমরা ফরয সালাত আদায় করে বসেছি—আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত নিয়ে আলোচনা করছি।[১৪৫]

বারা' ইবন আযিব (রা.) বলেন :

لَيْسَ كُلُّنَا سَمِعَ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَأَشْغَالٌ وَلٰكِنَّ النَّاسَ كَانُوْا لَا يَكْذِبُوْنَ يَوْمَئِذٍ فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

আমাদের সকলে সকল হাদীস সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনার সুযোগ পেত না। আমাদের খেত-খামারের ব্যস্ততা ছিল। তবে তখন মানুষ মিথ্যা বলত না। উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তিকে হাদীস শুনিয়ে দিত।[১৪৬]

---

১৪৪. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৮৪৫৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩৮৫৫।

১৪৫. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩২১।

১৪৬. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৪৩৮; খতীব বাগদাদি, আল কিফায়াহ, পৃ. ৩৮৫।

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন :

مَا كُلُّ الْحَدِيْثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتْ تَشْغَلُنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ الْإِبِلِ.

সকল হাদীস আমরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনার সুযোগ পাইনি। আমাদের সাথিগণ আমাদেরকে তাঁর থেকে হাদীস শোনাত। উষ্ট্রপালনের ব্যস্ততায় সর্বদা আমরা তাঁর কাছে থাকতে পারতামনা।[১৪৭]

আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন :

مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا.

আমরা যে সকল হাদীস বর্ণনা করি সব হাদীসই আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনিনি। বরং আমরা নবীজির কাছ থেকে শোনা হাদীস একে অপরকে বর্ণনা করতাম। আর আমরা একে অপরকে সন্দেহ করতাম না।[১৪৮]

আর তাঁদের কেউ যদি জানতেন যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি কথা অন্য কেউ জানেন, যা তিনি জানেন না, তবে তা জানার জন্য তিনি তাঁর দরবারে রওনা হতেন। এর জন্য প্রয়োজনে শত শত মাইল সফরও করতেন। যেমন জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি জানতে পারলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন উনাইস (রা.) নবীজি থেকে একটি হাদীস শুনেছেন, যা তিনি শোনেননি। তখন তিনি একটি উট ক্রয় করে হাদীসটি শোনার জন্য শামে রওনা হলেন। এক মাসের পথ সফর করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন :

حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكَ أَنَّكَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَمْ أَسْمَعْهُ) فَخَشِيْتُ أَنْ أَمُوْتَ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَهُ.

---

১৪৭. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৮৪৯৩।

১৪৮. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৬৪৫৮।

আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীস শুনেছেন, যা আমি শুনিনি। সেটি শোনার আগে হয়তো মারা যাব সেই আশঙ্কায় আপনার কাছে এসেছি।[১৪৯]

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর আমি এক আনসারি ব্যক্তিকে বললাম, নবীজির সাহাবিগণ অনেকেই বেঁচে আছেন। চলো আমরা তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে হাদীস জানতে থাকি। সে ব্যক্তি আমাকে বললেন, এত এত সাহাবি বর্তমান থাকতে কে তোমার কাছে শিখতে আসবে? এ কথায় আমি তাকে পরিত্যাগ করে একা একা সাহাবিদের কাছে গিয়ে হাদীস শেখা শুরু করলাম। যখনই কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারতাম যে, তিনি একটি হাদীস জানেন আমি তার বাড়িতে উপস্থিত হতাম। তিনি যদি বিশ্রামে থাকতেন আমি চাদরকে বালিশ বানিয়ে তার দরজায় শুয়ে থাকতাম। বাতাসে আমার শরীর ধূলিময় হয়ে যেত। তিনি বের হয়ে আমাকে দেখে বলতেন, হে আল্লাহর রাসূলের চাচতো ভাই, এ কী অবস্থা! আপনি খবর পাঠাতেন, আমিই আপনার কাছে গিয়ে হাজির হতাম। আমি বলতাম :

لَا، أَنَا أَحَقُّ أَنْ آتِيَكَ فَأَسْأَلُهُ عَنِ الْحَدِيْثِ فَعَاشَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ حَتّٰى رَآنِيْ وَقَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ حَوْلِيْ يَسْأَلُوْنَنِيْ فَقَالَ: كَانَ هٰذَا الْفَتٰى أَعْقَلَ مِنِّيْ.

তা হবে কেন? আসার প্রয়োজনটা তো আমারই ছিল। তারপর তাকে হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম।

অবশেষে ওই আনসারি লোকটি যখন দেখল, লোকজন আমার চারপাশে একত্র হয়ে জিজ্ঞাসা করছে, সে বলল, এই যুবকটি আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ছিল।[১৫০]

এমনকি সরাসরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনা হাদীস আলোচনা করার জন্যও তাঁরা দূর-দূরান্ত সফর করতেন। একটি

---

১৪৯. বুখারি, আল আদাবুল মুফরাদ, হাদীস : ৯৭০; সহীহ বুখারি ১/২৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৮৭১৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৬০৪২; ইবন হাজার, ফাতহুল বারি, ১/১৭৪।
১৫০. সুনান দারিমি, হাদীস : ৫৯০; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩৬৩।

হাদীস হয়তো নবীজি দুজন সাহাবির উপস্থিতিতে বলেছেন। তাঁদের একজন নবীজির ইন্তিকালের পর দূর দেশে কোথাও চলে গেছেন। তখন এই হাদীসটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার জন্যও বহু পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা পরস্পরে মিলিত হতেন।

মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ (রা.) তখন মিসরের আমীর। উকবাহ ইবন আমির (রা.) তাঁর সাথে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন। এতে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অভ্যর্থনা জানান। তখন উকবাহ (রা.) বলেন :

إِنِّيْ لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلٰكِنْ جِئْتُكَ بِحَاجَةٍ (وَلٰكِنْ حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتَ مَعِيْ يَوْمَئِذٍ) أَتَذْكُرُ يَوْمَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَلِمَ مِنْ أَخِيْهِ سَيِّئَةً فَسَتَرَهَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: لِهٰذَا جِئْتُ.

আমি নিছক আপনার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসিনি। বরং একটি বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি। একটি হাদীস আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি। সেদিন আপনিও আমার সাথে উপস্থিত ছিলেন। আপনার কি মনে পড়ে, সেদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অন্য ভাইয়ের কোনো ত্রুটি অবগত হলো, অতঃপর তা গোপন রাখল, কিয়ামতের দিন আল্লাহও তার ত্রুটি গোপন রাখবেন। মাসলামা (রা.) বলেন, হ্যাঁ, আমার স্মরণ আছে। উকবাহ (রা.) বলেন, আমি শুধু এজন্যই এসেছি।[১৫১]

আব্দুল্লাহ ইবন বুরাইদাহ বলেন, নবীজির একজন সাহাবি দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে মিসরে ফাযালাহ ইবন উবাইদ (রা.)-এর নিকট এসে বলেন :

أَمَا إِنِّيْ لَمْ آتِكَ زَائِرًا وَلٰكِنْ سَمِعْتُ أَنَا وَأَنْتَ حَدِيْثًا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَوْتُ أَنْ يَكُوْنَ عِنْدَكَ مِنْهُ عِلْمٌ.

---

১৫১. তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, ১৭/৩৪৯, হাদীস : ৯৬২ ও ১৯/৪৩৯, হাদীস : ১০৬৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৬৯৬০।

আপনার সাথে শুধু সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমি আসিনি। একটি হাদীস আমি ও আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছিলাম। সেটি হয়তো আপনার স্মরণে আছে? তখন ফাযালাহ (রা.) তাঁকে হাদীসটি বর্ণনা করেন।[১৫২]

অন্য বর্ণনায় আতা' ইবন আবী রাবাহ (রাহ.) বলেন, আবু আইউব (রা.) উকবাহ ইবন আমির (রা.)-এর উদ্দেশে মিসরে রওয়ানা হন তাঁর কাছে একটি হাদীস সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য, যে হাদীসটি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন এমন ব্যক্তি তখন শুধু তাঁরা দুজনই জীবিত ছিলেন। মিসরে পৌঁছে তিনি প্রথমত সেখানকার আমীর মাসলামা ইবন মুখাল্লাদ আনসারির বাসায় ওঠেন। তারপর তিনি তাঁর সাহায্য নিয়ে উকবাহ (রা.)-এর নিকট পৌঁছেন। উকবাহ (রা.) খবর পেয়ে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে মুআনাকা করেন এবং জানতে চান, কী প্রয়োজনে এসেছেন? তখন আবু আইউব (রা.) বলেন :

حَدِيْثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَبْقَ أَحَدٌ سَمِعَهُ غَيْرِيْ وَغَيْرُكَ فِيْ سَتْرِ الْمُؤْمِنِ

মুমিনের দোষ গোপন রাখা সম্পর্কে একটি হাদীস শুনতে আমি এসেছি। যে হাদীসটি আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি। তাঁর কাছ থেকে সরাসরি হাদীসটি শুনেছে এমন ব্যক্তি আমি আর আপনি ছাড়া কেউ বেঁচে নেই।

তখন উকবাহ (রা.) তাঁকে হাদীসটি শোনান। আবু আইউব (রা.) বলেন, আপনি যথার্থ বলেছেন। তারপর তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে বাহনে আরোহণ করে মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান।[১৫৩]

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, সাহাবিগণ গভীর মনোযোগ সহকারে নবীর সকল কর্ম দেখতেন এবং প্রত্যেকটি কথা শুনতেন। তারপর তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিতেন। আর কেউ যদি কোনো কথা শোনার বা কোনো কর্ম দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতেন তবে

---

১৫২. সুনান দারিমি, হাদীস : ৫৯১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪১৬০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৩৯৬৯।

১৫৩. মুসনাদ হুমাইদি, হাদীস : ৩৮৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭৩৯১।

সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে যিনি জানেন তার কাছ থেকে জেনে নিতেন। কারণ নবীর প্রত্যেকটি কথা ও কর্ম প্রতিপালন করা প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক। এভাবে নবীর কোনো কথা বা কর্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের কাছে সীমাবদ্ধ না থেকে পুরো সমাজে ছড়িয়ে যেত।

আর সমগ্র সমাজের কর্ম ও আলোচনার বিষয়ই ছিল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এইসব নির্দেশনা। সুতরাং কোনো সমাজ থেকে কীভাবে এমন কোনো বিষয় হারিয়ে যেতে পারে যা তাদের কর্ম ও আলোচনার একমাত্র বিষয়, যা তাদের কর্ম ও আলোচনার মাধ্যমে সমাজে সর্বদা মূর্তিমান হয়ে উপস্থিত? এর সাথে অবশ্য সাহাবিদের বিস্ময়কর স্মরণশক্তির কথাও মনে রাখতে হবে। তাদের স্মরণশক্তির এই বিষয়টি এতটাই সর্বজনবিদিত যে, এখানে এ বিষয়ে দালীলিক আলোচনা বাহুল্যজ্ঞানে বর্জিত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর কেউ ইসলাম গ্রহণ করে যখন এই সমাজে প্রবেশ করবে তখন তার চোখের সামনে সে নবীর সকল সুন্নাহ মূর্তিমান দেখতে পাবে। সে যদি কারো কাছে কিছু নাও শোনে, শুধু সমাজের দিকে দৃষ্টি রাখে তবুও বুঝতে পারবে, কোন বিষয়ে নবীর সুন্নাহ বা নির্দেশনা কী? কোন কাজটি তিনি কীভাবে করতেন? তাবিয়ি প্রজন্ম এভাবেই সাহাবিদের কাছ থেকে ইসলামি জ্ঞানের বড় একটি অংশ শিক্ষা লাভ করেছেন। বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো কখনো তারা এটা প্রকাশও করেছেন। যেমন তাবিয়ি আতা' (রাহ.) বলেছেন :

أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ثَلَاثًا وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

আমি লোকদের—অর্থাৎ সাহাবিদেরকে—পেয়েছি, তাঁরা বিতরসহ তেইশ রাকআত পড়তেন।[১৫৪]

এ বর্ণনায় আমরা দেখছি, সাহাবিদেরকে যেভাবে কিয়ামু রমাযান করতে দেখেছেন সেটাকেই তিনি শরীআত হিসাবে গ্রহণ করছেন।

তাছাড়া নবীজির নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী প্রজন্মের কাছে মৌখিকভাবে নবীর হাদীস পৌঁছে দিতেও তাঁরা সচেষ্ট ছিলেন। যেমন সাহাবি ওয়াবিসাহ

১৫৪. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস : ৭৬৮৮। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহ.) বলেন, আসারটির সনদ সহীহ। দেখুন : তারাবীহ সালাতের রাকআত সংখ্যা, পৃ. ৭৫।

ইবন মা'বাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে সম্বোধন করে বলেন :

أُدْنُوْا نُبَلِّغْكُمْ كَمَا قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তোমরা কাছে এসো, তোমাদের কাছে পৌঁছে দিই, যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন।[১৫৫]

সুলাইম ইবন আমির (রাহ.) বলেন, আমরা সাহাবি আবু উমামা বাহিলি (রা.)-এর কাছে বসতাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক হাদীস বর্ণনা করতেন। তারপর যখন চুপ করতেন, বলতেন :

أَعَقَلْتُمْ؟ بَلِّغُوْا كَمَا بَلَّغْنَاكُمْ.

তোমরা কি বুঝতে পেরেছ? তোমরাও পৌঁছে দেবে, যেভাবে আমরা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিলাম।[১৫৬]

অন্য বর্ণনায় আছে তিনি তাদেরকে হাদীস শুনিয়ে বলতেন :

إِسْمَعُوْا وَاعْقِلُوْا وَبَلِّغُوْا عَنَّا مَا تَسْمَعُوْنَ.

তোমরা শোনো এবং বুঝে নাও। আর যা শুনলে আমাদের পক্ষ থেকে তা পৌঁছেদাও।[১৫৭]

এভাবে তাঁরা পরবর্তীদের কাছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস পৌঁছে দিতে সর্বপ্রযত্নে সচেষ্ট ছিলেন। তারপরও কোনো হাদীস যদি অবর্ণিত থেকে যেত তাঁরা মৃত্যুশয্যায় হলেও তা বর্ণনা করে যেতেন। হাসান বসরি (রাহ.) বলেন, মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে আমি মা'কিল ইবন ইয়াসার (রা.)-কে দেখতে যাই। তখন সেখানে উবাইদুল্লাহ প্রবেশ করলে মা'কিল (রা.) তাকে বলেন :

---

১৫৫. কাশফুল আসতার, হাদীস : ১৪৫; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১/১৩৯। হাইসামি বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

১৫৬. ইবন আবী আসিম, আল আহাদ ওয়াল মাসানি, হাদীস : ১২৩৮; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস : ৭৬৭৩; মুসনাদুশ শামিয়্যীন, হাদীস : ৯৫৩; খতীব বাগদাদি, শারফু আসহাবিল হাদীস, পৃ. ৯৬। হাইসামি বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান।

১৫৭. সুনান দারিমি, হাদীস : ৫৬১। হুসাইন দারানি বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।

أُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'আমি তোমাকে একটি হাদীস শোনাব, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।' এরপর তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন।[১৫৮]

আবু আইউব আনসারি (রা.)-এর মৃত্যুর সময় সেনাবাহিনীর আমীর ইয়াযীদ ইবন মুআবিয়াহ তাঁর কাছে গেলে তিনি তাকে বলেন :

إِذَا مِتُّ فَاقْرَءُوْا عَلَى النَّاسِ مِنِّيْ السَّلَامَ فَأَخْبِرُوْهُمْ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا جَعَلَهُ اللهُ فِي الْجَنَّةِ.

আমি যখন মারা যাব লোকদেরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দেবে। অতঃপর তাদেরকে জানাবে যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো শিরক না করে মৃত্যুবরণ করল, আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করবেন।[১৫৯]

এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা ও তথ্য-উপাত্ত হাদীস ও ইতিহাসের কিতাবাদিতে সংরক্ষিত আছে।

প্রবীণ সাহাবিদের হাদীস অনুসরণ

প্রবীণ সাহাবিদের কর্ম ও বক্তব্যকে প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করে সংশয় তৈরি করা হয় যে, তাঁরা হাদীসকে শরীআতের দলীল হিসাবে মানতেন না; কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

প্রথমত বলা হয়, তাঁরা নিজেদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য কুরআন ছাড়া আর কোনো কিছু প্রয়োজনীয় মনে করেননি। এ কারণেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাদীস তাঁরা বর্ণনা করেননি এবং লিখিত আকারে হাদীস সংকলনের উদ্যোগও নেননি।

তাঁদের নামে হাদীসের কিতাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাদীস সংকলিত হয়নি এবং তাঁরা হাদীস সংকলনে পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেননি সত্য।

১৫৮. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৭১৫১।

১৫৯. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৩৫২৩।

তবে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যে, তাঁরা হাদীসকে প্রয়োজনীয় মনে করতেন না—এ কথা সর্বৈব ভুল ও অবাস্তব। কেন তাঁরা হাদীস লিখিত আকারে সংকলনের চূড়ান্ত উদ্যোগ নেননি, কেন তাঁদের নামে সংকলিত হাদীসের সংখ্যা কম, তাঁদের নামে বর্ণিত না হলেও যে তাঁদের জানা হাদীস পরবর্তী উম্মাতের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে, কীভাবে তা হয়েছে—এসব বিষয় আমরা এ বইয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি। বইটি পুরো পড়া হলে এ সংক্রান্ত সংশয় আর থাকবে না, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, এছাড়া প্রধান সাহাবিদের কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করেও দাবি করা হয় যে, তাঁরা হাদীসকে শরীআতের দলীল হিসাবে মানতেন না; কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করতেন।

(ক) ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেলে তিনি বলেন, 'তোমরা আমার কাছে লেখার কিছু নিয়ে এসো। তোমাদের জন্য এমন কিছু লিখে দেব যাতে পরবর্তীকালে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না।' তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন :

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا.

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবল রোগযন্ত্রণার মধ্যে আছেন। আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব আছে, তা আমাদের জন্য যথেষ্ট।[১৬০]

(খ) আবু জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিখিত আছে? তিনি বললেন :

لَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ أَوْ فَهْمٌ أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ مَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ.

'না, শুধু আল্লাহর কিতাব এবং মুসলিমকে দান করা হয়েছে এমন কিছু উপলব্ধি আর যা আছে এই সহীফাতে।' আবু জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি বললাম, এই সহীফাতে কী আছে? তিনি বললেন, 'ক্ষতিপূরণ ও বন্দিমুক্তির বিধান এবং এ বিধানটিও রয়েছে যে, কাফিরের বিনিময়ে মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।'[১৬১]

---

১৬০. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১১৪।

১৬১. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১১১; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ১৪১২।

(গ) ইবন আব্বাস (রা.) বলেন, উমার (রা.) ছুরিকাঘাতে আহত হলে সুহাইব (রা.) 'হে ভাই, হে বন্ধু' বলে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করে। তখন উমার (রা.) বলেন, হে সুহাইব, তুমি আমার জন্য কাঁদছ? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

মৃত ব্যক্তিকে তার জন্য তার পরিজনদের কোনো কোনো কান্নার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়।

উমার (রা.)-এর ইন্তিকালের পর ইবন আব্বাস (রা.) এ কথা আয়িশা (রা.)-কে বললে তিনি বলেন, আল্লাহ উমারকে রহম করুন। আল্লাহর কসম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি যে :

إِنَّ اللهَ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

'আল্লাহ মুমিন ব্যক্তিকে তার পরিজনদের কান্নার কারণে শাস্তি দেন।' বরং তিনি বলেছেন :

إِنَّ اللهَ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ.

'নিশ্চয় আল্লাহ কাফিরের শাস্তি বৃদ্ধি করেন তার পরিজনদের কান্নার কারণে।' তোমাদের জন্য কুরআনের এই আয়াতই যথেষ্ট :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى.

"কোনো বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।"[১৬২]

এ ধরনের আরো কিছু বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলা হয় যে, প্রধান ও প্রবীণ সাহাবিগণ (রা.) কুরআনকেই যথেষ্ট মনে করতেন, শরয়ি বিধানের উৎস হিসাবে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না। এ পুস্তকের ক্ষুদ্র পরিসরে তাদের সকল বক্তব্য উদ্ধৃত করে খণ্ডন ও পর্যালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে শুধু দেখার চেষ্টা করব যে, ঘটনার অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে

---

১৬২. সূরা [৬] আনআম, আয়াত : ১৬৪; সহীহ বুখারি, হাদীস : ১২৮৭, ১২৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৯২৭, ৯২৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস : ১৮৫৮।

তারা যে সিদ্ধান্তে এসেছে তা যথার্থ নয়। এমনকি তাদের চিন্তন দক্ষতা এ কাজের যোগ্য ও উপযুক্তও নয়।

কোনো বিশেষ প্রেক্ষাপটে প্রদত্ত কোনো বক্তব্যকে সব সময় সাধারণ ও সর্বজনীনভাবে ব্যবহার করা যায় না। বরং বক্তার কর্ম ও অন্যান্য বক্তব্যকে সামনে রেখে বিবেচনা করতে হয়। নইলে মারাত্মক অর্থ বিভ্রাট ঘটতে পারে। সূরা তাওবাহর ৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ.

"অতঃপর সম্মানিত মাসসমূহ অতিবাহিত হয়ে গেলে মুশরিকদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে পাকড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওত পেতে বসে থাকবে। তবে তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু।"

মহান আল্লাহর বিধান এ নয় যে, সম্মানিত মাস ছাড়া অন্যান্য মাসে যেকোনো ধরনের মুশরিককে ধরার জন্য ওত পেতে থাকতে হবে এবং যেখানেই তাদের কাউকে পাওয়া যাবে হত্যা করতে হবে। কিন্তু প্রসঙ্গ ছাড়া আয়াতটি উল্লেখ করলে এমনটিই বোঝা যায়।

উল্লিখিত বর্ণনাগুলোতে বিশেষ প্রেক্ষাপটে সাহাবির বক্তব্য প্রদত্ত হয়েছে। যা সাধারণ ও সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য নয়। আমরা তাঁদের সারা জীবনের কর্মপদ্ধতি ও অন্যান্য বক্তব্য সামনে রেখে বিবেচনা করলেই বুঝতে পারব।

উমার (রা.) কেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম উপদেশ লিখতে বাধা দিয়েছেন, তা ওই বর্ণনার মাঝেই উল্লেখ আছে। একে তো নবীজি রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট। উমার (রা.) চাননি, এই মুহূর্তে নবীজিকে কষ্ট দেওয়া হোক। তাছাড়া নবীজি তখন শরীআত সম্পর্কে নতুন কোনো বিধান বর্ণনা করতে চাননি। বরং কিছু হিতোপদেশ দিতে চেয়েছেন, যা তাঁর উম্মাতকে সঠিক পথে রাখতে সাহায্য করবে। উমার (রা.) বুঝেছেন,

আমাদেরকে ভ্রান্তি থেকে বাঁচিয়ে সঠিক পথের দিশা দেওয়ার জন্য কুরআন তো রয়েছেই। সুতরাং এই ক্লিষ্ট মুহূর্তে নবীজিকে কষ্ট দেওয়ার কী দরকার!

তিনি যে বলেছেন, দিশা দেওয়ার জন্য, ভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য কুরআনই যথেষ্ট, সেই কুরআনই তো আমাদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছে, কুরআনকে নবীজির হাদীসের আলোকে বুঝে মান্য করতে হবে। কুরআনের এই নির্দেশনা অমান্য করে কুরআন বুঝতে গেলে আমরা বিভ্রান্ত হব। সুতরাং উমার (রা.)-এর এ কথার উদ্দেশ্য কিছুতেই এ নয় যে, হাদীস মানতে হবে না। বরং তাঁর সারা জীবনের কর্মপন্থা প্রমাণ করে, তিনি কুরআন বুঝতেন হাদীসের আলোকে আর হাদীসকে মানতেন শরয়ি বিধানের অন্যতম উৎস হিসাবে। প্রমাণ হিসাবে আমরা দুটি বর্ণনা উল্লেখ করছি।

উমার (রা.) তাঁর নিযুক্ত কুফার বিচারক কাযি শুরাইহকে নির্দেশ দিয়ে লেখেন :

اِقْضِ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

তুমি আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফায়সালা করবে। যদি আল্লাহর কিতাবে না থাকে তবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসারে ফায়সালা করবে।[১৮৩]

তাবিয়ি উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাহ.) বলেন :

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي السَّقْطِ؟ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيْهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هٰذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هٰذَا.

উমার (রা.) মানুষদের কাছে জানতে চান, আঘাতের ফলে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হলে তার বিচারে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে রায়

১৮৩. সুনান নাসায়ি, হাদীস : ৫৩৯৯; সুনান দারিমি, হাদীস : ১৬৯। শায়খ আলবানি বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।

দিয়েছেন তা কেউ শুনেছেন কি না। তখন মুগীরাহ বলেন, আমি তাঁকে এ বিষয়ে একজন দাস বা দাসী প্রদানের বিধান দিতে শুনেছি। উমার (রা.) বলেন, আপনার সাথে এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কাউকে আনয়ন করুন। তখন মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ বিধান দিয়েছেন।[১৬৪]

অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলেন :

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَشَدَ النَّاسَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِيْنِ فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ: كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَضَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَنِيْنِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا.

গর্ভস্থ সন্তানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফায়সালা জানতে চান উমার (রা.) লোকদের কাছে। তখন হামাল ইবন মালিক ইবন নাবিগাহ দাঁড়িয়ে বলেন, আমি দুজন নারীর মাঝে ছিলাম। তাদের একজন অপরজনকে দণ্ড দ্বারা আঘাত করে। এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানের বিষয়ে ক্রীতদাস প্রদানের এবং ওই নারীর বদলে তাকে হত্যার ফায়সালা প্রদান করেন।[১৬৫]

এ বর্ণনা থেকে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। ১. উমার (রা.) হাদীসকে শরয়ি বিধানের দলীল হিসাবে মানতেন। এজন্য ফায়সালা দেবার ক্ষেত্রে যে বিষয়ে তিনি নবীজির হাদীস জানেন না অন্যদের কাছে শুনে জেনে নিচ্ছেন। ২. তাঁর কাছে হাদীস এত গুরুত্বপূর্ণ যে, অন্যের কাছে শুনে গ্রহণ করার আগে সাক্ষ্যের মাধ্যমে যাচাই করে নিচ্ছেন। গুরুত্বহীন জিনিস কেউ গ্রহণ করার জন্য যাচাই-বাছাই করে না। এবং ৩. সাহাবিগণ পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে একে অপরের কাছ থেকে হাদীস শিখতেন।

আলী (রা.)-এর বক্তব্য এক বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রদত্ত হয়েছিল। যে কারণে এ কথাটি তাঁকে বারবার বলতে হয়েছে। হাদীস অস্বীকারের জন্য তিনি এ কথা বলেননি। শীআ সম্প্রদায় তাদের মতলব হাসিলের

১৬৪. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৬৯০৭।
১৬৫. সুনান দারিমি, হাদীস : ২৪২৬।

মানসে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে, আহলে বাইত, বিশেষ করে আলী (রা.)-এর কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন কিছু ইলম রেখে গেছেন, যা অন্যদের জানা নেই। আলী (রা.) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হচ্ছিলেন। কখনো তিনি জিজ্ঞাসাকারীকে, আবার কখনো পুরো জাতিকে জানানোর জন্য মিম্বারে এ বিষয়ক বক্তব্য প্রদান করেছেন।

তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হচ্ছে : আমার কাছে লিখিত বস্তু, যা পাঠ করা যায়, এমন বিষয় শুধু আল্লাহর কিতাব এবং এই পুস্তিকায় সংকলিত বিধিবিধান বিষয়ক কিছু বাণী আর আল্লাহপ্রদত্ত বিশেষ উপলব্ধিই রয়েছে। এছাড়া অন্য সাহাবিদের থেকে অতিরিক্ত আমার কিছুই জানা নেই।

এখন বলুন, এর সাথে হাদীস অস্বীকারের কী সম্পর্ক? তিনি তো শীআদের এই দাবি খণ্ডন করছেন যে, তাঁর কাছে নবীজি ওহির কিছু বিশেষ জ্ঞান অতিরিক্ত রেখে গেছেন। তিনি যে বলছেন, আমার কাছে আল্লাহর কিতাব এবং এই সহীফায় লিখিত কিছু বাণী ছাড়া কিছুই নেই, এর অর্থ কি এই যে, তাঁর কাছে হাদীস অপরিহার্য বিষয় ছিল না, তাই তিনি হাদীস সংরক্ষণ করেননি? না, বরং তিনি বলছেন, শীআদের দাবি মতো তাঁর কাছে কিছু নেই বা কুরআন ও এই বাণীগুলো ছাড়া তার কাছে লিখিত, যা পাঠ করা যায় (مِنْ كِتَابٍ يُقْرَأُ وَفِيْ رِوَايَةٍ كِتَابٌ نَقْرَأُهُ), এমন কিছু নেই। এ বিষয়ক সকল বর্ণনা সামনে রাখলে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।[১৬৬]

মনে রাখতে হবে, লিখে রাখা সাহাবিদের কাছে হাদীস সংরক্ষণের মূল মাধ্যম ছিল না। বরং মূল মাধ্যম ছিল ব্যক্তি ও সমাজের আমল, স্মৃতিতে সংরক্ষণ এবং আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে নিত্যনৈমিত্তিক চর্চা। সুতরাং এ কথা মনে করা যে, যেহেতু অনেক কিছু লিখিত ছিল না সেহেতু সংরক্ষিত ছিল না এবং তিনি এর গুরুত্বও দিতেন না—এ কথা হাদীস সংরক্ষণ বিষয়ে সাহাবিদের কর্মপন্থা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আলী (রা.) উমার (রা.)-এর মতোই হাদীসকে শরীআতের উৎস মনে করতেন এবং বড় সতর্কতার সাথে বর্ণনা ও গ্রহণ করতেন।

আসমা ইবন হাকাম ফাযারি (রাহ.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বলতে শুনেছি :

---

১৬৬. কাসতাল্লানি, ইরশাদুস সারি, ১০/৩১৪; আসকালানি, ফাতহুল বারি, ১/২০৪।

إِنِّيْ كُنْتُ رَجُلًا إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثًا نَفَعَنِيْ اللهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِيْ وَإِذَا حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ (أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهُ) فَإِذَا حَلَفَ لِيْ صَدَّقْتُهُ.

আমি এমন প্রকৃতির লোক ছিলাম যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি কোনো হাদীস শুনলে আল্লাহর ইচ্ছায় তা দ্বারা প্রভূত উপকৃত হতাম। আর তাঁর অন্য কোনো সাহাবি আমাকে হাদীস বললে তাঁকে এই মর্মে শপথ করতে বলতাম যে, সত্যই তিনি তাঁর থেকে শুনেছেন। শপথ করলে তাঁর বর্ণনা সত্য বলে গ্রহণ করে নিতাম।... এরপর তিনি আবু বাকর (রা.)-এর সূত্রে ইস্তিগফার বিষয়ক একটি হাদীস বর্ণনা করেন।[১৬৭]

সুওয়াইদ ইবন গাফালাহ (রাহ.) বলেন, আলী (রা.) বলেছেন :

إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فِيْمَا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ.

আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করি তখন তাঁর নামে মিথ্যা বলার চেয়ে আকাশ থেকে ভূপাতিত হওয়া আমার কাছে প্রিয়। আর আমাদের পারস্পরিক আলোচনার বিষয় তো এই যে, যুদ্ধমাত্রই কৌশল।[১৬৮]

হাদীস সংরক্ষণের জন্যও তিনি বিশেষ তাকিদ দিতেন। নিয়মিত হাদীস চর্চার নির্দেশ দিয়ে ছাত্রদের বলতেন :

تَزَاوَرُوْا وَتَذَاكَرُوا الْحَدِيْثَ فَإِنَّكُمْ إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا يَدْرُسْ.

তোমরা পরস্পর সাক্ষাৎ করে হাদীসের চর্চা ও আলোচনা করতে থাকো। তোমরা এটা না করলে হাদীস বিলীন হয়ে যাবে।[১৬৯]

---

১৬৭. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩০০৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ১৫২১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ১৩৯৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২; মুসনাদ তায়ালিসি, হাদীস : ১ ও ২।

১৬৮. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৩৬১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১০৬৬।

১৬৯. মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস : ২৬১৩৪; সুনান দারিমি, হাদীস : ৬৫০; মুস্তাদরাক হাকিম : ৩২৪। এই বর্ণনাটিকে হুসাইন দারানি সহীহ বলেছেন।

'জীবিতদের কান্নার কারণে মৃত ব্যক্তির শাস্তি হয়' উমার (রা.)-এর এ বিষয়ক বর্ণনার বিপরীতে আয়িশা (রা.) যে বলেছেন, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট' এ কথা কি তিনি হাদীসের বিরুদ্ধে বলেছেন? কখনোই নয়। তিনি বরং হাদীসের পাঠ বিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন। উপরোক্ত বর্ণনাতেই এ কথা সুস্পষ্ট রয়েছে। তিনি বলতে চেয়েছেন, উমার (রা.)-এর বর্ণনার বিপরীতে তাঁর বর্ণনাই সঠিক। এ কথা বুঝতে তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট। এ বিষয়ক ইবন উমার (রা.)-এর বর্ণনার বিপরীতে তিনি বলেন :

وَهِلَ تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرٍ
فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَ هٰذَا لَيُعَذَّبُ وَأَهْلُهُ يَبْكُوْنَ عَلَيْهِ.

ইবন উমার ভুল করেছেন। বাস্তবতা এই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন বলেন, এই কবরের বাসিন্দাকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, অথচ তার পরিজনরা তার জন্য কাঁদছে।... এ বলে তিনি সূরা আনআমের ১৬৪ নং আয়াতটি পাঠ করেন।[১৭০]

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকারের জন্য তিনি এ কথা বলেননি। বরং হাদীসের বিশুদ্ধ পাঠ নিরূপণের জন্য বলেছেন। এবং নিজের বর্ণনার সমর্থক হিসাবে আয়াত উল্লেখ করেছেন। তিনি যদি হাদীসের প্রয়োজনীয়তাই অস্বীকার করবেন, তবে তার পাঠ বিশুদ্ধতার জন্য চেষ্টা কেন করবেন? এ কথাই তো বলে দেবেন যে, তোমরা নবীজি কী বলেছেন তা বাদ দাও, কুরআনের এই আয়াতের দিকে তাকাও। কিন্তু তা তিনি বলেননি।

তাঁর ব্যাপারে এ কথা কীভাবে বলা যায় যে, তিনি হাদীসের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতেন না! অথচ তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবিদের অন্যতম। হাদীস সংরক্ষণ, হাদীসের পাঠ ও মর্ম বিশুদ্ধকরণ, পরবর্তীদেরকে হাদীস শিক্ষাদান ও হাদীস প্রতিপালনে জীবন উৎসর্গকারী! তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকে শরয়ি বিধানের দলীল হিসাবে পেশ করতেন, অন্যদেরকে হাদীস শিখতে উৎসাহিত করতেন।

---

১৭০. সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩১২৯; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস : ৫৬৮১।

সাহাবিদের মধ্যে গোসল ফরয হওয়ার কারণ বিষয়ে মতভেদ হয়। তখন আয়িশা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি নবীজির কর্মকে দলীল হিসাবে উল্লেখ করে বলেন :

إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاغْتَسَلْنَا.

পুরুষের যৌনাঙ্গের খতনার স্থান নারীর খতনার স্থান অতিক্রম করলে গোসল আবশ্যক হয়ে যাবে। আমি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ করেছি। এরপর আমরা গোসল করেছি।[১৭১]

উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রাহ.) বলেন, আমার খালা আয়িশা (রা.) আমাকে বলেন :

يَا ابْنَ أُخْتِيْ بَلَغَنِيْ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو مَارٌّ بِنَا إِلَى الْحَجِّ فَالْقَهُ فَسَائِلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْمًا كَثِيْرًا.

'হে ভাগিনা, শুনলাম আব্দুল্লাহ ইবন আমর আমাদের এলাকা দিয়ে হজ্জে যাচ্ছেন। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে ইলম শিখে নাও। কেননা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রচুর ইলম অর্জন করেছেন।'

তখন আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করি। তিনি সেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করেন। আমি সেসব হাদীস আমার খালা আয়িশা (রা.)-এর কাছে বর্ণনা করি। তার মধ্যে একটা হাদীসে তাঁর খটকা লাগে। তিনি তাতে আপত্তি করেন। এবং নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কি তোমাকে বলেছেন যে, এটি তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনেছেন?

পরের বছর খালা আমাকে বলেন, ইবন আমর এসেছেন। তুমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে ওই হাদীসটি সম্পর্কে আবার জিজ্ঞাসা করবে। উরওয়া বলেন, আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ওই

---

১৭১. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ১০৮; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ৭/২৬৮।

হাদীসটি প্রথমবার আমাকে যেভাবে বলেছিলেন সেভাবেই বর্ণনা করেন। আমি যখন খালাকে বিষয়টি বলি, তিনি বলেন :

مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَدْ صَدَقَ أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيْهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ.

আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি ঠিকই বলেছেন। দেখছি তো, তিনি একটু বাড়িয়েও বলেননি, কমিয়েও বলেননি।[১৭২]

এই বর্ণনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি, আয়িশা (রা.)-এর খটকা লাগলে নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছেন, সত্যই এটা নবীর হাদীস কি না এবং নিশ্চিত হওয়ার পর নির্দ্বিধায় মেনে নিচ্ছেন, কোনো অজুহাতেই বাতিল করার চেষ্টা করছেন না। সকল সাহাবির এটাই ছিল রীতি। এমনকি তাঁরা কোনো বর্ণনাকে নবীর হাদীস বলে নিশ্চিত হওয়ার পর তাতে কুরআনের সাথে কাল্পনিক সংঘর্ষ আবিষ্কারেরও চেষ্টা করতেন না। পূর্বের বুঝের সাথে অমিল হলে হাদীস অনুযায়ী নিজের বুঝ মেরামত করে নিতেন।

ইসলামের প্রথম খলীফা প্রধানতম সাহাবি সিদ্দীকে আকবার আবু বাকর (রা.)-ও হাদীসকে শরীআতের অন্যতম উৎস হিসাবে মান্য করতেন। আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) ও ইবন আব্বাস (রা.) বলেন :

لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوْا فِيْ دَفْنِهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا نَسِيْتُهُ قَالَ: مَا قَبَضَ اللهُ نَبِيًّا إِلَّا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ يُحِبُّ أَنْ يُدْفَنَ فِيْهِ ادْفِنُوْهُ فِيْ مَوْضِعِ فِرَاشِهِ.

যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেন সাহাবিদের মধ্যে তাঁর দাফন সংক্রান্ত বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তখন আবু বাকর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শুনেছি, যা আজও ভুলিনি, তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ কোনো নবী (আ.)-এর জান সে স্থানেই কবয করেন যেখানে তাঁর দাফন হওয়া তিনি পছন্দ করেন।' সুতরাং তোমরা নবীজিকে তাঁর মৃত্যুর বিছানার স্থানেই দাফন করো।[১৭৩]

---

১৭২. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৬৭৩; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল ৮/৩৩।

১৭৩. মুআত্তা মালিক : ১/২৩১; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ১০১৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ১৬২৮; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস : ২২; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস : ৩৮৩২।

এ বর্ণনার আলোকে আমরা দেখছি, আবু বাকর সিদ্দীক (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর প্রথম সিদ্ধান্তই দিয়েছেন হাদীসের আলোকে। এভাবেই তিনি সারা জীবন সকল কাজে নবীজির সুন্নাহকে সামনে রেখেছেন। খিলাফাতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি একটি ভাষণ দেন। সে মূল্যবান ভাষণে মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনার পর তিনি বলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وَلِيْتُ أَمْرَكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ وَلٰكِنْ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَسَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السُّنَنَ فَعَلَّمَنَا فَعَلِمْنَا... أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِيْنُوْنِيْ وَإِنْ زُغْتُ فَقَوِّمُوْنِيْ.

হে লোকসকল, আমি তোমাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমি তোমাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই। তবে কুরআন নাযিল হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুন্নাহ প্রবর্তন করেছেন—তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আর আমরা শিখে নিয়েছি।... হে লোকসকল, আমি কেবল অনুসারী; উদ্ভাবক নই। সঠিক পথে থাকলে আমাকে সাহায্য করবে আর বিচ্যুত হলে সোজা করে দেবে।[১৭৪]

আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, ফাতিমা (রা.) এবং আব্বাস (রা.) আবু বাকর (রা.)-এর কাছে নবীজির মিরাস দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে আবু বাকর (রা.) বলেন :

وَإِنِّيْ وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيْهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ.

এক্ষেত্রে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা কিছু করতে দেখেছি তার কিছুই ছাড়ব না, সবকিছুই কার্যে পরিণত করব।[১৭৫]

কুরআনের সংক্ষিপ্ত বিধানের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১৭৪. আবু উবাইদ, আলখুতাবু ওয়াল মাওয়ায়িয, হাদীস : ১১৯; ইবন সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩/১৩৬। বর্ণনাটির সকল রাবি নির্ভরযোগ্য।

১৭৫. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৯ ও ৫৮; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৬৭২৫-৬৭২৬।

সাল্লাম যা কিছু বলেছেন আবু বাকর সিদ্দীক (রা.) তাকে মহান আল্লাহপ্রদত্ত আবশ্যক বিধান বলে গণ্য ও মান্য করতেন। আনাস (রা.)-কে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণকালে যাকাতের বিস্তারিত বিধান সংক্রান্ত যে লিখিত দস্তাবেজ তাঁর কাছে দিয়ে দেন তাঁর শুরুতে তিনি লেখেন :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ هٰذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِيْ فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَالَّتِيْ أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُوْلَهُ.

পরম দয়ালু চিরদয়াময় আল্লাহর নামে। এটা যাকাত নির্ধারণ বিষয়ক দস্তাবেজ—যা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিমদের উপর আবশ্যক করেছেন এবং আল্লাহ তাঁর রাসূলকে যার আদেশ করেছেন।[১৭৬]

সাহাবি কাবীসাহ ইবন যুআইব (রা.) বলেন, এক দাদি এসে আবু বাকর (রা.)-এর কাছে মৃত পৌত্রের সম্পত্তিতে তার উত্তরাধিকার দাবি করে। তখন তিনি বলেন :

مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِيْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَارْجِعِيْ حَتّٰى أَسْأَلَ النَّاسَ.

'আল্লাহ তাআলার কিতাবে আপনার জন্য (দাদির উত্তরাধিকার বিষয়ে) কোনো আলোচনা নেই। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতে এ বিষয়ে কোনো আলোচনা আছে কি না আমার জানা নেই। আপনি ফিরে যান। আমি মানুষদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।'

এরপর তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করেন। মুগীরাহ ইবন শু'বাহ (রা.) বলেন, আমার উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাদিকে এক-ষষ্ঠাংশ দান করেন। আবু বাকর (রা.) বলেন, আপনার সাথে কি অন্য কেউ আছেন? তখন অন্য সাহাবি মুহাম্মাদ ইবন মাসলামা (রা.) দাঁড়ান এবং মুগীরাহ (রা.)-এর অনুরূপ বলেন। তখন আবু বাকর (রা.) সে অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করেন।[১৭৭]

---

১৭৬. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১৪৫৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস : ২২৬১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ১৫৬৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ১৮০০।

১৭৭. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ৩০৩৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ২৮৯৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২১০১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ২৭২৪; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস : ৩১২৭২;

মাইমুন ইবন মিহরান (রা.) বলেন :

كَانَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَإِنْ وَجَدَ فِيْهِ مَا يَقْضِيْ بَيْنَهُمْ قَضٰى بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ وَعَلِمَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ ذٰلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً قَضٰى بِهِ فَإِنْ أَعْيَاهُ خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ: أَتَانِيْ كَذَا وَكَذَا فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى فِيْ ذٰلِكَ بِقَضَاءٍ؟ فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ قَضَاءً. فَيَقُوْلُ أَبُوْ بَكْرٍ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ فِيْنَا مَنْ يَحْفَظُ عَلٰى نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আবু বাকর (রা.)-এর কাছে কোনো বিচার এলে তিনি আল্লাহর কিতাব দেখতেন। সেখানে তাদের বিষয়ে কোনো ফায়সালা পেলে সে অনুযায়ী বিচার করে দিতেন। আর আল্লাহর কিতাবে না থাকলে, সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো সুন্নাহ তাঁর জানা থাকলে সে অনুযায়ী তিনি ফায়সালা করতেন। আর যদি সে বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো ফায়সালা তাঁর জানা না থাকত, তিনি বের হয়ে মুসলিমদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, আমার কাছে এ-জাতীয় বিচার এসেছে। তোমাদের কি এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ফায়সালা জানা আছে? প্রায়শ তাঁর পাশে কিছু লোক একত্র হয়ে যেত। তাঁরা সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো ফায়সালা শোনাতেন। তখন আবু বাকর (রা.) বলতেন, প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত। তিনি আমাদের মাঝে এমন লোক রেখেছেন যিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিষয় সংরক্ষণ করেছেন।[১৭৮]

মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৭৯৭৮। ইমাম তিরমিযি, হাকিম, যাহাবি, মুহাম্মাদ আওয়ামা, ইসলাম মানসুর প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

১৭৮. সুনান দারিমি, হাদীস : ১৬৩; বাইহাকি, আসসুনানুল কুবরা, হাদীস : ২০৩৪১। নাদরাতুন নাঈম, ২/৩৮। বর্ণনাটির সকল রাবি নির্ভরযোগ্য।

প্রধান সাহাবি সকলেরই আল কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ইলম ছিল। কিন্তু কুরআনের পর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে হাদীস শেখা সত্ত্বেও কোনো কোনো হাদীস অজানা থাকা সংগত কারণেই অসম্ভব নয়। তাই নবীজির ইন্তিকালের পরপর প্রথম দিকে কিছু ঘটনা এমন ঘটেছে যে, কোনো সাহাবি একটি হাদীস বলেছেন, কিন্তু কোনো প্রধান সাহাবি সে হাদীসটি জানেন না। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চেয়েছেন যে, এটি সত্যই নবীর হাদীস কি না। প্রথমত তিনি তাঁর জানা ইলম অনুযায়ী এর উপর সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন। কখনো হয়তো সন্দেহের কারণ হিসাবে কুরআনের কোনো আয়াত পেশ করেছেন এবং হাদীসের পক্ষে পর্যাপ্ত দলীল পেশ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি কুরআন দিয়ে হাদীস বাতিল করে দিচ্ছেন। বরং হাদীসটি তাঁর জানা ইলমের থেকে ভিন্ন হওয়ায় তিনি জানা ইলমের আলোকে এই অজানা ইলমের প্রতি প্রথমত সন্দেহ আরোপ করে এটি সত্যই নবী-বাণী কি না তা নিশ্চিত হতে চাচ্ছেন। এক্ষেত্রে সুন্নাহর বিপরীতে সুন্নাহ হলেও একই পন্থা তাঁরা অবলম্বন করতেন। যেমন মহিলা সাহাবি ফাতিমা বিনতু কায়স (রা.) যখন বলেন যে, তাঁর স্বামী তাঁকে তালাক দিলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বলেন, তিনি ইদ্দতকালীন আবাসন ও ভরণপোষণের খরচ পাবেন না। এ কথা শুনে উমার (রা.) বলেন :

إِنْ جِئْتِ بِشَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... لَا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِيْ لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ.

আপনি কি দুজন সাক্ষী আনতে পারবেন যারা সাক্ষ্য দেবে যে, তারা এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন?... এছাড়া তো আমরা একটি নারীর কথায় আল্লাহর কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না। আমরা জানি না, তিনি ঠিক ঠিক স্মরণ রাখতে পেরেছেন, নাকি ভুলে গেছেন।[১৭৯]

---

১৭৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৮০; সুনান নাসায়ি, হাদীস : ৩৫৪৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ২২৯১; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ১১৮০।

তিনটি বিষয় লক্ষণীয়, ১. উমার (রা.) তাঁর বক্তব্যের পেছনে সূরা তালাকের ১ নং আয়াতটি উল্লেখ করেছেন। ২. তিনি ফাতিমা বিনতু কায়স (রা.)-কে তাঁর হাদীসের পক্ষে দুজন সাক্ষী আনয়নের কথা বলেছেন। বোঝা যাচ্ছে, উমার (রা.) সরাসরি এ হাদীসকে বাতিল করে দিচ্ছেন না। সাক্ষী পেয়ে নবীজির হাদীস বলে নিশ্চিত হতে পারলে গ্রহণ করবেন এবং ৩. তিনি বলেছেন, '...আল্লাহর কিতাব ও আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত পরিত্যাগ করতে পারি না'। অর্থাৎ তিনি শুধু কুরআনের বিপরীতে হাদীসের ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন না। বরং তাঁর জানা হাদীসের বিপরীতে হাদীস হলেও একই কথা প্রযোজ্য।

অনুমতি প্রার্থনা বিষয়ক হাদীস, যা বাহ্যত কুরআনি বিধানকে আংশিক পরিবর্তন করে দেয়, আবু মূসা আশআরি (রা.) যখন হাদীসটি উমার (রা.)-কে বলেন, উমার (রা.) তাঁকে সাক্ষী আনতে বলেন। আবু সাঈদ খুদরি (রা.) সাক্ষ্য দিলে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন যে, এটা সত্যই নবী-বাণী। তখন তিনি হাদীসটি গ্রহণ করেন এবং স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেন :

خَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَانِيْ عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ... إِنِّيْ لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلٰكِنَّ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيْدٌ... وَلٰكِنْ خَشِيْتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম বিষয়ক এই নির্দেশনাটি আমার অজানা রয়ে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততা আমাকে অনবহিত রেখেছে। আমি আপনাকে সন্দেহ করিনি। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করা তো অনেক বড় ব্যাপার! আমার আশঙ্কা হয়, মানুষ তাঁর নামে বানিয়ে কথা বলে কি না![১৮০]

উমার (রা.) আবু মূসা আশআরি (রা.)-কে তাঁর বর্ণিত হাদীসের পক্ষে সাক্ষী আনতে বলেন। এ থেকে যদি আমরা বুঝে থাকি যে, কুরআনের

১৮০. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ২০৩০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১১০২৯, ১৯৬১১; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৭৩৫৩, ৬২৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৫৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৫১৮০-৫১৮৪; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল : ৬/৫৭৯।

বিপরীত হওয়ায় তিনি এ হাদীস মানছেন না তবে সেটা আমাদের বোঝার ভুল। তিনি পরে সুস্পষ্ট করেই বলেছেন, আবু মূসা আশআরি (রা.)-কে তিনি সন্দেহ করেননি। তবে তিনি চেয়েছেন, নবীজির নামে হাদীস বলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যেন যে কেউ যাচ্ছেতাই বলতে না পারে। তাই তিনি হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এ কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছেন। অন্যান্য সাহাবি থেকে বর্ণিত এ ধরনের অন্য ঘটনাগুলোও এর আলোকে ব্যাখ্যেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাদীসে নববি ইসলামি শরীআতের অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস হওয়ার কারণে সকল যুগেই হাদীসের নামে জালিয়াতি হয়েছে। আর সাহাবিদের মতো প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিসগণও হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে এ ধরনের কঠোর নিরীক্ষণের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। তাই হাদীস জাল করা কোনো যুগেই এমন ডালভাত ছিল না যে, যে কেউ যাচ্ছেতাই বলছে আর উম্মাত তা গ্রহণ করে নিচ্ছে। বরং কোনো জালিয়াতের কথায় সাধারণ মানুষ সাময়িকভাবে প্রতারিত হলেও মুহাদ্দিসদের নিরীক্ষায় তা ধরা পড়ে যেত। প্রত্যেক যুগের জাল বর্ণনা সমসাময়িক মুহাদ্দিসদের দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে গেছে। এমন নয় যে, দীর্ঘকাল ধরে ভুলশুদ্ধ একত্র হয়ে ধোঁয়াশা হয়ে গেছে আর পরবর্তীকালে প্রয়োজন অনুভূত হলে তা থেকে ধুলোর আস্তর সরিয়ে বিশুদ্ধ নবী-বাণী বের করে আনা দুরূহ হয়ে পড়েছে।

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা (রা.)

আবু হুরাইরা (রা.) সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবি। হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর নামে বর্ণিত হাদীস সর্বাধিক। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা পাঁচ হাজারের বেশি।[১৮১] অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন সপ্তম হিজরিতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য পেয়েছেন তিন বছরের কিছু বেশি কাল। এ বিষয়ে হাদীসশাস্ত্র না জানা সাধারণ মানুষের কৌতূহল এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের আপত্তি—তিনি এত হাদীস কোথায় পেলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সারা জীবনের সাহচর্যধন্য সাহাবিদের তুলনায় তাঁর হাদীস বেশি হলো কীভাবে?

---

১৮১. কোনো কোনো গবেষকের মতে আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মূলত ১২৩৬ টি। এই ১২৩৬ টি হাদীসই পাঁচ হাজারের অধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এই জন্যই বলা হয়, আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণিত হাদীস পাঁচ হাজারের বেশি। বিস্তারিত জানতে দেখুন :
الاتجاه العقلي وعلوم الحديث للدكتور خالد أبي الخيل، دفاع عن أبي هريرة للدكتور عبد المنعم صالح.

তাছাড়া আবু হুরাইরা (রা.) যেহেতু সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, তাঁকে বিতর্কিত করতে পারলেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাদীসের ব্যাপারে সংশয় তৈরি করা যাবে, তাই হাদীস অস্বীকারকারী ইসলামের শত্রুরা তাঁর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের জন্য বেশ কিছু অভিযোগ উত্থাপন করেছে। কিন্তু তাদের উত্থাপিত সে সকল অভিযোগ একেবারেই ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও অনৈতিহাসিক। সেসব প্রলাপের প্রত্যুত্তর করে আমরা এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না। কোনো সাধারণ মুসলিমও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্নেহধন্য এ মহান সাহাবি সম্পর্কে সেসব নোংরা কথা বিশ্বাস করবে না। তিনি কীভাবে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবির মর্যাদায় উত্তীর্ণ হলেন—আমরা কেবল সংক্ষেপে এ বিষয়ক ঐতিহাসিক পর্যালোচনার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই।

আবু হুরাইরা (রা.) ইসলাম গ্রহণ ও ইলম অর্জনের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, আবাসে-প্রবাসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য অবধারিত করে নিয়েছেন, নবীজির ইন্তিকালের পর যখনই তিনি জানতে পেরেছেন কোনো সাহাবির কাছে এমন হাদীস আছে যা তিনি জানেন না, তাঁর দরজায় ছুটে গেছেন, অর্জিত হাদীস সংরক্ষণ ও পরবর্তীদের নিকট পৌঁছে দেওয়াকে জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

তিনি যে হাদীসের প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন এ স্বীকৃতি নবীজি নিজেই দিয়েছেন। সাঈদ মাকবুরি বলেন, আবু হুরাইরা (রা.) একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামতের দিন আপনার সুপারিশ লাভের অধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে হবে? তখন নবীজি বলেন :

لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلُنِيْ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيْثِ.

হে আবু হুরাইরা, আমি জানতাম, তোমার আগে এ হাদীস সম্পর্কে আমাকে আর কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। কেননা আমি হাদীসের প্রতি তোমার বিশেষ আগ্রহ দেখতে পেয়েছি।[১৮২]

---

১৮২. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৮৮৫৮; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৯৯।

অন্য সাহাবিগণও ইলমের প্রতি সর্বাধিক আগ্রহী ছিলেন। তবে তাঁদের পারিবারিক ব্যস্ততাও ছিল। আর আবু হুরাইরা (রা.) শুধু ক্ষুধা নিবারণের উপর তুষ্ট থেকে হাদীস চর্চায় নিরত থেকেছেন। এজন্য তাঁর হাদীসের ভান্ডার ছিল সর্বাধিক সমৃদ্ধ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন তিনি পরবর্তীদেরকে হাদীস শিক্ষা দেওয়ার ব্রত গ্রহণ করলেন, দেখা গেল তাঁর হাদীসের ভান্ডার ব্যাপক সমৃদ্ধ এবং অনেক এমন হাদীসও তিনি বর্ণনা করছেন যা অন্য অনেক সাহাবি জানেন না। এ বিষয়টি সাহাবিদেরকেও বিস্মিত করেছিল। সমাজে বিষয়টি প্রকাশ্যে আলোচনাও হয়েছে। আবু হুরাইরা (রা.) নিজেও সে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন এবং বাস্তবতা খোলাসা করেছেন। সাহাবিগণও নিশ্চিত হয়েছেন এবং খোলামেলা সাক্ষ্য প্রদান করেছেন—তাঁর জন্য সর্বাধিক হাদীস জানা এবং অন্যদের না-জানা অনেক কিছু জানা একেবারেই স্বাভাবিক।

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব এবং আবু সালামা ইবন আব্দুর রহমান (রাহ.) বলেছেন, আবু হুরাইরা (রা.) বলেন :

إِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ لَا يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيْثِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَإِنَّ إِخْوَتِيْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْأَسْوَاقِ وَكُنْتُ أَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِيْ فَأَشْهَدُ إِذَا غَابُوْا وَأَحْفَظُ إِذَا نَسُوْا وَكَانَ يَشْغَلُ إِخْوَتِيْ مِنَ الْأَنْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ (عَمَلُ أَرَضِيهِمْ) وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا مِّنْ مَسَاكِيْنِ الصُّفَّةِ أَعِي حِيْنَ يَنْسَوْنَ.

তোমরা বলছ যে, আবু হুরাইরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করেন। তোমরা এটাও বলছ যে, মুহাজির-আনসাররা কেন আবু হুরাইরার মতো হাদীস বর্ণনা করেন না? শোনো, বাস্তবতা এই যে, আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ক্ষুধা নিবারণের উপর তুষ্ট থেকেই

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকট পড়ে থাকতাম। তাই তাঁরা যখন থাকতেন না আমি তখনও থাকতাম। তাঁরা যা ভুলে যেতেন আমি তা মুখস্থ করতাম। আর আমার আনসার ভাইয়েরা নিজেদের খেত-খামারের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। আর আমি ছিলাম সুফফার অধিবাসী সর্বত্যাগী এক মিসকীন। যা তারা ভুলে যেতেন, আমি তা স্মরণ রাখতাম।[১৮৩]

একজন আরব হিসাবে সে সময়ের আরব জাতির যে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল, আবু হুরাইরা (রা.) স্বভাবিকভাবেই সে প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। উপরন্তু হাদীস সংরক্ষণের অতিরিক্ত আগ্রহের কারণে তিনি নবীজির কাছে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য দুআ চেয়েছেন। নবীজিও তাঁর স্মৃতিশক্তির জন্য দুআ করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِيْ هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَّا وَعٰى مَا أَقُوْلُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ حَتّٰى إِذَا قَضٰى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا إِلٰى صَدْرِيْ فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ.

আমার এই কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে রাখবে, তারপর নিজের শরীরের সাথে জড়িয়ে নেবে, সে আমি যা বলছি স্মরণ রাখতে পারবে। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, তখন আমি আমার গায়ের কাপড়খানা তাঁর কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিছিয়ে রাখলাম। তারপর বুকের সাথে জড়িয়ে নিলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেইসব কথা আজও কিছুই ভুলিনি।[১৮৪]

সাঈদ মাকবুরি (রাহ.) থেকে বর্ণিত, আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি বললাম :

يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيْثًا كَثِيْرًا أَنْسَاهُ قَالَ: ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيْتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

১৮৩. সহীহ বুখারি, হাদীস : ২০৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৪৯৩।
১৮৪. সহীহ বুখারি, হাদীস : ২০৪৭।

হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছ থেকে শোনা অনেক হাদীস ভুলে যাই। তিনি বললেন, তোমার চাদর মেলে ধরো। আমি মেলে ধরলাম। তিনি দুই হাত অঞ্জলিবদ্ধ করে বললেন, এবার বুকের সাথে লাগাও। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি।[১৮৫]

সাঈদ ইবন আবী হিন্দের সূত্রে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত :

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ أَلَا تَسْأَلُنِيْ مِنْ هٰذِهِ الْغَنَائِمِ الَّتِيْ يَسْأَلُنِيْ أَصْحَابُكَ؟ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعَلِّمَنِيْ مِمَّا عَلَّمَكَ اللهُ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার সঙ্গী-সাথিদের মতো তুমি কি আমার কাছে এই গনীমতের অংশ চাইবে না? তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি চাই, আপনি আমাকে সেই ইলম শিক্ষা দেবেন যে ইলম আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।[১৮৬]

এক ব্যক্তি যাইদ ইবন সাবিত (রা.)-এর নিকট এসে তাঁকে একটি বিষয় জিজ্ঞাসা করল। যাইদ (রা.) তাকে বললেন, তুমি গিয়ে আবু হুরাইরা (রা.)-কে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করো। কারণ একদিনের ঘটনা এই যে, আমি, আবু হুরাইরা (রা.) এবং অন্য এক ব্যক্তি মসজিদে দুআ ও যিকির করছিলাম। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট এসে বসলে আমরা চুপ হয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যে দুআ করছিলে তা করতে থাকো'। যাইদ (রা.) বলেন, আবু হুরাইরা (রা.)-এর আগে আমরা দুজন দুআ করলাম। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দুআয় 'আমীন' বললেন। তারপর আবু হুরাইরা (রা.) দুআ করলেন। দুআয় তিনি বললেন :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِثْلَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَايَ هٰذَانِ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لَا يُنْسٰى.

---

১৮৫. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১১৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩৮৩৫।

১৮৬. ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১১৯; আবু নুআইম, হিলয়াতুল আউলিয়া : ১/৩৮১। হাদীসটির সকল রাবি নির্ভরযোগ্য। দেখুন : আল ইসাবাহ ফী তাময়ীযিস সাহাবাহ : ৭/৩৫৬।

হে আল্লাহ, আমার এই দুই সাথি তোমার কাছে যেমন প্রার্থনা করেছে আমিও তেমন প্রার্থনা করছি এবং আরো প্রার্থনা করছি এমন ইলম যা কখনো ভুলে যাব না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমীন'। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরাও এমন ইলম চাই যা ভুলে যাব না। তিনি বললেন, এক্ষেত্রে এই দাওসি গোলাম আবু হুরাইরা তোমাদের থেকে অগ্রগামী।[১৮৭]

আবু হুরাইরা (রা.)-এর স্মৃতিশক্তি ছিল প্রবাদতুল্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করার পর তিনি আর কিছুই বিস্মৃত হননি। সাঈদ মাকবুরি (রাহ.) বলেন, আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন :

يَقُوْلُ النَّاسُ: أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَلَقِيْتُ رَجُلًا فَقُلْتُ: بِمَا قَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَارِحَةَ فِي الْعَتَمَةِ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِيْ فَقُلْتُ: لَمْ تَشْهَدْهَا؟ قَالَ: بَلٰى قُلْتُ: لٰكِنْ أَنَا أَدْرِيْ قَرَأَ سُوْرَةَ كَذَا وَكَذَا.

লোকে বলাবলি করত, আবু হুরাইরা বেশি বেশি বর্ণনা করছে। সে সময় আমি এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, বলো তো গতরাতে ইশার সালাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সূরা পাঠ করেছেন? সে বলল, জানি না। আমি বললাম, ওই সালাতে কি তুমি উপস্থিত ছিলে না? সে বলল, হ্যাঁ, ছিলাম। আমি বললাম, কিন্তু আমি জানি। তিনি অমুক অমুক সূরা পাঠ করেছেন।[১৮৮]

মদীনার গভর্নর মারওয়ান একবার আবু হুরাইরা (রা.)-এর স্মরণশক্তি পরীক্ষা করেন। মারওয়ানের সচিব আবু যুআইযাআহ বলেন, মারওয়ান আবু হুরাইরা (রা.)-কে ডেকে পাঠান এবং তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে আবেদন করেন। আর আমাকে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখেন তাঁর বর্ণিত হাদীস লিখে রাখার জন্য। পরবর্তী বছর তিনি আবার তাঁকে ডেকে পাঠান

১৮৭. নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস : ৫৮৩৯; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস : ১২২৮; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৬১৫৮।

১৮৮. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১২২৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১০৭২২।

এবং পূর্বে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করতে আবেদন করেন। আর আমাকে নিরীক্ষণ করতে বলেন। আমি দেখলাম, তিনি গত বছরের হাদীস হুবহু বর্ণনা করলেন; একটি হরফও পরিবর্তন করলেন না।[১৮৯]

এভাবে যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস শেখার জন্য তাঁর সান্নিধ্যকে আবশ্যক করে নিয়েছিলেন তাঁর জন্য কি তিন বছরেরও অধিককালে পাঁচ হাজারের কিছু বেশি হাদীস অবগত হওয়া আশ্চর্যের কিছু? উপরন্তু যে সকল হাদীস তিনি সরাসরি নবীজির কাছ থেকে শোনার সুযোগ পাননি সে সকল হাদীসও যারা জানেন তাঁদের কাছ থেকে শিখে নেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

ওয়ালিদ ইবন রাবাহ বলেন, আমি শুনেছি, আবু হুরাইরা (রা.) মারওয়ানকে বলছেন :

نَعَمْ! قَدِمْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ زِدْتُ عَلَى الثَّلَاثِيْنَ سَنَةً سَنَوَاتٍ وَأَقَمْتُ مَعَهُ حَتَّى تُوُفِّيَ أَدُوْرُ مَعَهُ فِيْ بُيُوْتِ نِسَائِهِ وَأَخْدِمُهُ وَأَنَا وَاللهِ يَوْمَئِذٍ مُقِلٌ وَأُصَلِّيْ خَلْفَهُ وأَحُجُّ وَأَغْزُوْ مَعَهُ فَكُنْتُ وَاللهِ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيْثِهِ قَدْ وَاللهِ سَبَقَنِيْ قَوْمٌ بِصُحْبَتِهِ وَالْهِجْرَةِ إِلَيْهِ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ وَكَانُوْا يَعْرِفُوْنَ لُزُوْمِيْ لَهُ فَيَسْأَلُوْنِيْ عَنْ حَدِيْثِهِ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَلَا وَاللهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ كُلُّ حَدِيْثٍ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ وَكُلُّ مَنْ أَحَبَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَكُلُّ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم مَنْزِلَةٌ وَكُلُّ صَاحِبٍ لَهُ.

হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সপ্তম হিজরিতে খাইবারের যুদ্ধকালেই এসেছিলাম। তখন আমার বয়স ত্রিশের কিছু বেশি। আর সে সময় থেকে তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত সর্বদা আমি তাঁর সাথেই থেকেছি। তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রীদের বাসায় গেছি। তাঁর খেদমত করেছি। আল্লাহর কসম, তখন আমি ছিলাম সর্বহারা নিঃস্ব। তাঁর পেছনে

---

১৮৯. ইবন হাজার, আল ইসাবাহ, ৭/৩৫৩।

সালাত আদায় করতাম। তাঁর সাথে হজ্জে ও যুদ্ধে যেতাম। সুতরাং আল্লাহর কসম, আমি তাঁর হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি। আল্লাহর কসম, কুরাইশ ও আনসাদের অনেকেই তাঁর সান্নিধ্য ও তাঁর নিকট হিজরতে আমার অগ্রগামী। কিন্তু সর্বদা তাঁর নিকট আমার অবস্থানের বিষয়টি তাঁরা জানেন। তাই তাঁরা অনেকেই আমার কাছে তাঁর হাদীস জানতে চান। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, উমার, উসমান, আলী, তালহা, যুবাইর (রা.)। আল্লাহর কসম, মদীনার কোনো হাদীসই আমার অজ্ঞাত নয়। আমি জানি, কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। তাঁর কাছে কার বিশেষ মর্যাদা ছিল এবং কারা তাঁর সোহবতধন্য।[১৯০]

এভাবে আবু হুরাইরা (রা.) সর্বাধিক সংখ্যক হাদীস সংগ্রহ করেন। অতঃপর তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি সত্ত্বেও হাদীস যথাযথ স্মরণ রাখার জন্য নিয়মিত অনুশীলন করতেন। তিনি বলেছেন :

إِنِّيْ أُجَزِّئُ اللَّيْلَ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَجُزْءٌ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجُزْءٌ أَنَامُ فِيْهِ وَجُزْءٌ أَتَذَكَّرُ فِيْهِ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

আমি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করি। একভাগ কুরআন পাঠের জন্য, একভাগে ঘুম যাই, আর একভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস অনুশীলন করি।[১৯১]

তবে নবীজির যুগে তিনি লিখিত আকারে নয়, বরং স্মৃতিতেই হাদীস সংরক্ষণ করতেন। আর আমরা জেনে এসেছি যে, নবীজির দুআয় তিনি ছিলেন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। একবার হাদীস শুনলে আর ভুলতেন না। তিনি বলেছেন :

مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيْثًا عَنْهُ مِنِّيْ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ.

১৯০. ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১১৬; ইবন সা'দ, আত তাবাকাত ১/৩৫৯; ইবন আসাকির, তারীখু দিমাশক, ৬৭/৩৫৫।
১৯১. ইবন কাসীর, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৮/১১৮; সুনান দারিমি, হাদীস : ২৭২।

কোনো সাহাবি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস আমার থেকে বেশি জানতেন না। তবে আব্দুল্লাহ ইবন আমর লিখে রাখতেন আর আমি লিখতাম না।[১৯২]

তবে পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সংগৃহীত হাদীস লিখেও নিয়েছিলেন। তাঁর ছাত্র হাসান ইবন আমর (রাহ.) বলেন, একবার আবু হুরাইরা (রা.)-এর নিকট আমি একটি হাদীস বললাম। তিনি বললেন, তুমি যদি এই হাদীসটি আমার থেকে শুনে থাকো তবে তা আমার কাছে লিখিত আছে। তারপর তিনি হাত ধরে আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস লিখিত অনেক পাণ্ডুলিপি দেখালেন এবং বললেন :

قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنِّيْ إِنْ كُنْتُ قَدْ حَدَّثْتُكَ بِهِ فَهُوَ مَكْتُوْبٌ عِنْدِيْ.

আমি তো তোমাকে বলেছি, আমি যদি তোমাকে হাদীসটি শুনিয়ে থাকি তবে অবশ্যই আমার কাছে তা লিখিত থাকবে।[১৯৩]

হাদীস শিক্ষাগ্রহণের মতো হাদীস শিক্ষাদানটাও সাহাবিদের কারো ছিল প্রধানতম কাজ, কারো ছিল অন্যতম কাজ। আর আবু হুরাইরা (রা.)-এর ছিল একমাত্র কাজ। তিনি হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে যেমন সর্বোচ্চ সচেষ্ট ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি পরবর্তীদের নিকট হাদীস পৌঁছে দেওয়াকেও অর্পিত দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ছাত্র আ'রাজ (রাহ.) বলেন, আবু হুরাইরা (রা.) বলেছেন :

إِنَّ النَّاسَ يَقُوْلُوْنَ أَكْثَرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا آيَتَانِ فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيْثًا ثُمَّ يَتْلُوْ {إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدٰى} إِلٰى قَوْلِهِ {الرَّحِيْمُ} إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِيْ أَمْوَالِهِمْ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُوْلَ اللهِ

---

১৯২. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১১৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২৬৬৮।

১৯৩. ইবন আব্দিল বার্‌র, জামিউ বায়ানিল ইলম, হাদীস : ৪২২; আসকালানি, ফাতহুল বারি ১/২০৭ ও ১/২১৫।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبَعِ بَطْنِهِ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُوْنَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُوْنَ.

লোকেরা বলাবলি করছে, আবু হুরাইরা বেশি বেশি বর্ণনা করছে। যদি আল্লাহর কিতাবে দুটি আয়াত না থাকত, আমি একটি হাদীসও বর্ণনা করতাম না। তারপর তিনি সূরা বাকারাহর ১৫৯ ও ১৬০ নং আয়াত দুটি তিলাওয়াত করেন।[১৯৪] এবং অন্য সাহাবিদের তুলনায় তাঁর হাদীস ভান্ডার সমৃদ্ধ হওয়ার কারণ হিসাবে বলেন, আমাদের মুহাজির ভাইয়েরা ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে মশগুল থাকতেন, আনসার ভাইয়েরা অন্যান্য কাজে মশগুল থাকতেন আর আবু হুরাইরা শুধু ক্ষুধা নিবারণের উপর তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে পড়ে থাকত। তাঁরা যখন অনুপস্থিত থাকতেন সে তখনো উপস্থিত থাকত, তাঁরা যা মুখস্থ করতে পারতেন না সে তাও মুখস্থ করত।[১৯৫]

এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবিদের সমাজেই আবু হুরাইরা (রা.) হাদীসের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে পরিগণিত হন। দলে দলে তাবিয়ি প্রজন্ম তাঁর নিকট হাদীস শিখতে আসেন। এমনকি প্রধান সাহাবিরাও তাঁকে হাদীস জিজ্ঞাসা করেন। যদিও তাঁর হাদীসের সংখ্যা দেখে প্রথমে তাঁরা হতচকিত হয়েছেন। তবে পরে বাস্তবতা উপলব্ধি করে তাঁরা খোলাখুলি স্বীকৃতি দিয়েছেন যে, আবু হুরাইরার জন্য সর্ববৃহৎ হাদীসের ভান্ডার হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাঁর হাদীসের ছাত্র, যাদের বর্ণিত হাদীস হাদীসের কিতাবে সংকলিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা আট শতাধিক।

ওয়ালিদ ইবন আব্দুর রাহমান বলেন, আবু হুরাইরা (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন :

---

১৯৪. আয়াত দুটির অনুবাদ : 'নিশ্চয় যারা আমার নাযিলকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনাবলি ও হিদায়াত গোপন করে মানুষের জন্য কিতাবে আমি তা বর্ণনা করার পর তাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করেন এবং অভিশাপকারীগণ অভিশাপ করেন। তবে যারা বিরত হয়, সংশোধন করে নেয় এবং বর্ণনা করে দেয় আমি তাদের তাওবা কবুল করে থাকি। আর আমি তো তাওবা কবুলকারী দয়ালু।' এর দ্বারা বোঝা যায়, আবু হুরাইরা (রা.)-ও হাদীসকে অবতীর্ণ ওহি হিসাবে বিশ্বাস করতেন। কেননা অবতীর্ণ ওহি গোপনের দায় থেকে বাঁচার জন্যই হাদীস বর্ণনা করেন বলে এ হাদীসে তিনি জানাচ্ছেন।

১৯৫. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১১৮।

مَنْ شَهِدَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ.

যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হবে তার জন্য এক কীরাত সাওয়াব।

তখন আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) বলেন, হে আবু হুরাইরা, একটু ভেবে দেখুন, আপনি কী হাদীস বর্ণনা করছেন! আপনি তো নবীজি থেকে বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন! তখন আবু হুরাইরা (রা.) তাঁর হাত ধরে আয়িশা (রা.)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। এবং তাঁকে বললেন, আপনি একে বলে দিন, এই হাদীসটি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যেমন শুনেছেন। আয়িশা (রা.) আবু হুরাইরা (রা.)-এর বর্ণনা সত্যায়ন করেন। তখন আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, হে আবু আব্দুর রাহমান, আল্লাহর কসম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকা ব্যতীত গাছের একটি চারা লাগানো বা বাজার-ঘাটের কোনো কাজ আমার ছিল না। তখন ইবন উমার (রা.) বলেন :

أَنْتَ أَعْلَمُنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْفَظُنَا لِحَدِيْثِهِ.

হে আবু হুরাইরা, আপনি আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ব্যক্তি এবং আমাদের মধ্যে আপনিই তাঁর হাদীস সর্বাধিক মুখস্থকারী।[১৯৬]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.) আবু হুরাইরা (রা.)-কে বলেছেন :

يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْتَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْفَظَنَا لِحَدِيْثِهِ.

হে আবু হুরাইরা, আপনি আমাদের মধ্যে অধিক সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য অলম্বনকারী এবং তাঁর হাদীস সর্বাধিক সংরক্ষণকারী।[১৯৭]

---

১৯৬. ইবন সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ২/২৭৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৬১৬৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৪৪৫৩; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ৬২৭০।

১৯৭. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩৮৩৬।

আবু সালিহ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, আবু হুরাইরা (রা.) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ.

যখন তোমাদের কেউ ফজরের পূর্বের দুই রাকআত পড়বে তখন ডান কাতে শয়ন করবে।

তখন মারওয়ান ইবন হাকাম তাঁকে বলল, ডান কাতে শুয়ে বিশ্রামের সময়টুকুতে কেউ যদি মসজিদে রওয়ানা করে তবে কি যথেষ্ট হবে না? আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, না।

এ কথা ইবন উমার (রা.)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আবু হুরাইরা নিজের উপর বেশি করছে। তখন ইবন উমারকে বলা হলো, আবু হুরাইরা (রা.)-এর কোনো কথা কি আপনি অস্বীকার করছেন? তিনি বললেন, না। তবে আবু হুরাইরা সাহসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন আর আমরা নমনীয়তা গ্রহণ করছি। এ কথা আবু হুরাইরা (রা.)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন :

فَمَا ذَنْبِيْ إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوْا.

এতে আমার কী দোষ, যদি তাঁরা ভুলে যায় আর আমি স্মরণ রাখি?[১৯৮]

মালিক ইবন আবী আমির (রাহ.) বলেন, এক ব্যক্তি সাহাবি তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.)-এর নিকট এসে বলল, হে আবু মুহাম্মাদ, ওই ইয়ামানি লোক, অর্থাৎ আবু হুরাইরা, সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী? সে কি আপনাদের থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত—তাঁর কাছে এমন অনেক কথা শুনতে পাই যা আপনাদের কাছে শুনি না? নাকি সে এমন কথাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বলে যা তিনি বলেননি? তখন তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) বলেন :

وَاللهِ مَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ نَسْمَعْ وَعَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ إِنَّا كُنَّا أَقْوَامًا أَغْنِيَاءَ وَلَنَا بُيُوْتَاتٌ

---

১৯৮. সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ১২৬১; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস : ১১২০; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস : ৪৮৮৭।

وَأَهْلُوْنَ وَكُنَّا نَأْتِيْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَكَانَ مِسْكِيْنًا لَا مَالَ لَهُ وَلَا أَهْلَ إِنَّمَا كَانَتْ يَدُهُ مَعَ يَدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَدُوْرُ مَعَهُ حَيْثُ مَا دَارَ وَلَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَا لَمْ نَعْلَمْ وَسَمِعَ مَا لَمْ نَسْمَعْ... وَلَمْ يَتَّهِمْهُ أَحَدٌ مِنَّا أَنَّهُ تَقَوَّلَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ.

আল্লাহর কসম, আমাদের কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন অনেক কথা শুনেছেন যা আমরা শুনিনি, এমন অনেক কিছু জানেন যা আমরা জানি না। কেননা আমরা সম্পদের অধিকারী ছিলাম। আমাদের বাড়িঘর, পরিবার-পরিজন ছিল। আমরা দিনের দুই প্রান্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতাম। আর তিনি ছিলেন রিক্তহস্ত ও পরিবার-পরিজনহীন মিসকীন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরেই নির্ভরশীল ছিলেন। নবীজি যেখানে যেতেন তিনিও সেখানে যেতেন। তাই আমরা নিঃসন্দেহ যে, তিনি এমন অনেক কিছু জানেন যা আমরা জানি না এবং এমন অনেক কিছু শুনেছেন যা আমরা শুনিনি। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর ব্যাপারে এই সন্দেহ করেনি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বানোয়াট কথা বলেন।[১৯৯]

উপরে উত্থাপিত তথ্যের আলোকে আমরা জানতে পারছি, আবু হুরাইরা (রা.) তিন বছরের অধিক সময় শুধুই হাদীস অর্জনের জন্য সবকিছু পরিত্যাগ করে আবাসে-প্রবাসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্য আবশ্যক করে নিয়েছিলেন। তারপর মদীনায় অবস্থানরত সকল সাহাবির হাদীস তিনি সংগ্রহ করেছেন।

আমরা এ বিষয়টিও জেনেছি যে, সাহাবিগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোনো হাদীস শুনলে পরস্পরের মাঝে আলোচনা করতেন। এভাবে একটি হাদীস শুধু একজনই জানতেন না। বরং বহুজনের মাঝে ছড়িয়ে যেত। সুতরাং যারা মদীনার বাইরে চলে গিয়েছিলেন তাঁদের জানা

১৯৯. মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস : ৬৩৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৬১৭২; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩৮৩৭; মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস : ৮১৪।

হাদীসগুলো যে শুধু তাঁরাই জানতেন এমন নয়। বরং মদীনায় অবস্থানরত কোনো না কোনো সাহাবি হয়তো সেটি জানতেন। সুতরাং মদীনার সকল হাদীস সংগ্রহ করা মানে হাদীসের প্রায় পুরো ভান্ডারটাই আত্মস্থ করা।

এভাবে হাদীসের প্রায় পুরো ভান্ডার আত্মস্থ করার পর আবু হুরাইরা (রা.) প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ পরবর্তীদের নিকট নিরবচ্ছিন্নভাবে হাদীস বর্ণনা করে গেছেন। সুতরাং তাঁর নামে সর্বাধিক হাদীস, যার সংখ্যা পাঁচ হাজারের কিছু বেশি, বর্ণিত হওয়া মোটেও আশ্চর্যের বা অসম্ভব বিষয় নয়। তিনি বারবার বলেছেন এবং অন্য সাহাবিগণও মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সাহাবিদের মাঝে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক হাদীস জানা ব্যক্তি।

যে সকল হাদীস তিনি সাহাবিদের কাছ থেকে শিখেছেন বর্ণনার ক্ষেত্রে কখনো তিনি উস্তাদ সাহাবির নাম বলেছেন কখনো বলেননি। আর কোনো সাহাবির জন্য উস্তাদ সাহাবির নাম উহ্য রেখে হাদীস বর্ণনা করা শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দোষের কিছু নয়। একটি হাদীস বর্ণনার পর জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন :

سَمِعْتُ ذٰلِكَ مِنَ الْفَضْلِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

এটি আমি ফযল ইবন আব্বাস (রা.) থেকে শুনেছি। সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনিনি।[২০০]

অন্য সাহাবিগণও এমনটি করতেন। এ বিষয়ক কিছু আলোচনা আমরা 'হাদীস সংরক্ষণ ও সম্প্রচারে সাহাবিগণ' শিরোনামের অধীনে দেখেছি।

হুমাইদ (রাহ.) বলেন, আনাস ইবন মালিক (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি এ হাদীসটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন? এ প্রশ্নে আনাস (রা.) প্রচণ্ড রেগে যান এবং বলেন :

وَاللهِ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمْ بِهِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ كَانَ يُحَدِّثُ بَعْضُنَا بَعْضًا وَلَا يَتَّهِمُ بَعْضُنَا بَعْضًا.

আল্লাহর কসম, আমরা যে সকল হাদীস বর্ণনা করি সব হাদীসই আমরা

২০০. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১১০৯; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস : ৭৯৯৬।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সরাসরি শুনিনি। বরং আমরা নবীজির কাছ থেকে শোনা হাদীস একে অপরকে বর্ণনা করতাম। আর আমাদের একে অপরকে সন্দেহ করত না।[২০১]

হাদীসশাস্ত্রের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা উসমান ইবন আব্দুর রাহমান ইবনুস সালাহ (রাহ.) [৬৪৩ হি.] বলেন :

إِنَّا لَمْ نَعُدَّ فِيْ أَنْوَاعِ الْمُرْسَلِ وَنَحْوِهِ مَا يُسَمَّى فِيْ أُصُوْلِ الْفِقْهِ مُرْسَلَ الصَّحَابِيِّ مِثْلَمَا يَرْوِيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَحْدَاثِ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْمَعُوْهُ مِنْهُ لِأَنَّ ذٰلِكَ فِيْ حُكْمِ الْمَوْصُوْلِ الْمُسْنَدِ لِأَنَّ رِوَايَتَهُمْ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالْجَهَالَةَ بِالصَّحَابِيِّ غَيْرُ قَادِحَةٍ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كُلَّهُمْ عُدُوْلٌ.

ইবন আব্বাস প্রমুখ নবীন সাহাবি যে সকল হাদীস সরাসরি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শোনেননি, বরং কোনো সাহাবি থেকে শুনে সরাসরি নবীজির নামে বর্ণনা করেছেন, ফিকহশাস্ত্রে তাকে 'সাহাবির মুরসাল' বলা হলেও আমরা তাকে সূত্র-বিচ্ছিন্ন মুরসাল গোত্রীয় বলে গণ্য করি না। এ ধরনের বর্ণনা অবিচ্ছিন্ন সনদের বর্ণনা বলে গণ্য। কেননা নাম উহ্য রেখে সাহাবি কর্তৃক সাহাবির বর্ণনা দূষণীয় নয়। কারণ সাহাবিগণ সকলেই আদিল তথা সৎ ও নির্ভরযোগ্য।[২০২]

উম্মাহর নিকট হাদীস সংরক্ষণের গুরুত্ব

হাদীস সংরক্ষণ, সম্প্রচার ও মান্য করার ক্ষেত্রে সাহাবিদের গুরুত্ব ও আগ্রহ আমরা দেখলাম। পরবর্তীদের গুরুত্ব ও আগ্রহও এমনই ছিল। হাদীসের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে উম্মাতের যে বিশ্বাস তা হাদীস শিক্ষাগ্রহণ ও দানে উম্মাতকে এমন প্রেষণা দান করেছে মানব-সভ্যতার ইতিহাসে ইতিহাসের কোনো পর্ব বা অধ্যায় সংরক্ষণে মানব জাতির কোনো প্রজন্ম এর ধারেকাছের আগ্রহও অনুভব করেনি।

---

২০১. মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৬৪৫৮; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস : ৬৯৯।
২০২. মুকাদ্দামাহ ইবনুস সালাহ, পৃ. ৫৬।

ইতিহাসের সর্বসাক্ষ্য হাজির করলে আমরা দেখতে পাব, মানব জাতির সমগ্র ইতিহাসে কুরআনের পরেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ও সর্বপ্রযত্নে সংরক্ষিত হয়েছে হাদীসে নববি। কুদরতে ইলাহি মনুষ্য প্রজাতির যে অংশ দ্বারা হাদীস সংরক্ষণের খেদমত নিয়েছে তাদেরকে এ কাজে এত নিবিষ্টতা দান করেছে এবং তাদেরকে দিয়ে এমন সব ম্যাকানিজম ব্যবহার করিয়েছে যে, হাদীস পরিপূর্ণভাবে এবং অবিকলরূপে সংরক্ষিত হতে পেরেছে। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে লিখিত হয়েছে, কিন্তু হাদীস তা হয়নি। এজন্য হাদীস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গরূপে গ্রন্থাবদ্ধ না হয়েছে উচ্চ মনোবল ও মেধাসম্পন্ন বিরাট একটা গোষ্ঠী এ কাজে পরিপূর্ণরূপে নিবেশিত থেকেছে। তারা হাদীস সংরক্ষণকে কুরআন সংরক্ষণের মতোই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিশ্বাস করেছে এবং নিজেদের সর্বসাধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছে। আমরা ইতিহাসের কিছু সাক্ষ্য হাজির করছি।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) বলতেন :

تَذَاكَرُوْا هٰذَا الْحَدِيْثَ لَا يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ الْقُرْآنِ مَجْمُوْعٌ مَحْفُوظٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَذَاكَرُوْا هٰذَا الْحَدِيْثَ يَنْفَلِتْ مِنْكُمْ وَلَا يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ حَدَّثْتُ أَمْسِ فَلَا أُحَدِّثُ الْيَوْمَ بَلْ حَدِّثْ أَمْسِ وَلْتُحَدِّثِ الْيَوْمَ وَلْتُحَدِّثْ غَدًا.

তোমরা নিয়মিত হাদীস চর্চা ও আলোচনা করতে থাকবে, তাহলে তোমাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হতে পারবে না। হাদীস তো কুরআনের মতো এখনো একত্র সংকলিত নয়। তাই তোমরা যদি নিয়মিত হাদীসের চর্চা-আলোচনা জারি না রাখো তোমাদের কাছ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা কেউ কোনোভাবেই বলবে না যে, গতকাল হাদীস আলোচনা করেছি, আজ আর করব না। বরং গতকাল, আজ এবং আগামীকাল—এভাবে প্রতিদিন হাদীস চর্চা জারি রাখবে।[২০৩]

ইবন আব্বাস (রা.)-এর এ বক্তব্য থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, হাদীস যেহেতু কুরআনের মতো লিপিবদ্ধ ছিল না তাই তাঁরা হাদীস সংরক্ষণে আলাদাভাবে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন।

২০৩. সুনান দারিমি, হাদীস : ৬২৪।

তাবিয়ি ইসমাঈল ইবন উবাইদুল্লাহ (রাহ.) [১৩২ হি.] বলতেন :

يَنْبَغِيْ لَنَا أَنْ نَحْفَظَ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحْفَظُ الْقُرْآنُ لِأَنَّ اللهَ يَقُوْلُ: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ.

আমাদের কর্তব্য কুরআনের মতোই গুরুত্ব দিয়ে হাদীস মুখস্থ ও সংরক্ষণ করা। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তোমরা তা গ্রহণ করো।[২০৪]

তাবিয়ি ইসরাঈল ইবন ইউনুস (রাহ.) [১৬০ হি.] বলেন :

كُنْتُ أَحْفَظُ حَدِيْثَ أَبِيْ إِسْحَاقَ كَمَا أَحْفَظُ السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ.

আমি আবু ইসহাক বর্ণিত হাদীসগুলো এমনভাবে মুখস্থ করেছি যেভাবে কুরআনের সূরা মুখস্থ করি।[২০৫]

তাবিয়ি কাতাদাহ (রাহ.) সাঈদ ইবন আবী আরূবাহকে সূরা বাকরাহ মুখস্থ শোনালেন। একটি হরফেও কোনো ভুল হলো না। তারপর তিনি বললেন :

لَأَنَا لِصَحِيْفَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَحْفَظُ مِنِّيْ لِسُوْرَةِ الْبَقَرَةِ.

জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) সংকলিত হাদীসের পুস্তিকা সূরা বাকারাহ থেকে আমার বেশি মুখস্থ।[২০৬]

তাবিয়ি শাহর ইবন হাওশাব (রাহ.) [১১২ হি.] এর ছাত্র আব্দুল হামীদ ইবন বাহরাম সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (রাহ.) বলেন, তার কাছে শাহর ইবন হাওশাবের পাণ্ডুলিপি ছিল :

كَانَ يَحْفَظُهَا كَأَنَّهُ يَقْرَأُ سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ.

তিনি তার হাদীস এমনভাবে মুখস্থ করতেন যেন কুরআনের সূরা পাঠ করছেন।[২০৭]

---

২০৪. খতীব বাগদাদি, আল কিফায়াহ : ১৭; ইবন আসাকির, তারীখ দিমাশ্ক, ৮/৪৩৬; মিয্যি, তাহযীবুল কামাল, ৩/১৪।

২০৫. যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ১০/৭৮; খতীব বাগদাদি, তারীখ বাগদাদ, ৭/৪৭৬।

২০৬. বুখারি, আত তারীখুল কাবীর, ৭/১৮৬; ইবন সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা, ৭/১৭১।

২০৭. ইবন আসাকির, তারীখ দিমাশ্ক, ২৩/২২৪; মিয্যি, তাহযীবুল কামাল, ১৬/৪১১।

এ ধরনের প্রচুর বর্ণনা ইতিহাস ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান আছে। মুসলিম উম্মাহ এভাবেই কুরআনের মতো গুরুত্ব দিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস সংরক্ষণ করেছে।

হাদীস লিপিবদ্ধকরণ ও প্রথম দিককার পাণ্ডুলিপি

প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে সংকলিত। এবং এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের শুরুতে যে সকল বর্ণনাসূত্র আছে সে বর্ণনাসূত্রের বর্ণনাকারীগণ সাধারণত حَدَّثَنَا (আমাদেরকে হাদীস বলেছেন), أَخْبَرَنَا، أَنْبَأَنَا (আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন) سَمِعْتُ (আমি শুনেছি) ইত্যাদি শ্রুতিবাচক শব্দে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য হাদীসশাস্ত্র না জানা অনেকে ধারণা করতে পারেন এবং হাদীস-বিরোধীরা অপপ্রচার করেন যে, সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়ি যুগে হাদীস শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধকরণের নিয়ম ছিল না। বরং মৌখিকভাবে বর্ণনা করা ও মুখস্থ করে নেওয়াই ছিল এক্ষেত্রে একমাত্র রীতি।

কিন্তু বিষয়টি কখনোই তা নয়। হাদীস বর্ণনা ও সংকলনের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অগভীর ভাসাভাসা জ্ঞান এ বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে এবং ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের মানসেই এ অপপ্রচার চালানো হয়েছে। বস্তুত হাদীস বর্ণনা ও সংকলনের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ সূক্ষ্মতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। তারা মৌখিক বর্ণনা ও লিখিত পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনায় ভুলভ্রান্তি অনুপ্রবেশের পথ রোধ করেছেন। হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সনদ বর্ণনায় সর্বদা মৌখিক বর্ণনা ও শ্রুতির পাশাপাশি লেখন ও পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করা হতো।

সাহাবিগণ সাধারণত হাদীস মুখস্থ করতেন এবং কখনো কখনো লিখেও রাখতেন। মূলত সাহাবিদের জন্য হাদীস লিখে রাখার প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। কেননা অধিকাংশ সাহাবি থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মাত্র ২০/৩০টি বা তার চেয়ে কম। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীস পাঁচ হাজারের কিছু বেশি। তবে সনদের বিভিন্নতা বাদ দিয়ে শুধু মূল হাদীসের সংখ্যা হিসাব করলে তা হবে মাত্র হাজারের কিছু বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্যে কাটানো

দিনগুলোর স্মৃতি থেকে ২০/৩০টি, ১০০টি, এমনকি হাজারটি ঘটনা বা কথা বর্ণনা করার জন্য লিখে রাখার প্রয়োজন ছিল না।

কেননা এছাড়া তাঁদের জীবনে আর কোনো বড় বিষয় ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্মৃতি আলোচনা, তাঁর নির্দেশাবলি হুবহু পালন, অনুকরণ ও তাঁর কথা মানুষদের শোনানোই ছিল তাঁদের জীবনের প্রধানতম কাজ। অন্য কোনো জাগতিক ব্যস্ততা তাঁদের মন-মগজকে ব্যস্ত করতে পারত না। আর যে স্মৃতি ও কথা সর্বদা মনে জাগরূক এবং কর্মে বিদ্যমান তা তো আর পৃথক কাগজে লিখে রাখার দরকার হয় না। তা সত্ত্বেও অনেক সাহাবি তাঁদের মুখস্থ হাদীস লিখে রাখতেন। আবু হুরাইরা (রা.)-ও পরবর্তীকালে তাঁর হাদীসগুলো লিখে রেখেছিলেন। এমনকি নবীজি নিজেও তাঁর অনেক হাদীস লিখিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবিগণ (রা.) কর্তৃক লিখিত হাদীসের পরিমাণ একেবারেই কিঞ্চিন্মাত্র নয়। এ সংক্রান্ত সকল বর্ণনা একত্র করলে দেখা যায় তার পরিমাণ অনেক।

সাহাবিদের ছাত্র তাবিয়িদের যুগ থেকেই হাদীস শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল লিখন পদ্ধতি। অধিকাংশ তাবিয়ি ও পরবর্তী যুগের মুহাদ্দিসগণ উস্তাদের কাছে হাদীস শুনতেন, লিখতেন ও মুখস্থ করতেন। উস্তাদগণ নিজ নিজ পাণ্ডুলিপি থেকে ছাত্রদেরকে হাদীস শোনাতেন আর ছাত্ররা শোনার সাথে সাথে তা নিজেদের পাণ্ডুলিপিতে লিখতেন এবং শিক্ষকের পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে নিতেন। এ বিষয়ক অগণিত বিবরণ ইতিহাস ও হাদীস বিষয়ক গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে। মাত্র দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি।

আবু হুরাইরা (রা.)-এর হাদীসের ছাত্র তাবিয়ি বাশীর ইবন নাহীক (৯১ হি.) বলেন :

كُنْتُ أَكْتُبُ مَا أَسْمَعُ مِنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُفَارِقَهُ أَتَيْتُهُ بِكِتَابِهِ فَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ: هٰذَا سَمِعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

আমি আবু হুরাইরা (রা.) থেকে যে সকল হাদীস শুনতাম তা লিখে রাখতাম। বিদায়ের কালে সে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম, তাঁকে

তা পড়ে শোনালাম এবং বললাম, এগুলোই তো আমি আপনার কাছ থেকে শুনেছি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে।[২০৮]

এ বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, তাবিয়ি বাশীর ইবন নাহীক (রাহ.) আবু হুরাইরা (রা.) থেকে যে সকল হাদীস শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন সব তিনি লিখে রেখেছিলেন এবং সে পাণ্ডুলিপি আবু হুরাইরা (রা.)-এর কাছে পেশ করে সম্পাদনা করে নিয়েছিলেন।

তাবিয়ি সাঈদ ইবন জুবাইর (৯৫ হি.) বলেন :

كُنْتُ أَكْتُبُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَإِذَا امْتَلَأَتِ الصَّحِيْفَةُ أَخَذْتُ نَعْلِيْ فَكَتَبْتُ فِيْهَا حَتَّى تَمْتَلِئَ.

আমি সাহাবি ইবন আব্বাস (রা.)-এর কাছে হাদীস লিখতাম। লিখতে লিখতে যখন পৃষ্ঠা ভরে যেত তখন আমার স্যান্ডেল নিয়ে তাতে লিখতাম। লিখতে লিখতে তাও ভরে যেত।[২০৯]

তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আকীল (১৪০ হি.) বলেন :

كُنْتُ أَذْهَبُ أَنَا وَأَبُوْ جَعْفَرٍ إِلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمَعَنَا أَلْوَاحٌ صِغَارٌ نَكْتُبُ فِيْهَا الْحَدِيْثَ.

আমি এবং আবু জা'ফর সাহাবি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.)-এর নিকট যেতাম। আমাদের সাথে ছোট ছোট বোর্ড থাকত। তাতে আমরা হাদীস লিখতাম।[২১০]

এ সময় থেকে পাণ্ডুলিপি থেকে হাদীস শিক্ষা দেওয়া এবং হাদীস শোনার সাথে সাথে তা লিখে নেওয়া হাদীস শিখন পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। ব্যতিক্রম কিছু মুহাদ্দিস, যারা শুধু স্মৃতি থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন, মুহাদ্দিসদের নিকট তারা সাধারণত দুর্বল রাবি হিসাবে পরিগণিত হতেন। পাণ্ডুলিপি থেকে শিক্ষাদানকারী শিক্ষককে আদর্শ শিক্ষক হিসাবে গণ্য করা হতো। শুধু স্মৃতি থেকে মুখস্থ হাদীসের মৌখিক বর্ণনা ছাত্ররা গ্রহণ করতে চাইতেন না।

---

২০৮. সুনান দারিমি, হাদীস : ৫১১।

২০৯. ইবন খাল্লাদ, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল, পৃ. ৩৭১।

২১০. ইবন খাল্লাদ, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল, পৃ. ৩৭০।

দ্বিতীয় হিজরি শতকের একজন রাবি আব্দুল আযীয ইবনু ইমরান ইবন আব্দুল আযীয (১৭০ হি.)। তিনি ছিলেন মদীনার অধিবাসী ও সাহাবি আব্দুর রাহমান ইবন আওফের বংশধর। মুহাদ্দিসগণ তাকে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কারণ তার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ব্যাপক। আর এ ভুলভ্রান্তির কারণ হলো পাণ্ডুলিপি ব্যতিরেকে মুখস্থ বর্ণনা করা। তৃতীয় হিজরি শতকের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক উমার ইবন শাব্বাহ (২৬২ হি.) তার সম্পর্কে বলেন :

كَانَ كَثِيْرَ الْغَلَطِ فِيْ حَدِيْثِهِ لِأَنَّهُ احْتَرَقَتْ كُتُبُهُ فَكَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ.

তিনি হাদীস বর্ণনায় প্রচুর ভুল করতেন। কারণ তার পাণ্ডুলিপি পুড়ে গিয়েছিল। আর এ কারণে তিনি স্মৃতির উপর নির্ভর করে মুখস্থ হাদীস বর্ণনা করতেন।[২১১]

তৃতীয় শতকের মুহাদ্দিস আলী ইবনুল মাদীনি (২৩৪ হি.) বলেন :

لَيْسَ فِيْ أَصْحَابِنَا أَحْفَظُ مِنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ إِنَّهُ لَا يُحَدِّثُ إِلَّا مِنْ كِتَابِهِ وَلَنَا فِيْهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

আমাদের মাঝে আহমাদ ইবন হাম্বাল ছিলেন সর্বাধিক মুখস্থশক্তির অধিকারী। তা সত্ত্বেও তিনি পাণ্ডুলিপি সামনে না রেখে হাদীস বর্ণনা করতেন না। তার মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।[২১২]

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বালের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন :

قَالَ يَحْيٰى بْنُ مَعِيْنٍ: قَالَ لِيْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: اكْتُبْ عَنِّيْ وَلَوْ حَدِيْثًا وَّاحِدًا مِّنْ غَيْرِ كِتَابٍ فَقُلْتُ: لَا وَلَا حَرْفًا.

ইয়াহইয়া ইবন মাঈন বলেন, ইমাম আব্দুর রাযযাক সানআনি আমাকে বলেন, তুমি অন্তত একটি হাদীস পাণ্ডুলিপি ছাড়া আমার কাছ থেকে শুনে

---

২১১. আসকালানি, তাহযীবুত তাহযীব, ৬/৩৫১; সাখাবি, আত তুহফাতুল লাতীফাহ, ২/১৮৫।
২১২. আবু নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/১৬৫।

লিপিবদ্ধ করো। আমি তাকে বললাম, না, পাণ্ডুলিপির প্রমাণ ব্যতীত একটি হরফও আমি লিখতে পারব না।[২১৩]

এরূপ অগণিত বিবরণ ইতিহাস ও হাদীসশাস্ত্রীয় কিতাবাদিতে বিদ্যমান। এ সকল বর্ণনার আলোকে প্রমাণিত যে, হিজরি প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ সাহাবিদের যুগ থেকেই হাদীস লিখে সংরক্ষণ করা হতো। মুহাদ্দিসগণ লিখিত পাণ্ডুলিপি দেখে হাদীস বর্ণনা করতেন, নিরীক্ষা করতেন, বিশুদ্ধতা যাচাই করতেন এবং প্রত্যেক ছাত্র তার শ্রুত হাদীস লিখে রাখতেন। ছাত্র শুনতেন উস্তাদের পাণ্ডুলিপির পাঠ। তারপর তা নিজের পাণ্ডুলিপিতে লিখে উস্তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে নিতেন।

এ আলোচনা থেকে দুটি প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে। ১. হিজরি প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই যখন হাদীস শিখনের ক্ষেত্রে লিখন পদ্ধতি চালু হয়ে যায় এবং উস্তাদের পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠগ্রহণ অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় তখন হাদীসের বর্ণনাকারীগণ সাধারণত শ্রুতিবাচক (حَدَّثَنَا أَنْبَأَنَا أَخْبَرَنَا : আমাদেরকে বলেছেন) শব্দেই কেন হাদীস বর্ণনা করেছেন? কেন তারা এখনকার দিনে গ্রন্থের রেফারেন্স দেওয়ার মতো লিখিত পাণ্ডুলিপির রেফারেন্স দেননি?

২. সে সময় থেকেই যদি সকল ছাত্র তার উস্তাদের কাছ থেকে শেখা হাদীসের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন তবে তো হাদীস সংকলিত হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি থাকার কথা। কিন্তু আমরা দেখছি সংরক্ষিত হাদীস সংকলনের অধিকাংশ গ্রন্থ তৃতীয়, চতুর্থ বা তার পরবর্তী শতাব্দীর। তাহলে প্রাচীন সে সকল পাণ্ডুলিপি কোথায় গেল? উম্মাতের অবহেলায় কি সেসব হারিয়ে গেছে? তবে কি এ উম্মাতের সালাফ হাদীস সংরক্ষণে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন না?

প্রথম সংশয় নিরসন : আমরা আগেই বলেছি, মূলত মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ নবীজির হাদীসের সংরক্ষণ ও বিশুদ্ধতা রক্ষায় অতি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। তারা মুখস্থ থেকে মৌখিক বর্ণনা ও লিখিত পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ের মাধ্যমে হাদীস বর্ণনায় ভুলভ্রান্তি অনুপ্রবেশের পথ রোধ করেছেন।

---

২১৩. মুসনাদ আহমাদ, ২২/৭৬; যাহাবি, তারীখুল ইসলাম, ৫/৩৭৪।

আমরা জানি, সেকালে আধুনিক মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার হয়নি। তখনকার পাণ্ডুলিপি মানেই হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি। প্রাচীন হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠোদ্ধারের বিষয়ে যার মোটামুটি ধারণা আছে তিনি জানেন, স্মৃতি থেকে মুখস্থ বর্ণনা করতে গেলে যেমন মানুষের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, পাণ্ডুলিপি থেকে পাঠোদ্ধার করতে গেলে তারও অধিক ভুলের সম্ভাবনা থাকে। পাঠোদ্ধারকারী লেখকের হস্তলিপি বুঝতে ভুল করে এক শব্দকে ভিন্ন শব্দ ধারণা করতে পারেন। আর যদি তিনি মূল লেখকের পাণ্ডুলিপির পরিবর্তে অনুলিপিকারের পাণ্ডুলিপি হাতে পান, তাহলে তার নিজের পাঠোদ্ধারে ভুলের সম্ভাবনার পাশাপাশি অনুলিপিকারের ভুলের সম্ভাবনা অতিরিক্ত যুক্ত হবে। তাছাড়া অনুলিপিকার যদি মূলপাঠের অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক কোনো শব্দ লিখে রাখেন বা টীকা সংযুক্ত করেন, পাঠোদ্ধারকারী সেগুলোকেও মূলপাঠ মনে করে ভুল করতে পারেন।

ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। বাইবেল গবেষক পণ্ডিতগণ বলছেন, বাইবেলের মূলপাঠেই অগণিত ভুল, বিকৃতি ও পাঠের ভিন্নতা বিদ্যমান। তারা বলেন, এই ভুলের অন্যতম কারণ তাদের এইসব ধর্মগ্রন্থ অনুলিপি করা হয়েছে শুধু পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করে। যিনি যা বুঝেছেন তা-ই লিখেছেন। অনুলিপিকারের ব্যাখ্যামূলক শব্দ ও টীকাও পরবর্তী অনুলিপিকারের পাণ্ডুলিপিতে মূলপাঠে ঢুকে পড়েছে।

কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিসগণ হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষায় ব্যবহার করেছেন অতিশয় সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। কোনো মুহাদ্দিস তার উস্তাদের নিকট হাদীসের পাঠগ্রহণের সময় পাণ্ডুলিপি থেকে উস্তাদের পাঠ শুনেছেন, মুখস্থ করেছেন, নিজের পাণ্ডুলিপিতে লিখেছেন এবং উস্তাদের পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। এবার তিনি যখন তার ছাত্রদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন স্মৃতি ও পাণ্ডুলিপি উভয় পদ্ধতিকে যুগপৎভাবে ব্যবহার করেছেন। স্মৃতি থেকে মুখস্থ বর্ণনার ভুলের সম্ভাবনা পাণ্ডুলিপি রোধ করেছে আর পাণ্ডুলিপি পাঠের ভুলের সম্ভাবনা স্মৃতি রোধ করেছেন।

হাদীসের পাণ্ডুলিপি তো বাজারে পাওয়া যায়। আপনি সে পাণ্ডুলিপি বাজার থেকে সংগ্রহ করে হাদীস শিখে বর্ণনা করছেন নাকি উস্তাদের কাছ থেকে এর বিশুদ্ধ পাঠও শিখে নিয়েছেন—এটা হচ্ছে বড় ব্যাপার। এই বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য সকলেই শ্রুতিবাচক (حَدَّثَنَا أَنْبَأَنَا أَخْبَرَنَا :

আমাদেরকে বলেছেন) শব্দে হাদীস বর্ণনা করতেন। অর্থাৎ মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় শ্রুতিবাচক শব্দ 'حَدَّثَنَا أَنْبَأَنَا أَخْبَرَنَا বা অমুক আমাদেরকে বলেছেন' কথার অর্থ হচ্ছে, তার কিতাবটি তার নিজের কাছে বা তার অমুক ছাত্রের কাছে, যিনি তার কাছে পঠিত শুনছেন, আমি তার কাছে পড়ে নিজ কানে শুনে তা থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করছি। কেউ কেউ 'আমি তাকে পড়তে শুনেছি' বা 'আমি পড়েছি' এরূপ শব্দে বললেও সাধারণত 'তিনি আমাদেরকে বলেছেন' বলেই এক বাক্যে তারা যুগপৎভাবে উভয় বিষয় বোঝাতেন।

ইমাম মালিক (রাহ.) সংকলিত 'মুআত্তা' কিতাবটি এখন ছাপা হয়ে যেমন আমাদের কাছে রয়েছে, তেমনি এর পাণ্ডুলিপি ইমাম বুখারি ও মুসলিম (রাহ.)-এর যুগেও ছিল। তাঁরা ইমাম মালিকের ছাত্রদের কাছে এ কিতাবের পাঠ গ্রহণ করেছেন। এ কিতাবের হাদীস তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে তাঁরা সংকলনও করেছেন। কিন্তু এ কিতাবের হাদীস উদ্ধৃত করতে গিয়েও তাঁরা শ্রুতিবাচক (حَدَّثَنَا : আমাদেরকে বলেছেন ইত্যাদি) শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাঁদের এই শ্রুতিবাচক শব্দ ব্যবহারের কারণে কি মুআত্তা মালিকের বিদ্যমানতা অস্বীকার করা যায়?

এমন আরো অনেক মুহাদ্দিসের লিখিত পাণ্ডুলিপি ইমাম বুখারি ও মুসলিমের কাছে ছিল। তারা ওই কিতাবগুলো লেখকের ছাত্র বা ছাত্রের ছাত্রদের কাছ থেকে শুনেছেন এবং সেখান থেকে নির্বাচন করে অনেক হাদীস তাদের সহীহ কিতাবে শ্রুতিবাচক (حَدَّثَنَا : আমাদেরকে বলেছেন ইত্যাদি) শব্দ ব্যবহার করে বর্ণনা করেছেন।[২১৪]

দ্বিতীয় সংশয় নিরসন : বাস্তবতা এটাই, হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকেও হাদীসের শত শত সংকলন বিদ্যমান ছিল। এবং মুসলিম উম্মাহর সালাফগণ ছিলেন হাদীস সংরক্ষণে খুবই যত্নবান। সে যুগে হাদীসের প্রায় সকল ছাত্রই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন। তবে তাদের পাণ্ডুলিপিতে হাদীস বিশেষ কোনো ধারাক্রমে সাধারণত বিন্যস্ত হতো না। বরং হাদীস শেখার ধারাক্রমেই তারা পাণ্ডুলিপিতে লিখে রাখতেন। যেটি আগে শিখেছেন সেটি আগে আর যেটি তারপরে শিখেছেন সেটি পরে লিখতেন।

---

২১৪. বিস্তারিত দেখুন : আহমাদ সানুবার, মিনান নাবিয়্যি ইলাল বুখারি : পৃ. ৩৬৯।

তাছাড়া একজন ছাত্র শুধু একজন উস্তাদের কাছে হাদীস শিখতেন না। বরং সাধ্যানুযায়ী অনেক উস্তাদের কাছ থেকে শিখতেন। এক উস্তাদের কাছে শেখা শেষ হলে অন্য উস্তাদের কাছে যেতেন। এভাবে তার হাদীস সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এবং ক্রমেই সনদে রাবির সংখ্যা বৃদ্ধি পেত। এভাবে ছাত্রের পাণ্ডুলিপির কলেবর উস্তাদের পাণ্ডুলিপির কলেবর থেকে বৃদ্ধি পেত। এভাবে একাধিক উস্তাদের পাণ্ডুলিপি একজন ছাত্রের পাণ্ডুলিপির ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে।

এভাবে দিনে দিনে হাদীসের পাণ্ডুলিপির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। উস্তাদের থেকে ছাত্রের পাণ্ডুলিপি বৃহৎ থেকে বৃহৎ হয়েছে। এবং তার পরে ছাত্ররা তাদের বিভিন্ন উস্তাদের কাছ থেকে শেখা হাদীসগুলো তাদের পাণ্ডুলিপিতে বিশেষ বিন্যাসে গ্রন্থনা করেছেন। বিভিন্ন উস্তাদের পাণ্ডুলিপি স্বতন্ত্রভাবে রাখেননি। ছাত্রদের এই বৃহৎ ও বিন্যস্ত পাণ্ডুলিপির মধ্যে শিক্ষকদের পাণ্ডুলিপি একাকার হয়ে গেছে। পুরোটাই একীভূত হয়েছে বটে; তবে স্বতন্ত্র চেহারায় নয়। তাই বলা যায়, পূর্বের পাণ্ডুলিপি ও পুস্তিকাগুলো ধ্বংস বা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। এখন আমাদের হাতে থাকা বৃহদাকার ও বিন্যস্ত পুস্তকগুলোর মাঝে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলীন করে একাকার হয়ে আছে। আর উস্তাদদের হাতে তৈরি পাণ্ডুলিপির প্রয়োজন না থাকায় তা দৃশ্যপট থেকে সরে গেছে।[২১৫]

তবে দ্বিতীয় শতকের হাদীসের অনেক পাণ্ডুলিপি এখনো বিদ্যমান আছে। অনেকগুলো তো মুদ্রিত হয়েছে এবং অনেক প্রসিদ্ধিও পেয়েছে। ইমাম আবু হানীফার (১৫০ হি.) 'কিতাবুল আসার', ইমাম মালিকের (১৭৯ হি.) 'মুআত্তা', ইমাম মা'মার ইবন রাশিদের (১৫৩ হি.) 'জামি', আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের (১৮১ হি.) মুসনাদ ও যুহদ, ইবন ওয়াহাব (১৯৭ হি.), ওয়াকি' ইবনুল জাররাহ (১৯৭ হি.) ও মুআফা বিন ইমরানের (১৮৫ হি.) যুহদ, ইমাম আব্দুর রাযযাকের (২১১ হি.) 'মুসান্নাফ' তার অন্যতম।

তাছাড়া প্রথম শতকের কোনো কোনো পাণ্ডুলিপি অধুনা আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী যুগের কিতাবাদির সাথে মিলিয়ে দেখা গেছে, কীভাবে

---

২১৫. ইবন খাল্লাদ, আল মুহাদ্দিসুল ফাসিল; আজ্জাজ খাতীব, আস সুন্নাতু কাবলাত তাদবীন; আহমাদ সানুবার, মিনান নাবিয়্যি ইলাল বুখারি; আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, হাদীসের নামে জালিয়াতি; মুস্তফা আযমি, হাদিস সংকলনের ইহিতাস।

প্রাচীন সে সকল পাণ্ডুলিপি এ সকল গ্রন্থের মাঝে একীভূত হয়ে আছে। যেমন : সহীফাতু হাম্মাম ইবন মুনাব্বিহ, নুসখাতু সুহাইল ইবন আবি সালিহ, আহাদিসি ইয়াযীদ ইবন আবি হাবীব ইত্যাদি।

হাদীস সংরক্ষণ পরিপূর্ণ ও সুসম্পাদিত

একজন প্রভাবশালী সাধারণ বা রাজনৈতিক নেতা, যার অনেক ভক্ত, অনুরক্ত, অনুচর ও অনুসারী আছে। যারা তার সকল নির্দেশনা ও কর্মসূচি সর্বসাধ্য দিয়ে পালন ও বাস্তবায়ন করে। নেতার কোনো বিষয় ভালো লাগলে তারা কেউ কেউ ব্যক্তিজীবনেও তা প্রতিপালন করে। তার মৃত্যুর অনেক পরে, যখন প্রবীণ ভক্তরাও অনেকেই মারা গেছে, তখন হয়তো স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বা জিজ্ঞাসিত হয়ে কোনো কিছু বলতে ভক্তকে পেছনের জীবন হাতড়ে ফিরতে হবে। তখন এটাই স্বাভাবিক যে, এই ভক্তের স্মৃতি থেকে অনেক কিছু মুছে গেছে। আবার অনেক কিছু সে ভুলভালও বর্ণনা করতে পারে—এটাই বাস্তবতা। সুতরাং এমতাবস্থায় নেতার সকল বিষয় আর কিছুতেই যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন সাধারণ নেতার মতো এবং সাহাবিদেরকে তাদের অনুসারীর মতো মনে করেন, তারা দাবি করেন যে, নবীজির সকল হাদীস কিছুতেই সংরক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়। হাদীস নামে যা সংরক্ষিত হয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও অসম্পাদিত। এ দাবির পক্ষে তারা প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন প্রবীণ সাহাবিদের নামে খুব কমসংখ্যক হাদীস বর্ণিত হওয়া এবং তাদের দৃষ্টিতে হিকমতপূর্ণ অনেক কিছু হাদীসের কিতাবে অনুপস্থিত থাকা।

আল্লাহর শরীআত প্রতিপালনের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের জামাআত কেমন নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন তা আমরা জানি। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মানব জাতির জন্য শরীআত প্রতিপালনে মহান আল্লাহ নির্ধারিত একমাত্র নমুনা। এজন্য সাহাবিগণ (রা.) নবীজির কথাকর্ম ও জীবনাচারকে নিজেদের জীবনাচারে পরিণত করেছিলেন। এ কথাটি একক বা একদল সাহাবির ক্ষেত্রে কেবল প্রযোজ্য ছিল না; বরং পুরো সাহাবি-সমাজের জন্য প্রযোজ্য। যে নববি বিষয়টি ছিল নবুওয়াতের প্রথম দিকের, শেষ যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবির জন্যও সেটি পালনীয়

ছিল। এমন নয় যে, যে সাহাবি নবীজির কোনো একটি কর্ম দেখলেন বা কথা শুনলেন শুধু তার জন্যই তা পালন ও সংরক্ষণ করা জরুরি।

যে ব্যক্তি কোনো বিষয় জানল তার দায়িত্ব যে জানে না তার কাছে পৌছে দেওয়া। আর যে জানে না তার দায়িত্ব যে জানে তার কাছ থেকে জেনে নেওয়া। সাহাবিগণ এ দায়িত্ব পালনকেই জীবনের প্রধানতম কর্তব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। নবীন প্রবীণের কাছ থেকে জেনেছেন, এমনকি প্রবীণ নবীনের কাছ থেকেও। প্রবীণ যা জানবেন নবীন তা জানবেন না বা পালন করবেন না, ইসলামে এর অনুমতি তো নেই। তাই পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা নবীজির পুরো জীবনাচারকে সমাজে মূর্তিমান করে উপস্থিত রেখেছেন। তাঁদের সমাজের দিকে তাকালে যে দৃশ্য দেখা যেত এবং কান পাতলে যে আওয়াজ শোনা যেত তা-ই তো হাদীস বা সুন্নাহ। এ বিষয়ক আলোচনা আমরা পূর্বে দেখে এসেছি।

নবীন-প্রবীণ সাহাবিদের নিয়ে যে সাহাবি-সমাজ, এই সমাজে চর্চিত ইসলাম পূর্ণাঙ্গ সুন্নাহ বা নববি জীবনাচার। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন হায়াতে ছিলেন প্রয়োজনীয় সম্পাদনা করেছেন—সংশোধন করেছেন, সংযোজন ও বিয়োজন করেছেন। সাহাবিগণ কারো মধ্যস্থতায় নবীজির কোনো কথাকর্ম জানতে পারলে, আর তাতে তাঁদের খটকা লাগলে, স্বয়ং নবীজির কাছে সরাসরি এসে যাচাই করে নিতেন। অর্থাৎ সাহাবিদের সমাজে বিদ্যমান সুন্নাহ ছিল পরিপূর্ণ এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সম্পাদিত।

কোনো একজন সাহাবির হয়তো নবীজির কোনো হাদীস শুনতে, বুঝতে ও বর্ণনা করতে ভুল হতে পারে। কিন্তু পুরো জামাআতের তো ভুল হতে পারে না। যদি আমরা বলি যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের পুরো জামাআতেরই ভুল হতে পারে, তবে তার অর্থ তো এই যে, ইসলামকেই বুদ্ধির অগম্য ও পালনের অযোগ্য দাবি করা হচ্ছে। কেননা সাহাবিরা যে ক্ষেত্রে ভুলের শিকার হয়েছেন পরবর্তীদের জন্য সেক্ষেত্রে নির্ভুল হওয়া সম্ভব নয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবিরা যখন পরস্পরের মধ্যে হাদীসের চর্চা করতেন তখন কারো কোনো ধরনের ভুল হলে অন্যেরা সংশোধন করে দিতেন। যেমন মাকহুল (রাহ.) বলেন, আবু

হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

اَلشُّؤْمُ فِيْ ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ.

'তিনটি বস্তুতে কুলক্ষণ রয়েছে : ঘর, নারী ও ঘোড়া।' এ কথা আয়িশা (রা.)-কে বলা হলে তিনি বলেন, আবু হুরাইরা সঠিকভাবে জানেন না। কেননা তিনি নবীজির কথার মাঝখানে এসেছিলেন। তাই পুরোটা শুনতে পাননি। শেষের অংশ শুনেছিলেন, প্রথম অংশ শোনেননি। নবীজি মূলত বলেছিলেন :

قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ الشُّؤْمَ فِيْ ثَلَاثَةٍ: فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ.

আল্লাহ ইয়াহুদিদেরকে ধ্বংস করুন। কেননা তারা বলে, 'তিনটি বস্তুতে কুলক্ষণ রয়েছে : ঘর, নারী ও ঘোড়া'।[২১৬]

তাছাড়া কোনো সাহাবি বর্ণিত হাদীস কারো মধ্যস্থতায় অন্য সাহাবির নিকট পৌছলে এবং এতে তাঁর কোনো রকম খটকা লাগলে এই সাহাবি মূল বর্ণনাকারী সাহাবির কাছে গিয়ে যাচাই করতেন। যেমন জনৈক ব্যক্তির মধ্যস্থতায় আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বর্ণিত বেচাকেনায় সুদ সংক্রান্ত একটি হাদীস আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা.)-এর নিকট পৌছে। তখন তিনি আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-এর নিকট গিয়ে যাচাই করেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন :

يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

হে আবু সাঈদ, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই যে হাদীস বর্ণনা করছেন, এর বিষয়টি কী? তখন তিনি বলেন, আমি এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি।[২১৭]

এ বিষয়ক আরো কিছু আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। এভাবে বারবার সম্পাদনার মাধ্যমে নবীজির সকল হাদীস বা সুন্নাহ নির্ভুল ও নিখুঁতরূপে সমাজে বিরাজমান ছিল। এই পূর্ণাঙ্গ ও সুসম্পাদিত সুন্নাহই পরবর্তী

---

২১৬. মুসনাদ তায়ালিসি, হাদীস : ১৬৪১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৬০৩৪।

২১৭. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১১৭৭২; সহীহ বুখারি, হাদীস : ২১৭৬; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ১/৫৪৬।

প্রজন্ম, অর্থাৎ তাবিয়িগণ সাহাবিদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন— সাহাবিদের সমাজ দেখে এবং তাঁদের মৌখিক বর্ণনা থেকে। তারপর তাঁদের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্ম। এভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম নবীজির সুন্নাহ শিখে আসছে। পূর্ববর্তী প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের যথাযোগ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট পূর্ণ সতর্কতার সাথে পৌঁছে দিচ্ছেন।

মনে রাখতে হবে, হাদীস বা সুন্নাহ অর্থাৎ ইসলাম কেবল মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়নি। বরং আমালে মুতাওয়ারাস বা কর্ম পরম্পরাই ইসলাম সংরক্ষণের সব থেকে বিশ্বস্ত মাধ্যম। মহান আল্লাহ প্রত্যেক পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে এমন বিশাল জামাআত সৃষ্টি করেছেন যারা পূর্ববর্তী প্রজন্মের কাছ থেকে প্র্যাক্টিক্যালি ইসলাম পালনের নববি নমুনা শিখেছেন। কোনো যুগেই কেবল লিখিত বা মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে ইসলাম শেখার প্রচলন ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا يَزَالُ اللهُ يَغْرِسُ فِيْ هٰذَا الدِّيْنِ غَرْسًا يَسْتَعْمِلُهُمْ فِيْ طَاعَتِهِ.

মহান আল্লাহ সর্বদা এই দীনের মধ্যে এমন বৃক্ষ রোপণ করতে থাকেন, অর্থাৎ ব্যক্তিবর্গ সৃষ্টি করেন যাদেরকে তিনি তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত রাখেন।[২১৮]

সুতরাং কেবল লিখিত বা মৌখিক বর্ণনার দ্বারা সুন্নাহ সংরক্ষিত হওয়া না-হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা ইসলাম সংরক্ষণের ইতিহাস ও ইসলাম প্রতিপালনের পদ্ধতি সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

আশা করি, উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে, প্রবীণ সাহাবিদের নামে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে তাঁদের জানা অনেক হাদীস হারিয়ে গেছে, এমন সিদ্ধান্তে আসার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা তাঁদের জানা হাদীস নবীনদেরও জানা ছিল। এবং তাঁরা কখনো প্রবীণদের নাম উক্ত করে, কখনো উহ্য রেখে সেসব হাদীস বর্ণনা করেছে। হাদীসশাস্ত্রের ছাত্রমাত্রই এ সকল তথ্য অবগত।

আর হিকমত বিষয়ক তাদের দাবিটিও অবান্তর। কারো কাছে মনে হলো, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিকমতের ভেতরে এটাও থাকার

---

২১৮. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭৭৮৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ০৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ৩২৬।

দরকার, কিন্তু হাদীসের কিতাবে যেহেতু এ বিষয়ক কোনো বর্ণনা নেই সুতরাং হাদীস ভান্ডার, যাকে নবীর হিকমত বা প্রজ্ঞা বলা হয়, অসম্পূর্ণ। এ রকম দাবি মূলত নিজের বিবেচনাকে ইসলামের মানদণ্ড বানানোর নামান্তর। পাশ্চাত্য দর্শনের কাছে মগজ বেচে দেওয়া কেউ কেউ মনে করেন, কেবল জাগতিক লাভ-ক্ষতি ও উন্নতি-অবনতির জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধিচাতুর্যই হিকমত। আর আন্তরিক প্রশান্তি, রবের সন্তুষ্টি এবং পরকালীন মুক্তি, উন্নতি ও সফলতা লাভের দুআ-যিকির ও আমল-ইবাদত কোনো হিকমত নয়।

হাদীস সংরক্ষণে বিশ্বাস ঈমানের দাবি

আল কুরআনে বারংবার নির্দেশ এসেছে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো, রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করো। আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট কিতাব ও হিকমত পাঠিয়েছেন, তাঁকে কিতাবের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন এবং তাঁর উপর অতিরিক্ত ওহিও নাযিল করেছেন। এবং রাসূলেকে দায়িত্ব দিয়েছেন তাঁর কাছে যা কিছু নাযিল হয়েছে তা মানব জাতির কাছে পৌঁছে দিতে এবং তাদেরকে তার ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে।

অর্থাৎ ইসলামি শরীআত হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা, তাঁদের উভয়ের আনুগত্য করা এবং রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করা। এ শরীআত কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য মান্য করা আবশ্যক। সর্বকালেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যেমন ঈমান আনতে হবে, তাঁদের আনুগত্য করতে হবে তেমনি রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করতে, তাঁর অনুসরণ-অনুকরণের পরীক্ষা দিতে হবে কুরআনের অতিরিক্ত ওহির বিধান মান্য করার মাধ্যমে এবং শরীআতের সকল বিধান প্রতিপালন করতে হবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নমুনা বানিয়ে। তবেই তার আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসের দাবি আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا.

"তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম নমুনা আল্লাহর রাসূলের মধ্যে—

যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিবসে এবং অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে।"[২১৯]

এই আয়াতে শরীআত প্রতিপালনে যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নমুনা বানানো হয়েছে, এটাকে কোনো দেশকালের সীমায় সীমাবদ্ধ করা হয়নি; বরং আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। সুতরাং সকল দেশকালের বিশ্বাসী মুমিনকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নমুনায় শরীআত প্রতিপালন করতে হবে।

আমরা যদি মেনেও নিই যে, আল কুরআনে ইসলামি শরীআতের সকল বিধিবিধান পরিপূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে তবুও আমাদের মানতেই হবে যে, বিধান থাকলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে তা পালন করতেন সেই নমুনা আল কুরআনে নেই। তা আছে কেবল হাদীসে, সুন্নাহয় বা হিকমাতে, অথবা অন্য যে নামেই আমরা তাকে আখ্যায়িত করি না কেন।

এখন কীভাবে যুগযুগান্তের মানুষ রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণ করবেন, কীভাবে তাঁর নমুনায় শরীআত পালন করবেন, যদি না তাঁর কথা-কর্ম-অনুমোদন সংরক্ষিত থাকে? আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য যা পালন করা আবশ্যক করেছেন তা সংরক্ষণ করবেন না? যদি সংরক্ষিত না থাকে তবে তো তিনি এমন বিষয়ের আদেশ দিচ্ছেন যা পালন করা সম্ভবই নয়। মহান আল্লাহ কি তাঁর বান্দার উপর এমন দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে পারেন? তিনি তো পরিষ্কার বলেছেন :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।"[২২০]

সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের দাবি হচ্ছে, পরিপূর্ণরূপে এই বিশ্বাসও রাখা যে, তিনি হাদীস ও সুন্নাহ যথাযথভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। যা তিনি মানতে বাধ্য করেছেন তা তিনি সংরক্ষণ করবেন না—আল্লাহর প্রতি এই অবধারণা করে কেউ নিজেকে মুমিন দাবি করতে পারে না।

---

২১৯. সূরা [৩৩] আহযাব, আয়াত : ২১।

২২০. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ২৮৬। আরো দেখুন : সূরা বাকারাহ, ২৩৩; সূরা আনআম, ১৫২; সূরা আ'রাফ, ৪২; সূরা মু'মিনূন, ৬২।
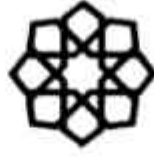
হাদীস অস্বীকারের রকমফের

হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে হাদীসে নববির উপর বিভিন্ন ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে এবং সংশয় সৃষ্টি করে থাকে। তার অধিকাংশই অযৌক্তিক, অর্থহীন ও ফালতু প্রলাপ। সেসবের জবাব দিতে যাওয়াটাও বিরক্তিকর ও অরুচিকর। কিন্তু যেহেতু সেসব কথায় সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয় তাই এ পর্বে আমরা তাদের যেসব কথা শুনতে কিছুটা যৌক্তিক মনে হয় তার বাস্তবতা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

পাঠক, এখানে তাদের উত্থাপিত যেসব আপত্তি ও সংশয়ের জবাব দেওয়া হয়নি তা অতিশয় ফালতু জ্ঞানেই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তবে এ ধরনের কোনো কথায় যদি কারো মনে হয়, তাতে কিছুটা হলেও যুক্তি আছে, তার কাছে অনুরোধ রইল, আপনি অবশ্যই শাস্ত্রজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হবেন। শুধু তাদের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সকল ফিতনা থেকে হিফাজত করুন। আমীন!!

আল্লাহ কুরআনকে সহজ করেছেন

কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ বলেছেন :

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.

"আর আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করেছি।

সুতরাং আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী?"[২২১]

এ আয়াত পেশ করে হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, আল্লাহ যেহেতু কুরআনকে সহজ করেছেন সুতরাং কুরআন বোঝার জন্য কারো কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, এ কথা বলে তারা মূলত ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে না; বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা বা হাদীসকে অস্বীকার করে নিজেদের মনমতো ব্যাখ্যা করতে চায়।

উপরন্তু তাদের এ দাবি নানা কারণে সঠিক নয়। আল্লাহ এ আয়াতে বলেছেন, তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন। কিন্তু এখানে ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে সমগ্র কুরআন উদ্দেশ্য নয়। কেননা কুরআন অন্যত্র সুস্পষ্ট করে বলেছে, কুরআনের একটি বড় অংশের মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউ বুঝবে না। মহান আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.

"তিনি আপনার নিকট কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, এগুলোই কিতাবের মূল অংশ। আর অন্যগুলো দ্ব্যর্থবোধক। যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা ফিতনা ও অপব্যাখ্যার মানসে দ্ব্যর্থবোধক বিষয়ের পিছনে পড়ে। তবে সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী তারা বলে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম। সবকিছু আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। কেবল বোধের অধিকারীগণই উপদেশ গ্রহণ করে।"[২২২]

তাছাড়া আয়াতে কারীমায় বলা হয়েছে, তিনি কুরআনকে সহজ করেছেন। কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, তার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। এটা

---

২২১. সূরা [৫৪] কামার, আয়াত : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০।

২২২. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ০৭।

তাদের নিজেদের ব্যাখ্যা। তাদের এ ব্যাখ্যা মূলত কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য।

এ গ্রন্থের শুরুর দিকের আলোচনায় আমরা দেখেছি, আল কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াতে কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং সে ব্যাখ্যার দায়িত্ব যে আল্লাহর রাসূলের উপর তাও সুস্পষ্ট করেই বলা হয়েছে। এ আয়াতের সাথে ওই আয়াতগুলোর কোনো বিরোধও নেই। প্রথমত, এ আয়াতে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা অস্বীকার করা হয়নি। দ্বিতীয়ত, আয়াতটিতে প্রযুক্ত (الذِّكْرِ) 'উপদেশ' শব্দটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। দুটি বিষয় লক্ষ করুন।

১. আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় মোটা দাগে দুইভাগে বিভক্ত। এক, উপদেশমূলক বিষয়াদি; দ্বিতীয়ত, বিধিবিধান ও আইন-আহকাম জাতীয় বিষয়। আয়াতে কারীমায় 'الذِّكْرِ' বা 'উপদেশ' শব্দ উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সহজতার বিষয়টি মূলত উপদেশমূলক বিষয়াদির সাথে সম্পৃক্ত। তাছাড়া আইনগত জটিল বিষয়াদির সাথে সহজতার বিষয়টি সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়।

২. এ আয়াতে মহান আল্লাহ 'الذِّكْرِ' বা 'উপদেশ' শব্দ ব্যবহার করে বলেছেন, 'আমি الذِّكْرِ বা উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করেছি'। ঠিক একই শব্দ উল্লেখ করে অন্য আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছেন, আপনি এই 'الذِّكْرِ' বা 'উপদেশগ্রন্থ'কে মানুষের জন্য ব্যাখ্যা করবেন। ইরশাদ হয়েছে :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

"আমি আপনার নিকট 'الذِّكْرِ' বা 'উপদেশগ্রন্থ' নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেন, যা তাদের নিকট নাযিল করা হয়েছে; এবং যাতে তারা চিন্তা-ফিকির করতে পারে।"[২২৩]

প্রথম আয়াতে যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, الذِّكْرِ বা উপদেশের জন্য আমি কুরআনকে সহজ করেছি, তেমনি এ আয়াতে বলেছেন الذِّكْرِ বা

---

২২৩. সূরা [১৬] নাহল, আয়াত : ৪৪।

উপদেশেরও নববি ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে। এরপর তিনি বলেছেন, 'যাতে তারা চিন্তা-ফিকির করতে পারে'। অর্থাৎ পরবর্তীদের কুরআন নিয়ে চিন্তা-ফিকির হতে হবে নববি ব্যাখ্যার আলোকে—আইন-আহকামের বিষয়াদিতে তো বটেই; এমনকি উপদেশ বা নসীহাহ-মূলক বিষয়েও।

কোনো বিষয় সহজ হলেই যে তার আর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না, এ কথা যৌক্তিক ও বাস্তবসম্মত নয়। সহজ বিষয়েরও যে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় তা আমরা গ্রন্থটির শুরুতে 'কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা' শিরোনামে আলোচনা করেছি।

শব্দের সর্বজনমান্য ও জ্ঞাত নিজস্ব কোনো স্থির অর্থ নেই। মূলত বক্তার অভিপ্রায়ই সব। বক্তার অভিপ্রায় নিখুঁতভাবে বুঝবার জন্য দরকার বক্তা ও শ্রোতার অভিজ্ঞতার সমতা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে থাকে অভিজ্ঞতার ভিন্নতা। তাই দেখা যায়, সারা জীবনের সঙ্গী-সহচররাও পরস্পরের সব কথা বুঝতে পারে না। যদিও সে তাদের মাঝে নিত্যদিন ব্যবহৃত আটপৌরে শব্দেই কথা বলে থাকে। একে অন্যের বক্তব্য শোনার সময় বারবার প্রশ্ন করে বুঝে নিতে হয়।

মহান আল্লাহ অনাদি অনন্ত অসীম। আর আমরা সকল দিক থেকেই সীমায় আবদ্ধ। সুতরাং আমরা যেমন তাঁর সকল সহজ কথাও অতিসহজেই বুঝতে পারব না, তেমনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে বুঝে নিতেও পারব না। তাহলে আমাদের কী হবে? আমাদের তো আল্লাহর বাণী নিখুঁতভাবে বোঝা এবং তার উপর আমল করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই!

আমাদের এই অসহায়ত্বের উপর মহান আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে... কিতাব এবং হিকমত শিক্ষা দেন।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ ইলম ও হিকমতের মাধ্যমে আমাদেরকে আল্লাহর বাণীর প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন।

কুরআন ব্যাখ্যায় কুরআনই যথেষ্ট

তারা এ কথাও বলেন যে, কুরআনের কোনো আয়াত যদি উদ্দিষ্ট বিষয়ে অসম্পূর্ণ বা অস্পষ্টও হয়ে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট সকল আয়াত একত্র

করলে পুরো বিষয়টি পুরোপুরি পরিস্ফুট হয়ে যাবে, কোনো অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা থাকবে না। তাই কুরআন ব্যাখ্যার জন্য কুরআনই যথেষ্ট, হাদীস বা অন্য কিছুর কোনো প্রয়োজন নেই।

কুরআন বুঝতে হাদীসের প্রয়োজন নেই, তাদের এ দাবি কুরআন-বিরোধী, পূর্বের আলোচনায় আমরা তা দেখে এসেছি। তাছাড়া কুরআনের এক অংশ অপর অংশের যে ব্যাখ্যা করে তা বুঝতেও উম্মাত নববি দিকনির্দেশনা থেকে সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী নয়। কুরআন নাযিলের যুগে সাহাবিদেরকেও এক্ষেত্রে নববি নির্দেশনার সাহায্য নিতে হয়েছে। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দেখি।

মহান আল্লাহ সূরা আনআমের ৮২ নং আয়াতে বলেন :

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ.

"যারা ঈমান আনল আর নিজেদের ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করল না, তাদের জন্য রয়েছে নিরাপত্তা; আর তারাই সুপথপ্রাপ্ত।"

আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বলেন, এ আয়াতটি যখন নাযিল হলো, এর বিষয়বস্তু সাহাবিদের নিকট অত্যন্ত কঠিন বলে অনুভূত হলো এবং উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কে আর এমন আছে যে ঈমানকে জুলুমের সাথে মিশ্রিত করেনি! তখন নবীজি বলেন :

لَيْسَ ذٰلِكَ [الَّذِيْ تَعْنُوْنَ] إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ.

তোমরা যেমন বুঝছ বিষয়টি তা নয়। এখানে জুলুম হচ্ছে শিরক। তোমরা কি আল কুরআনের ওই বক্তব্য শোনোনি, লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়ে যা বলেছিলেন, *হে বৎস, তুমি আল্লাহর সাথে শিরক করবে না। নিশ্চয় শিরক ভয়ংকর জুলুম।*[২২৪]

ভাষা পরিবর্তনশীল। একই ভাষার পাঁচশত বছর বা হাজার বছর আগের

২২৪. সূরা [৩১] লুকমান, আয়াত : ১৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ৩৫৮৯; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৩৪২৯, ৪৭৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১২৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ৩০৬৭।

রূপ আর পরের রূপ এক হয় না। তাই কোনো ভাষায় কথন বা লেখনের মাধ্যমে প্রদত্ত কোনো বক্তব্য সমকালের মানুষের জন্য বোঝা যতটা সহজ শত বছর বা হাজার বছর পরের মানুষের জন্য ততটা সহজ নয়। বরং দূর অতীতের বক্তব্য বোঝার জন্য সাধারণতই বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়।

যদিও কুরআন-হাদীসের অনুশাসনের কারণে আরবি ভাষার পরিবর্তনের গতি শ্লথ, তবুও একেবারে অপরিবর্তনীয় নয়। কুরআন নাযিলের যুগের আরবি ভাষা আর আজকের আরবি ভাষা হুবহু এক নয়। তাহলে কুরআন নাযিলের যুগের মানুষদের জন্যই যখন কুরআন দ্বারা যতটুকু কুরআনের ব্যাখ্যা হয় তা বুঝতেও নববি নির্দেশনার প্রয়োজন হয়েছে, এ বাস্তবতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা মানতে বাধ্য হই যে, এ যুগের আনারব তো বটেই, আরবরাও কুরআন বুঝতে নববি ব্যাখ্যার অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। তাদের এই মুখাপেক্ষিতা সে যুগের আরবদের থেকে অনেক বেশি।

আল্লাহই একমাত্র বিধানদাতা

আমরা আল্লাহর বান্দা। কেবল মহান আল্লাহরই অধিকার আছে আমাদের উপর বিধান দেওয়ার এবং আমরাও একমাত্র তাঁরই বিধান মানতে বাধ্য। অন্য কেউ আমাদের উপর বিধান দিতে পারে না এবং আমরা অন্য কারো বিধান মানতেও পারি না। মহান আল্লাহ বলেন :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ.

"বিধান শুধুই আল্লাহর।"[২২৫]

মহান আল্লাহ আমাদের জন্য ওহির মাধ্যমে বিধান দিয়েছেন। তা আল কুরআনে সংকলিত রয়েছে। আল কুরআনে সকল কিছুর বিধান বর্ণিত হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ.

"আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি, যা সকল বিষয় সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে।"[২২৬]

---

২২৫. সূরা [৬] আনআম, আয়াত : ৫৭; সূরা [১২] ইউসুফ, আয়াত : ৪০ ও ৬৭।

২২৬. সূরা [১৬] নাহল, আয়াত : ৮৯।

তিনি আরো বলেছেন :

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ.

"আমি এই কিতাবে কোনো কিছুই বর্ণনা করতে বাদ রাখিনি।"[২২৭]

এর ভিত্তিতে হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, সুতরাং কুরআন ছাড়া আমরা আর কিছুই মানতে পারি না। আর তার প্রয়োজনও নেই। কেননা কুরআন পরিপূর্ণ ও যথেষ্ট। এখন কুরআন ছাড়া অন্য কিছুর দিকে হাত বাড়ানোর অর্থই হচ্ছে, কুরআনের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা এবং মহান আল্লাহ ছাড়াও অন্য কেউ বিধানদাতা আছে বলে স্বীকার করা।

প্রিয় পাঠক, আপনারা পূর্বের আলোচনায় দেখেছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীআত ও আখিরাত সম্পর্কে যা-কিছু বলেছেন সবই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ওহির মাধ্যমে বলেছেন। তা কুরআনে সংকলিত হোক বা না হোক। নিজের মনগড়া কিছুই বলেননি। আল কুরআনে মহান আল্লাহ নিজেই এ কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেছেন :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى.

"এবং তিনি প্রেরিত ওহি ছাড়া প্রবৃত্তি থেকে কথা বলেন না।"[২২৮]

হাদীস শরীফে এসেছে, তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রা.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় কিছু মানুষকে খেজুরের পরাগায়ন করতে দেখে বলেন, আমার মনে হয় না এতে কোনো উপকার হবে। লোকেরা এ কথা জানতে পেরে পরাগায়ন ছেড়ে দেয়। ফলে খেজুরের ফলন কমে যায়। তিনি এ বিষয়টি জানতে পেরে বলেন :

إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذٰلِكَ فَلْيَصْنَعُوْهُ فَإِنِّيْ إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُوْنِيْ بِالظَّنِّ وَلٰكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنِ اللهِ شَيْئًا فَخُذُوْا بِهِ فَإِنِّيْ لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ.

---

২২৭. সূরা [৬] আনআম, আয়াত : ৩৮।

২২৮. সূরা [৫৩] নাজম, আয়াত : ৩ ও ৪।

যদি এ কর্মে তাদের উপকার হয় তবে তারা তা করবে। আমি তো ধারণা ব্যক্ত করেছি মাত্র। তোমরা আমার ধারণা গ্রহণ করবে না। কিন্তু আমি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বলব তা গ্রহণ করবে। কেননা আমি আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করি না।[২২৯]

হাদীসটির অন্য বর্ণনায় রয়েছে, নবীজি বলেন :

> إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ دِيْنِكُمْ فَخُذُوْا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِيْ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ.
>
> আমি একজন মানুষ মাত্র। যখন আমি তোমাদের দীনের কোনো বিষয়ে আদেশ করি তোমরা তা গ্রহণ করবে। আর যদি আমার কোনো ধারণা ব্যক্ত করি তবে আমি তো একজন মানুষ মাত্র।[২৩০]

আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় হাদীসটিতে নবীজি বলেন :

> أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِمَا يَصْلُحُكُمْ فِيْ دُنْيَاكُمْ فَأَمَّا أَمْرُ أخِرَتِكُمْ فَإِلَيَّ.
>
> দুনিয়াবি কল্যাণকর বিষয়ে তোমরা অধিক জ্ঞাত। তবে তোমাদের আখিরাতের বিষয় আমার উপরেই ন্যস্ত থাকবে।[২৩১]

যেহেতু প্রমাণিত হচ্ছে, আল্লাহর দীন সম্পর্কে, শরীআত ও আখিরাত সম্পর্কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মনগড়া কিছুই বলেননি; বরং যা বলেছেন ওহির মাধ্যমেই বলেছেন। সুতরাং এ কথা কিছুতেই বলা যায় না যে, হাদীস মান্য করা মানে আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো বিধান মানা; বরং হাদীসও যেহেতু অবতীর্ণ ওহি সুতরাং হাদীস মানা মানে মহান আল্লাহরই আনুগত্য করা এবং রাসূলের আনুগত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহর নেওয়া পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া।

আল কুরআনে সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা

আর মহান আল্লাহ যে আল কুরআনে কোনো কিছুই বাদ রাখেননি, সকল কিছুই সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন, এখানে 'সকল কিছু' যে সাধারণ অর্থে

---

২২৯. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৩৬১।

২৩০. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৩৬২।

২৩১. মুসনাদ বাযযার, হাদীস : ৬৯৯২।

ব্যবহৃত নয়; বরং বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত তা সাধারণ দৃষ্টিতেই বোধগম্য হয়। কেননা আমরা খোলা চোখেই দেখতে পাই, আল কুরআনে দীন-দুনিয়ার 'সকল কিছু'র বর্ণনা নেই, সুস্পষ্ট বিস্তারিত তো দূরের কথা, সংক্ষিপ্ত অস্পষ্ট বর্ণনাও নেই।

যে বিশেষ অর্থে আয়াতে কারীমায় 'সকল কিছু' (كُلّ شَيْءٍ) শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে এই অর্থও প্রবিষ্ট রয়েছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস মান্য করতে হবে। কেননা পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, আল কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে যে, কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে এবং কুরআনের অতিরিক্ত বিধান দিয়ে মহান আল্লাহ তাঁর নবীর কাছে ওহি নাযিল করেছেন এবং সে ওহি মান্য করার সুস্পষ্ট নির্দেশনাও কুরআন কারীমে রয়েছে। অর্থাৎ 'সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা'র মধ্যে হাদীস মান্য করার নির্দেশ-সংবলিত সুস্পষ্ট বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আল্লামা জারুল্লাহ যামাখশারি (রাহ.) [৫৩৮ হি.] বলেন :

اَلْمَعْنٰى أَنَّهُ بَيَّنَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أُمُوْرِ الدِّيْنِ حَيْثُ كَانَ نَصًّا عَلٰى بَعْضِهَا وَإِحَالَةً عَلَى السُّنَّةِ حَيْثُ أَمَرَ فِيْهِ بِاتِّبَاعِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَاعَتِهِ وَقِيْلَ: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى. وَحَثًّا عَلَى الْإِجْمَاعِ فِيْ قَوْلِهِ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ رَضِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ اتِّبَاعَ أَصْحَابِهِ وَالْاِقْتِدَاءَ بِآثَارِهِمْ فِيْ قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَقَدِ اجْتَهَدُوْا وَقَاسُوْا وَوَطَّئُوْا طُرُقَ الْقِيَاسِ وَالْاِجْتِهَادِ فَكَانَتِ السُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ وَالْقِيَاسُ وَالْاِجْتِهَادُ مُسْتَنِدَةً إِلٰى تِبْيَانِ الْكِتَابِ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ.

আল কুরআন সকল কিছুর বর্ণনা—এ কথার অর্থ হচ্ছে, কুরআন দীনি বিষয়ে সকল কিছু বর্ণনা করেছে। তা এভাবে যে, কিছু বিষয় সুস্পষ্ট করে সরাসরি বর্ণনা করেছে আর কিছু কিছু বিষয় হাদীসের উপর হাওলা করে

এই বলে আদেশ করেছে যে, তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ-অনুকরণ করো, আর বলেছে, 'তিনি নিজ প্রবৃত্তি থেকে কিছুই বলেন না'। আর কুরআন এই বলে ইজমা'র প্রতি উৎসাহিত করেছে যে, 'যে ব্যক্তি মুমিনদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করে।...' নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথা বলে উম্মাতকে তাঁর সাহাবিদের পথ-পন্থার অনুসরণ-অনুকরণ করতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন যে, 'আমার সাহাবিগণ নক্ষত্রতুল্য। তোমরা তাদের যে কাউকে অনুসরণ করবে সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।'[২৩২] সাহাবিগণ ইজতিহাদ ও কিয়াস করেছেন এবং কিয়াস ও ইজতিহাদের বিভিন্ন পথ সুগম করেছেন। সুতরাং হাদীস, ইজমা', কিয়াস ও ইজতিহাদ কুরআনের বর্ণনার সাথেই সম্পৃক্ত। আর এ পদ্ধতিতেই কুরআন সকল কিছু সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে।[২৩৩]

আল্লামা মুহাম্মাদ ইবন আলী শাওকানি (রাহ.) [১২৫০ হি.] বলেন :

وَمَعْنَى كَوْنِهِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ أَنَّ فِيهِ الْبَيَانَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْأَحْكَامِ وَالْإِحَالَةُ فِيمَا بَقِيَ مِنْهَا عَلَى السُّنَّةِ وَأَمَرَهُمْ بِاتِّبَاعِ رَسُوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَأْتِي بِهِ مِنَ الْأَحْكَامِ وَطَاعَتِهِ كَمَا فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى ذٰلِكَ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أُوْتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

কুরআন সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা—এ কথার অর্থ হচ্ছে, তাতে অনেক বিধিবিধানের বর্ণনা রয়েছে। আর অবশিষ্ট বিধানের জন্য হাদীসের হাওলা করেছে। এবং রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তার আনুগত্য ও অনুকরণ-অনুসরণের আদেশ করেছে। যেমনটি আল কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর বিশুদ্ধ সনদে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বক্তব্যও বর্ণিত হয়েছে যে, আমাকে কুরআন ও তার সমপরিমাণ ওহি দান করা হয়েছে।[২৩৪]

---

২৩২. হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে এ বিষয়ের সমর্থক দলীল হিসাবে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য বিশুদ্ধ বর্ণনা রয়েছে।

২৩৩. যামাখশারি, আল কাশশাফ : ২/৬২৮।

২৩৪. শাওকানি, ফাতহুল কাদীর : ৩/২২৪।

আমরা এখানে সংক্ষিপ্ততার স্বার্থে শুধু দুইজন সর্বসম্মত কুরআন বিশারদের বক্তব্য উল্লেখ করলাম। অন্যথায় এই আয়াত নিয়ে যুগ যুগ ধরে গ্রহণযোগ্য সকল কুরআন বিশারদের বক্তব্য এমনই।

একবার এক তালিবুল ইলমকে দেখে এক লোক ডেকে বলে, তোমরা তো বলো যে, কুরআনে সকল সমস্যার সমাধান আছে। ছেলেটি বলে, অবশ্যই বলি, পরিপূর্ণ বিশ্বাস থেকেই বলি। তখন পাশ দিয়ে ঝুড়ি মাথায় এক লোক যাচ্ছিল। লোকটি বলল, কুরআন থেকে জবাব দাও তো ওই লোকটির ঝুড়িতে কী আছে? ছেলেটি ঝুড়িওয়ালাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়ে বলে, ওর মাথার ঝুড়িতে আম আছে। লোকটি বলল, এ কেমন কথা! তোমাকে তো কুরআন থেকে জবাব দিতে বললাম। ছেলেটি বলল, জি, আমি কুরআন থেকেই বলেছি, কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে বলেছি। আল কুরআনে আছে, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

فَاسْأَلُوْا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

"তোমাদের যদি জানা না থাকে তবে যারা জানে তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।"[২৩৫]

সালাত, যাকাত, হজ্জ, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদত যেমন কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের আলোকে ফরয, তেমনি কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের আলোকেই হাদীস মান্য করাও ফরয। আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, আল কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত দ্বারা বিষয়টি সাব্যস্ত।

হাদীস মানা কুরআনের পরিপূর্ণতাকে অস্বীকার করা

এ দাবিটিও সঠিক নয়। হাদীস মান্য করা বরং আল কুরআনের সম্পূর্ণতার পরিচায়ক। কেননা হাদীস মান্য করা হয় আল কুরআনেরই নির্দেশের আলোকে। যেমন ধরুন, কোনো কওমের নেতা তার কোনো নিকটতম ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করে রেখে মাস খানেকের জন্য বাইরের গেলেন। এবং এ প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা দিয়ে গেলেন। যাওয়ার আগে জাতির উদ্দেশে বক্তব্যে তিনি এ এক মাসে তাদের করণীয় বলে গেলেন। তিনি তার সে বক্তব্যে এ কথাও বললেন যে, আমার অবর্তমানে তোমরা সকল কর্ম করবে এ ব্যক্তির নেতৃত্বে ও নির্দেশনায়। আমি তাকে

২৩৫. সূরা [১৬] নাহল, আয়াত : ৪৩; সূরা [২১] আম্বিয়া, আয়াত : ০৭।

প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশনা দিয়ে গেলাম। এই প্রতিনিধি যদি নেতার দিকনির্দেশনা অনুযায়ী নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে জাতিকে পরিচালনা করেন তবে নিশ্চয় তার নির্দেশনা মেনে চলা জাতির জন্য নেতাকে অমান্য করা বা তার বক্তব্যকে অসম্পূর্ণ আখ্যায়িত করা বলে গণ্য হবে না। বরং তাকে মান্য না করাই নেতা ও তার বক্তব্যকে অমান্য করা বলে গণ্য হবে।

হাদীস অস্বীকারকারীরা তো অবশ্যই কুরআনের অনুবাদ প্রচার করেন এবং তা পড়তে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করেন। কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে এবং কুরআনের অতিরিক্ত কোনো বক্তব্য হাদীস হিসাবে মানা যাবে না বলে প্রচার করেন। তাদের এ দাবি কুরআনেই আছে বলে দাবি করে কুরআনের কিছু আয়াত উদ্ধৃত করে এ সকল আয়াত দ্বারা কীভাবে তাদের দাবি প্রমাণ হয় তা বোঝানোর জন্য আয়াতগুলোর লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যা করেন। তাদের দাবি অনুযায়ী তো তাদের এ সকল কর্মও কুরআনকে কার্যত অসম্পূর্ণ দাবি করার শামিল।

মহান আল্লাহ আল কুরআনে বারবার বলেছেন যে, তিনি আরবি কুরআন নাযিল করেছেন। এবং তার কারণ হিসাবে বলেছেন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

> "নিশ্চয় আমি কিতাবকে আরবি কুরআনরূপে নাযিল করেছি; যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পারো।"[২৩৬]

এই আয়াতের তো সরল মর্ম এই যে, কুরআন আরবি আর কুরআন এভাবে এজন্য অবতীর্ণ যে, যেন মানুষ তা বুঝতে পারে। এবং এই কুরআনই বিশ্ববাসীর জন্য হিদায়াত বা পথনির্দেশ। সুতরাং কুরআনের অনুবাদ করা, তা প্রচার ও পড়তে উদ্বুদ্ধ করা, *কুরআনই যথেষ্ট, এর বাইরে কিছু মানা যাবে না*—কিছু আয়াত উদ্ধৃত করে তা দ্বারা এই দাবি প্রমাণের জন্য লম্বা-চওড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা, এসব কি কুরআনের অনুধাবনযোগ্য, সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হওয়াকে অস্বীকার করা বলে গণ্য হবে না? হাদীস মানলে যদি এগুলোকে অস্বীকার করা হয়, তবে তাদের কর্মের ব্যাপারে কেন একই বক্তব্য প্রযোজ্য হবে না?

---

২৩৬. সূরা [১২] ইউসুফ, আয়াত : ০২।

সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কুরআন

সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে আল কুরআন—বহুল উচ্চারিত ও জনপ্রিয় একটি বাক্য। সব সমস্যার সমাধান যদি কুরআনই দিতে পারে তাহলে আর হাদীস মানতে হবে কেন? উপরে আমরা এ প্রশ্নের জবাব দিয়ে এসেছি। এখানে আমরা এ বাক্যটিকে ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনায় আনতে চাই।

জুমহূর উম্মাহ যদিও হাদীসকে ওহি হিসাবে বিশ্বাস করে এবং শরয়ি বিধিবিধান প্রমাণের অন্যতম দলীল হিসাবে মান্য করে, কিন্তু মুসলিম দাবিদার কিছু মানুষ নানাভাবে হাদীস অস্বীকার করে থাকে। এই মতভিন্নতাকে আমরা একটি সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করে সব সমস্যার সমাধানকারী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের কাছে সমাধান চেয়ে দেখতে পারি, কী সমাধান দেয়।

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, আল কুরআন তার বহুসংখ্যক আয়াতে সমাধান জানিয়েছে যে, আল কুরআনের ব্যাখ্যা হিসাবে এবং কুরআনের অতিরিক্ত বিধান-সংবলিত অনেক ওহি মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং তা মান্য করা মানব জাতির উপর আবশ্যক করে দিয়েছেন।

আহসানাল হাদীস : লাহওয়াল হাদীস

হাদীস শব্দের অর্থ কথা, বর্ণনা, আলোচনা, কথোপকথন, কাহিনি, সংবাদ, নতুন, আধুনিক ইত্যাদি। আল কুরআনে শব্দটি বিশেরও অধিক স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে :

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ.

> "আল্লাহ উত্তম কথা তথা বারবার পঠিত সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থ নাযিল করেছেন।"[২৩৭]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِيْ لَهْوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

২৩৭. সূরা [৩৯] যুমার, আয়াত : ২৩।

"একশ্রেণির লোক আছে যারা অনর্থক কথাবার্তা ক্রয় করে আল্লাহর রাস্তা থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য।"[২৩৮]

আয়াত দুটিতে 'হাদীস' শব্দের উল্লেখ আছে। এদিকে ইঙ্গিত করে হাদীস অস্বীকারকারী কোনো কোনো ব্যক্তি বলেন, আমরা কুরআনে দুই ধরনের হাদীসের কথা পাই। একটা (أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ) আহসানাল হাদীস, আরেকটি (لَهْوَ الْحَدِيْثِ) লাহওয়াল হাদীস। আহসানাল হাদীস বা উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব আল কুরআন, আর লাহওয়াল হাদীস বা অনর্থক কথা হচ্ছে বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য ইমাম কর্তৃক সংকলিত হাদীস।

এ ধরনের কথা শুধু ওই ব্যক্তির মুখ থেকেই বের হতে পারে, অনূদিত আর হরকত সংযুক্ত কুরআন পড়তে পারাই যার গবেষণার একমাত্র যোগ্যতা। এইসব ব্যক্তিবর্গের হয়তো জানা নেই যে, আল কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকেও হাদীস বলা হয়েছে। নবীজি উম্মাত-জননী হাফসা (রা.)-কে একটি গোপন কথা জানিয়ে গোপন রাখতে বলেন। কিন্তু তিনি অন্যকে বলে ফেলেন। বিষয়টি আল কুরআনে আলোচিত হয়েছে এবং সেখানে নবীজির কথাকে হাদীস শব্দে ব্যক্ত করে ইরশাদ হয়েছে :

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا.

"নবী যখন তাঁর জনৈক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বললেন।"[২৩৯]

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, সূরা আল ইমরানের ১৬৪ নং আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদের উপর তাঁর একটি অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে তিনি তাদের মাঝে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শোনান, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অর্থাৎ উম্মাতকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল প্রেরণ করা আল্লাহর একটি অনুগ্রহ। অন্য আয়াতে তিনি রাসূলকে তাঁর অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সে আয়াতে তিনি 'হাদীস' শব্দের ধাতুমূল থেকে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে বলেছেন :

---

২৩৮. সূরা [৩১] লুকমান, আয়াত : ০৬।

২৩৯. সূরা [৬৬] তাহরীম, আয়াত : ০৩।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.

"আর আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বর্ণনা করুন।"[২৪০]

আমরা আগেই জেনেছি, কথা, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিতাব ও হিকমতের যে শিক্ষা তাঁর উম্মাতকে দান করেছেন ইসলামের পরিভাষায় তাকেই হাদীস বা সুন্নাহ বলে। আল কুরআনের ভাষায় এটা মুমিনদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ। আমরা দেখতে পেলাম, নবীজি কর্তৃক এই অনুগ্রহের বর্ণনাকেও কুরআন মাজীদ হাদীস শব্দেই উল্লেখ করেছে।

কোনো মুমিনের কি এই দুঃসাহস হতে পারে যে, সে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাকে লাহওয়াল হাদীস বা অনর্থক কথা বলবে, বিশেষ করে যখন তা দীন-শরীআত সম্পর্কে হয়, যখন তা মহান আল্লাহ প্রেরিত পবিত্র ওহিরই একটি প্রকার?

যদি বলা হয়, কুরআন কারীমে কুরআন ও হাদীস উভয়কেই যদি হাদীস বলা হয়ে থাকে তবে আমরা শুধু হাদীসকেই কেন হাদীস বলে থাকি? এটা এত স্বাভাবিক বিষয় যে, এ নিয়ে আসলে কোনো প্রশ্ন হয় না। একটি শব্দের যদি আভিধানিক বা রূপকভাবে একাধিক অর্থে ব্যবহার থাকে, তবে তার ভেতর থেকে কোনো একটি বিশেষ অর্থে প্রসিদ্ধ হয়ে যাওয়া বা কোনো বিশেষ শাস্ত্রে কোনো বিশেষ অর্থে পরিভাষা হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া, যখন ওই শব্দটি সাধারণভাবে উচ্চারিত হলে মানুষ সাধারণত ওই বিশেষ অর্থটিই বুঝবে, এটা খুবই স্বাভাবিক।

যেমন 'সালাত' (صَلَاةٌ) শব্দটি আল কুরআনে দরূদ, দুআ, ইস্তিগফার, রহমত, উপাসনালয়, বান্দার প্রশংসা, কুরআন পাঠ, বিশেষ ইবাদত ইত্যাদি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২৪১] কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় বিশেষ ইবাদত নামায অর্থে শব্দটি এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, এখন সালাত উচ্চারণমাত্রই আমরা নামাযকেই বুঝি। জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে এটা খুবই স্বভাবিক ও সুপরিজ্ঞাত বিষয়। এ নিয়ে প্রশ্ন ওঠানো অবান্তর।

---

২৪০. সূরা [৯৩] দুহা, আয়াত : ১১।

২৪১. সূরা বাকারাহ, ৪৩, ১৫৩ ও ১৫৭; তাওবাহ, ১০৩; ইসরা', ১১০; হাজ্জ, ৪০; আহযাব, ৪৩ ও ৫৬; তাফসীর ইবন কাসীর, ৬/৪৩৬।

হাদীসের নামে অশ্লীল কিচ্ছা-কাহিনি

হাদীসের কিতাবে হাদীস নামে সংকলিত, এমনকি মুহাদ্দিসদের নিকট সহীহ হিসাবে স্বীকৃত অনেক বর্ণনা অশ্লীলতায় ভরপুর। এমন অশ্লীল কিচ্ছা-কাহিনি ওহি তো দূরের কথা, নবীজির নিজের বাণীও হতে পারে না—এ দাবি হাদীস অস্বীকারকারী অনেকের।

নারীদেহ ও নারী-পুরুষের যৌন ক্রিয়াকলাপের উন্মুক্ত প্রদর্শন ও রগরগে বিবরণকে অশ্লীলতা বলা হয়। তবে মানুষ মানেই যেমন নারী আর পুরুষ, তেমনি মানব সভ্যতা টিকিয়ে রাখার জন্য নারী-পুরুষের অবৈধ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনাচার বন্ধ করা এবং বৈধ ও নিয়ন্ত্রিত যৌনক্রিয়া অপরিহার্য। তাই নারীদেহ ও নারী-পুরুষের যৌনক্রিয়ার অবাধ প্রদর্শন ও রগরগে বর্ণনা যেমন বন্ধ করা দরকার তেমনি এ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় আলোচনা শালীনভাবে জারি রাখাও অতিশয় দরকারি। এ কথা মানুষ মাত্রেই বোঝে, এজন্য যুক্তিতর্ক উপস্থাপনের কোনো প্রয়োজন নেই।

শুধু হাদীস শরীফ কেন, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রিত আলোচনা স্বয়ং আল কুরআনেই বিদ্যমান। বেহেশতি হুরদের দেহকাঠমোর বর্ণনা, ঋতুমতী নারীর বিধানসহ এ বিষয়ক অনেক কথা আল কুরআনে আলোচিত হয়েছে।

হাদীস লিখতে নবীজির নিষেধাজ্ঞা

হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে দায়িত্ব ছিল, মানুষকে ধর্মীয় রীতিনীতি শিক্ষা দেওয়া সে শিক্ষা কুরআনেই আছে। কুরআনের বাইরের কোনো শিক্ষা যদি এর দ্বারা উদ্দেশ্য হতো তিনি নিজে সেসব লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিতেন অথবা সে মর্মে নির্দেশ দিতেন। এর কোনোটাই তিনি করেননি। উল্টো হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন। আর বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি সুন্নাহ অনুসরণের যে কথা বলেছেন সেখানেও এর অর্থ কুরআন অনুসরণ। কেননা তখন কুরআন ছাড়া হাদীস বা সুন্নাহ নামে কিছুই সংকলিত হয়নি।

সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি (রা.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لَا تَكْتُبُوْا عَنِّيْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوْا

عَنِّيْ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

তোমরা আমার থেকে লিখো না। যে আমার থেকে কুরআন ব্যতীত কিছু লিখেছে সে যেন তা মুছে ফেলে। তবে আমার থেকে মৌখিক বর্ণনা করবে, তাতে কোনো দোষ নেই। যে ব্যক্তি আমার নামে জেনেশুনে মিথ্যা বলবে সে যেন জাহান্নামে ঠিকানা খুঁজে নেয়।[২৪২]

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় রীতিনীতি ও কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দেওয়া। সে শিক্ষা কুরআনেই আছে—এমন দাবি কি সুস্থ মাথা থেকে বের হওয়া সম্ভব? তবে কি কুরআনের সকল ব্যাখ্যা কুরআনেই আছে? নবীজির সকল কাজের বিবরণও কুরআনে আছে? তিনি কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী সালাত আদায় করতেন। কিন্তু কীভাবে আদায় করতেন তার বিবরণ কুরআনের কোথায় আছে? শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বিভিন্নভাবে ছাত্রদেরকে টেক্সটবুক বুঝিয়ে থাকেন। শিক্ষকের সেই ব্যাখ্যা টেক্সটবুকেই আছে—এ দাবি কি কোনো পাগলেও করতে পারে?

কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনেই আছে। এ ভিন্ন নবীজির ব্যাখ্যার আলাদা কোনো অস্তিত্ব বা প্রয়োজন নেই। তাহলে এখন আমাদেরকে ধর্মীয় সকল বিধিবিধান ও কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন থেকে শিখে নিতে হবে। নবীজির যুগে নবী শিখে নিয়েছেন কুরআন থেকে। আমার যুগে আমি শিখে নিচ্ছি কুরআন থেকে। তাহলে কুরআন যে তাঁকে কুরআন ব্যাখ্যা করার বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছে, এ কথার অর্থ কী?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীস সংরক্ষণের উদ্যোগ নেননি বা নির্দেশ দেননি—এ কথাও সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসত্য। তিনি তাঁর সাহাবিদেরকে সর্বপ্রকারে সকল পদ্ধতিতে হাদীস সংরক্ষণ ও পরবর্তীদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার পুনঃপুন নির্দেশ প্রদান করেছেন। '*হাদীস সংরক্ষণে নবীজির নির্দেশনা*' শিরোনামের অধীনে আমরা সে বিষয়ক আলোচনা দেখে এসেছি।

তিনি ছিলেন জীবন্ত কুরআন, জীবন্ত ইসলাম। সাহাবিগণ জীবন দিয়ে তাঁর সুন্নাহ সংরক্ষণ করেছেন। ইসলাম পৃথিবীতে আসার পর থেকে প্রত্যেক প্রজন্মেই প্রচুর সংখ্যক এমন মানুষ তৈরি হয়েছে যারা ইসলামকে পরিপূর্ণ

২৪২. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৩০০৪।

জীবনবিধান হিসাবে বিশ্বাস করেছেন, ইসলামে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন এবং পুরোটা জীবনে পরিপূর্ণভাবে ইসলাম প্রতিপালন করেছেন। আল কুরআনের বিমূর্ত বাণীর ইসলাম তাদের মানতে হয়েছে বিকল্পহীনভাবে মূর্তিমান ইসলাম নবী-জীবনের অনুসরণ-অনুকরণে। এটা প্রত্যেক প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শিখে নিয়েছে। নবীর সুন্নাহ তাই অবিকৃত ও পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত ও ট্রান্সফার হয়ে এসেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। এ ধরনের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করার বিষয়টি নিতান্তই গৌণ মাধ্যম।

তাছাড়া তিনি লেখার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণেরও বিশেষভাবে নির্দেশ, নির্দেশনা, উৎসাহ ও অনুমতি প্রদান করেছেন। এবং সাহাবিগণ অনেকেই লেখার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণ করতেন এ বিষয়টিও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত। তবে আমরা এখানে উল্লেখিত হাদীসে লেখার নিষেধাজ্ঞা দেখতে পাচ্ছি। নিষেধাজ্ঞা ও নির্দেশ-অনুমোদন উভয়ই যখন প্রমাণিত তখন একটিকে গ্রহণ করে অন্যটিকে বিনা প্রমাণে বাতিল করে দেওয়া যৌক্তিক নয়। বরং দুটি বর্ণনাই সত্য এবং ব্যক্তি ও অবস্থাভেদে প্রযোজ্য।

হাদীস লিপিবদ্ধকরণে নিষেধাজ্ঞা কুরআন নাযিলের প্রথম দিকের বিষয় হতে পারে। এখনকার মতো তখন কাগজ এমন সহজলভ্য ছিল না যে, কুরআনের জন্য একটা খাতা খোলা হলো, যখনই জিবরীল (আ.) কোনো আয়াত নিয়ে আসবেন ওই খাতায় লিখে রাখা হবে। বরং পাথরের ফলক, খেজুরের ডাল, পশুর চামড়া ও হাড়, বাঁশের টুকরা ও গাছের পাতা ইত্যাদিতে পৃথক পৃথকভাবে লিখে রাখা হতো। এমতাবস্থায় হাদীসও লিখে রাখলে কুরআন-হাদীস মিশে যাওয়ার আশঙ্কা থাকত।

কুরআনের যদিও ব্যতিক্রমী নিজস্ব অতি উচ্চাঙ্গের ভাষাভঙ্গি আছে, কিন্তু তখন কুরআন নাযিলের প্রথম যুগ, তখনও পাঠকের কাছে তার ভাষাভঙ্গি সুস্পষ্ট হয়নি। ভাষা-সাহিত্যের প্রথম দিকের ছাত্র তার ভাষার সেরা কবি-সাহিত্যিকদের লেখাও নাম না দেখে আলাদা করতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘদিনের পাঠপরিক্রমায় তার এমন সূক্ষ্ম রুচি তৈরি হয় যে, যে কারো রচনা পাঠ করেই বলে দিতে পারে, এটি অমুকের রচনা।

এসব কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে হাদীস

লিখতে নিষেধ করলেও পরবর্তীকালে অনুমতি ও নির্দেশ প্রদান করেন।[২৪৩] এমনকি তাঁর সরাসরি নির্দেশে হাদীসের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লিখিত হয়। এবং অনেক সাহাবি অনুমোদন পেয়ে নিজেদের মতো করে হাদীস লিখে রাখতেন। দুইশত-তিনশত বছর পরে এসে ইমাম বুখারি-মুসলিমদের হতে হাদীস লিখিত হয়েছে, তা নয়। সাহাবি, তাবিয়ি, তাবি'-তাবিয়ি থেকে শুরু করে প্রত্যেক প্রজন্মের মুহাদ্দিসগণ পর্যপ্ত পরিমাণ হাদীস লিখে রাখতেন। তাদের ছাত্ররা তাদের মৌখিক বর্ণনা ও পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে হাদীস গ্রহণ করতেন। তবে যুগ-বাস্তবতার কারণে তাদের সে সকল পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত হয়নি। যারা মনে করেন, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে এসে হাদীস লিখিত হয়েছে তারা মূলত হাদীস সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ।

হাদীস, যা মূলত জীবনের প্রতিপলে? কর্মগত চর্চার বিষয়, শুধু তত্ত্বীয় বা চিন্তাগত চর্চার বিষয় নয়, যা প্রত্যেক প্রজন্মের পর্যাপ্ত মানুষ জীবনের একমাত্র কর্ম মনে করে আমল, আলোচনা ও মুখস্থকরণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন, তার প্রত্যেকটি শব্দ লিখে রাখা কি সংরক্ষিত হওয়ার জন্য অপরিহার্য?

আর এ দাবিও বড়ই হাস্যকর যে, তখন যেহেতু হাদীস লিখিত হয়নি, সুতরাং হাদীস-সুন্নাহ অস্তিত্বহীন, তাই তখন সুন্নাহর অনুসরণ করতে বলা মানে কুরআনের অনুসরণ করতে বলা। কারণ তখন সকল হাদীস যদিও লেখা হয়নি তবে হাদীস পূর্ণাঙ্গরূপে সাহাবিদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে ও সমাজে অঙ্কিত ছিল। তাঁদের হৃদয়, মস্তিষ্ক ও সমাজ তো ছিল হাদীসের আলোয় পরিপূর্ণ আলোকিত, বরং হাদীসের আলোকেই বিনির্মিত। তাঁদের সুন্নাহ অনুসরণের জন্য তা কাগজের পাতায় লিখিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল না। বরং এটা তো তাঁদের নিকট দূষণীয় বলে গণ্য হওয়ার কথা।

যে হাদীসে নবীজি হাদীস লিখতে নিষেধ করেছেন সে হাদীসে কি তিনি হাদীস সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন? খেয়াল করে দেখুন, তিনি ওই হাদীসে বলেছেন, 'আমার হাদীস বর্ণনা করো, মিথ্যা মিশ্রিত কোরো না'। অর্থাৎ বিশেষ কারণে যদিও এখন হাদীস লেখা যাচ্ছে না। তবে তোমরা

---

২৪৩. মুস্তফা সিবায়ি, আস সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীয়িল ইসলামি, পৃ. ৬১; তাকি উসমানি, হাদীসের প্রামাণ্যতা, পৃ. ১১১-১১২।

মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে হাদীস সংরক্ষণের কথা ভুলে যেয়ো না। এবং মনে রাখবে, আমার হাদীস অবিকৃতভাবে সংরক্ষণ করবে। তার সাথে অন্য কিছু মিশ্রিত করবে না। কেননা আমার কথা অন্যের কথার মতো মামুলি নয়, তাই

إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ.

আমার নামে মিথ্যা বলা অন্যের নামে মিথ্যা বলার মতো নয়।[২৪৪]

হাদীস কি যথাযথভাবে সংরক্ষিত হয়েছে

যখন প্রমাণিত হলো যে, হাদীসও মহান আল্লাহর প্রেরিত ওহি, আর ওহি মানতে যেহেতু আমরা বাধ্য, সুতরাং হাদীস মানতেও বাধ্য, তখন তারা হাদীস সংরক্ষণের যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায়। হাদীস সংরক্ষণের যথার্থতার উপর বিভিন্ন আপত্তি উঠিয়ে তারা বলতে চায় যে, হাদীস ওহি, এ কারণে আমরা তা মানতে যদিও বাধ্য, তবে নানান ঐতিহাসিক ও পারিপার্শ্বিক জটিলতার কারণে যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল হাদীস সংরক্ষিত হতে পারেনি, তেমনি হাদীসের সাথে অন্য কথাও এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেসব থেকে বিশুদ্ধ নবী-বাণী বের করে আনা দুরূহ ব্যাপার—বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য। আর আল্লাহ তো কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না। তাহলে সর্বসাধারণের জন্য হাদীস মান্য করা কীভাবে আবশ্যক হতে পারে? আল কুরআনের ইরশাদ :

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

"আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না।"[২৪৫]

তাদের এ দাবি মূলত দুটি গলত বুঝ থেকে উদ্গিরিত। প্রথমত, আল্লাহর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথার্থ নয়। কেননা কোনো মুমিন এ বিশ্বাস করতে পারে না যে, আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত যে বিধান মান্য করা

---

২৪৪. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৮১৪০; সহীহ বুখারি, হাদীস : ১২৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ০৪; মুসনাদ বাযযার, হাদীস : ১২৭৬।

২৪৫. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ২৮৬। আরো দেখুন : সূরা বাকারাহ, ২৩৩; সূরা আনআম, ১৫২; সূরা আ'রাফ, ৪২; সূরা মু'মিনূন, ৬২।

আবশ্যক করেছেন তা পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষিত হয়ে তাদের মানার উপযুক্ত ভাবে পৃথিবীতে থাকবে না; বরং হারিয়ে যাবে বা এমন জটিল হয়ে যাবে যে, মানুষের জন্য তা মান্য করা অসম্ভব হয়ে যাবে। বরং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের মৌলিক দাবি তো এই যে, তিনি যে ওহি মান্য করা আবশ্যক করেছেন কিয়ামত পর্যন্ত তা যথাযথভাবে সংরক্ষিত থাকবে বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা। এটা তো উপরে উল্লেখিত আয়াতটি থেকেই বোঝা যায়।

তবে এ কথা সত্য যে, হাদীস সংগ্রহ ও সংকলন কুরআন সংকলনের চেয়ে জটিল ও কঠিন ছিল। এবং এ কথাও সত্য যে, হাদীসের নামে সমাজে অনেক ভুল ও মিথ্যা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুসলিম উম্মাহর মুহাদ্দিস আলিমগণ হাদীস সংগ্রহে এমন কষ্ট-মুজাহাদা ও চেষ্টা-তদবীর করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে প্রচারিত মিথ্যা ও ভুল কথা থেকে বিশুদ্ধ হাদীসকে পৃথক করার জন্য এমন যৌক্তিক, প্রায়োগিক, বৈজ্ঞানিক ও সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন যে, তাতে তারা তাঁর সকল হাদীস সংগ্রহ করতে এবং সত্যকে মিথ্যা থেকে বের করে এনে উম্মাতের সামনে নির্ভেজালরূপে পেশ করতে পরিপূর্ণভাবে সফল হয়েছেন। এ কাজে তাদের ব্যবহৃত ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি এমন সফল, একক ও অনন্য যে, পৃথিবীর ইতিহাস অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠী থেকে এর কোনো দ্বিতীয় নজির আনতে সক্ষম হয়নি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রাহ.)-কে বলা হলো, নবীজির নামে কত জাল মিথ্যা হাদীস ছড়িয়ে পড়েছে! এগুলো কীভাবে চিহ্নিত হবে? তিনি জবাবে বললেন, প্রত্যেক যুগেই এই হাদীসগুলো চিহ্নিত করার জন্য প্রাজ্ঞ হাদীস বিশারদ থাকবেন।[২৪৬]

একবার হারুনুর রশীদ এক যিন্দিককে পাকড়াও করে হত্যার আদেশ দিলেন। তখন ওই যিন্দিক বলল, আমাকে কেন হত্যার আদেশ দিলেন? তিনি বললেন, তোমার অনিষ্ট থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য। তখন সে বলল, আমি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে হাজার হাজার জাল হাদীস ছড়িয়ে দিয়েছি সেগুলো থেকে কীভাবে মানুষকে মুক্তি দেবেন? হারুনুর রশীদ বললেন, আল্লাহর দুশমন, তোমার কি আবু ইসহাক ফাযারি

---

২৪৬. ইবন আদি, আল কামিল : ১/১০৩।

আর আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কথা জানা নেই? তারা দুইজনে তোমার বানানো প্রত্যেকটা জাল হাদীস একটা একটা করে চিহ্নিত করবেন।[২৪৭]

ইবন মায়ীন (রাহ.) মারা যাওয়ার পর তার মৃতদেহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাটলিতে বহন করা হয়। মানুষ বলতে থাকে, এই সেই মহান ব্যক্তি যিনি সারা জীবন নবীজির নামে বানানো সকল জাল ও মিথ্যা কথার অপনোদন করেছেন।[২৪৮]

ইবন খুযাইমা (রাহ.) বলেছেন, আবু হামিদ শারকি যতদিন জীবিত আছেন ততদিন কারো পক্ষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা বলে পার পাওয়া সম্ভব হবে না।

ইরাকে যখন অনেক জাল হাদীস ছড়িয়ে পড়ল তখন দারাকুতনি (রাহ.) বললেন, হে বাগদাদবাসী, আপনারা এই ধারণা করবেন না, আমি জীবত থাকতে কেউ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা বলে ধরা পড়বে না।[২৪৯]

খতীব বাগদাদি (রাহ.) মারা যাওয়ার পর তাকে দাফনের জন্য যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন একদল মানুষ চিৎকার বলছিল, এই সেই ব্যক্তি যিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বানানো জাল হাদীস চিহ্নিত করতেন। এই সেই ব্যক্তি যিনি নবীজির হাদীস সংরক্ষণ করতেন।[২৫০]

তবে সাধারণের জন্য হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের এই কাজটি কেবল কঠিন বা দুরূহই নয়; বরং অসম্ভবই বলতে হবে। কিন্তু এ দুরূহ দায়িত্ব তো আল্লাহ তাদের দেননি; বরং তিনি তাঁর দীনের সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য প্রত্যেক কালপর্বে দক্ষ যোগ্য আলিম পাঠান। তারা দীনকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন, দীনের ভেতরে ঢুকে যাওয়া ভুলভ্রান্তির সংস্কার করেন এবং দীনকে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সমাজে তুলে ধরেন। এসব জটিল ক্ষেত্রে সাধারণের কর্তব্য হলো, যোগ্য নির্ভরযোগ্য আলিমের শরণাপন্ন হওয়া।

হাদীস শরীফে এসেছে :

---

২৪৭. তারীখ দিমাশক : ৭/১২৭।

২৪৮. ইবন হিব্বান, সিকাত : ৯/২৬৩।

২৪৯. ইবনুল জাওযি, মাওযূআত : ১/৪৫-৪৬

২৫০. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ১৮/২৮৬।

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا.

আল্লাহ এই উম্মাতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রারম্ভে সংস্কারক পাঠান। যিনি তাদের জন্য দীনকে সংস্কার করেন।[২৫১] কুরআন-হাদীসে এ বিষয়ে আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে।

তবে হাদীসের বিশুদ্ধতা ও মান্য করার সম্ভাব্যতা নিয়ে হাদীস অস্বীকারকারীদের এ সকল প্রশ্ন উঠানোর মূল উদ্দীপক হচ্ছে, মুহাদ্দিসদের হাদীস সংগ্রহ, সংকলন ও নির্ভেজালভাবে তা সংরক্ষণের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও এক্ষেত্রে তাদের সফলতা অনুধাবনে ব্যর্থতা। শরীআত প্রতিপালনের মূলনীতি সম্পর্কেও তাদের অজ্ঞতা সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা আমরা উপরে করে এসেছি। পাঠক, তবে বিষয়টি যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে এ শাস্ত্রের কিতাবাদি শাস্ত্রজ্ঞ আলিমের তত্ত্বাবধানে যথারীতি অধ্যয়ন করতে হবে।

সত্যের সাথে যখন মিথ্যা মিশে যায়

হাদীসের নামে অনেক ভুল ও মিথ্যা কথা সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে। তা যেমন মানুষের মুখে আছে, তেমনই কিতাবের পাতায়ও সংকলিত হয়েছে এবং এই মিশ্রণ থেকে ভুল ও সঠিক যাচাই-বাছাইয়ে অনেক ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মধ্যেও মতভিন্নতা তৈরি হয়েছে। এ বিষয়টিকে অনেকে হাদীস অগ্রহণযোগ্য হওয়ার যুক্তি ও দলীল হিসাবে পেশ করেন। তারা এ কথাও বলেন যে, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে যখন ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে যায় তখন আর তা বিশ্বাস ও প্রমাণের যোগ্য থাকে না। এ কথা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী হিসাবেও বর্ণিত রয়েছে। যেমন বাইবেল ও আহলে কিতাবের বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

إِذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلَا تُصَدِّقُوْهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا: آمَنَّا بِاللهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوْهُمْ.

২৫১. সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৪২৯১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৮৫৯২; বাইহাকি, মা'রিফাতুস সুনান : ১/২০৮। হাদীসটিকে আল্লামা ইরাকি (ফায়যুল খাতির : ২/২৮২) ইবন হাজার (তাওয়ালিত তা'সীস, পৃ. ৪৯), সাখাবি (আল মাকাসিদুল হাসানাহ : ২৩৮), ইবনুদ দাইবা' রহ. (তামঈযুত তয়্যিব, পৃ. ৩৮)-সহ আরো অনেকে প্রমাণিত বলেছেন।

আহলে কিতাব তোমাদের কাছে কিছু বর্ণনা করলে তোমরা তাদেরকে সত্যায়নও করবে না মিথ্যাও বলবে না; বরং বলবে, আমরা আল্লাহ, তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। এতে তাদের বক্তব্য সঠিক হয়ে থাকলে তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলো না, আবার মিথ্যা হয়ে থাকলে সত্যায়নও করা হলো না।[২৫২]

আমরা বলি, এই বিষয়টিই বরং হাদীস শরীআতের দলীল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। হাদীস যদি শরীআতের দলীলই না হতো এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থায় তা কোনো গুরুত্বই বহন না করত, তাহলে হাদীস জাল করে লাভ কী? যার কোনো মূল্য নেই, গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা নেই তা কি কেউ নকল করে? আজকে আমাদের এই কালে কেবল নয়; বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের কিছুকাল পর থেকেই বিভিন্ন বিভ্রান্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠী তাদের মত ও মতাদর্শ প্রমাণের জন্য জাল হাদীস তৈরি করা শুরু করে।

খারিজি মতবাদের এক প্রবক্তা, যিনি তাওবা করে হক পথে ফিরে আসেন, তার থেকে আব্দুল্লাহ ইবন লাহীআহ বর্ণনা করেছেন, সত্যে ফিরে আসার পর তিনি বলতেন :

إِنَّ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا إِذَا هَوِيْنَا أَمْرًا صَيَّرْنَاهُ حَدِيْثًا.

নবীজির এই সকল হাদীস দীন। সুতরাং কার কাছ থেকে তোমরা দীন গ্রহণ করছ তা যাচাই করবে। কেননা কোনো বিষয় যখন আমাদের মনঃপূত হতো আমরা সে বিষয়ে হাদীস বানিয়ে নিতাম।[২৫৩]

এ ব্যক্তির বক্তব্যে পরিষ্কার বিবৃত হয়েছে, বিভ্রান্ত ব্যক্তি-গোষ্ঠীও হাদীসকে দীনের দলীল মনে করত এবং এ দলীল দ্বারা নিজেদের মত ও মতাদর্শ প্রমাণ করার জন্যই তারা হাদীস বানাত। আর সমাজেও হাদীস শরীআতের

---

২৫২. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৭২২৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩৬৪৪; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ৬২৫৭; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস : ১০১৬০।

২৫৩. ইবন আদি, আল কামিল : ১/১৫১; ইবনুল জাওযি, আল মাওযূআত, ১/৩৯; খতীব বাগদাদি, আল জামি' লি-আখলাকির রাবি, ১/১৩৭; আল কিফায়াহ, পৃ. ১২৩। বিস্তারিত জানতে দেখুন : ড. ইবরাহীম ইবন সালিহ আল আজলান, আল মুহাদ্দিসূনা ওয়াস সিয়াসা, পৃ. ২৯২-৩০০।

দলীল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস ছিল। নইলে নিজেদের মত প্রতিষ্ঠার জন্য তারা হাদীস জাল করত না। (আর তাদের জালিয়াতি থেকে বাঁচার উপায় তিনি বলেছেন, হাদীসের সনদ যাচাই করা। দুর্নীতিকারী নিশ্চয় সম্যকরূপে জানে তার দুর্নীতি ধরার রাস্তা কী? সুতরাং এ থেকেও বোঝা যায়, হাদীস সত্যায়নে সনদ যাচাইকে অযৌক্তিক বলা পুরোটাই অযৌক্তিক। এ বিষয়ক আলোচনা পরে আসছে, ইনশাআল্লাহ)।

উপরের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো, ইসলামের সূচনাকাল থেকেই মুসলিম উম্মাহর নিকট হাদীসে রাসূলের আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এবং এটাও প্রমাণিত হয় যে, হাদীসকে শরীআতের দলীল হিসাবে মানতে অস্বীকার করা একটি বিচ্ছিন্ন মত—যা সম্মিলিত মুসলিম উম্মাহর গৃহীত পথের বিপরীত পথ। আর যারা মুমিনদের সম্মিলিত পথ পরিত্যাগ করে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে তাদেরকে সতর্ক করে এবং কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا.

"যে ব্যক্তি তার নিকট হিদায়াত স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনদের গৃহীত পথ ভিন্ন অন্য পথ অবলম্বন করবে তাকে আমি তার অবলম্বিত পথেই ছেড়ে দেব, আর তাকে নিক্ষেপ করব জাহান্নামে; তা কতই-না নিকৃষ্ট গন্তব্য!"[২৫৪]

আর তাদের এ দাবিও সঠিক নয় যে, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে হাদীসের ভান্ডার ধোঁয়াশাপূর্ণ হয়ে গেছে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, মুহাদ্দিস ইমামগণ কী অক্লান্ত পরিশ্রম করে সকল হাদীস সংগ্রহ করেছেন এবং যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাল কথা থেকে বিশুদ্ধ নবী-বাণীকে পৃথক ও পরিশুদ্ধ করেছেন। আর এক্ষেত্রে সাধারণের কর্তব্য কী তাও আমরা আলোচনা করেছি।

মুহাদ্দিসদের এই কর্মযোগ—হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, প্রচলিত জাল কথা থেকে বিশুদ্ধ নবী-বাণীকে পৃথক্করণে প্রাণান্ত পরিশ্রম—ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই চলমান। এ বিষয়টিও তাই এ কথা প্রমাণ করে যে, ইসলামের

২৫৪. সূরা [৪] নিসা, আয়াত : ১১৫।

সূচনাকাল থেকে মুসলিম উম্মাহর আলিমদের নিকটও হাদীসে রাসূলের আইনগত মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ কারণেই তো তারা ভুল, মিথ্যা ও জাল কথা থেকে বিশুদ্ধ নবী-বাণী পৃথক করতে প্রাণান্ত মেহনত করেছেন। যদিও মানবিক দুর্বলতার কারণে (অন্যান্য শাস্ত্রের মতো) কিছু বিষয়ে তারা মত-পার্থক্যের শিকার হয়েছেন। নইলে অপ্রয়োজনীয় জিনিস হারিয়ে যাক আর তার সাথে ভুলভাল মিশে ব্যবহার-অযোগ্য হয়ে যাক, তার পেছনে পণ্ডশ্রম করে কেন তারা জীবন ক্ষয় করবেন? সুতরাং এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের মতভেদও হাদীস শরীআতের দলীল হওয়ার অন্যতম প্রমাণ।

যারা ইসরায়ীলিয়্যাত বা বাইবেল সংকলন-সংরক্ষণের ইতিহাস এবং হাদীস সংকলন-সংরক্ষণের ইতিহাস পাঠ করেছেন তারা জানেন, উভয় বিষয়ের ঐতিহাসিক মর্যাদার মাঝে কী আকাশ-পাতাল পার্থক্য। বাইবেল নামে সংকলিত পুস্তকগুলোর যেমন কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, তেমনি তার মাঝে সংকলিত বাণী-সমষ্টির কোন অংশ সঠিক আর কোন অংশ বাতিল তা নির্ণয়ের কোনো যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক ও বাস্তবসম্মত নীতিমালা নেই। শত শত বছর পর তারা সমাজে প্রচলিত কথা-কাহিনির সমাহারকে নির্বিচারে সংকলন করেছেন আর নিজেদের রুচি-পছন্দ অনুযায়ী ভুল-সঠিক বলে রায় দিয়েছেন। পক্ষান্তরে হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে যেমন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মানা হয়েছে তেমনি তাকে মিশে যাওয়া খাদ থেকে মুক্ত করার জন্য অতি সূক্ষ্ম বিচারিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। যা পৃথিবীর জন্য, পৃথিবীর সকল দেশ-কালের জন্য অতিশয় বিস্ময়। বাস্তববোধসম্পন্ন জ্ঞানীমাত্রই এমনকি কোনো কোনো অমুসলিম পণ্ডিতও মুক্তকণ্ঠে যে পদ্ধতির সফলতার স্বীকৃতি দিয়েছেন।[২৫৫]

হাদীসশাস্ত্র অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মানে পরীক্ষিত-প্রমাণিত পদ্ধতি—যা দেশ, জাতি, ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রের এই গ্রহণযোগ্যতা নেই। ইসলামের ভেতরে এবং বাইরে হাদীসশাস্ত্রের মতো আরেকটি শাস্ত্রের উদাহরণ নেই। অতীত বা সমসাময়িক কালের

---

২৫৫. বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পড়ুন: আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবি রচিত 'ইযহারুল হক', ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রচিত 'পবিত্র বাইবেল : পরিচিতি ও পর্যালোচনা' এবং মুফতি তাকি উসমানি রচিত 'খৃষ্টধর্মের স্বরূপ'।

কোনো ঘটনা বা বক্তব্যের সত্যতা নির্ণয়ে হাদীসশাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসরণের উদাহরণ পশ্চিমা বিশ্ব তো দূরের কথা মুসলিম বিশ্বেও নেই।

হাদীস সত্যায়িত হয় বর্ণনাকারীদের সত্যায়নের মাধ্যমে। কিন্তু বর্ণনাকারীদের সততা ও সত্যবাদিতার ভিত্তিতে কোনো সংবাদ সত্যায়নের এ পদ্ধতি পৃথিবীতে নজিরবিহীন। তাছাড়া কোনো ব্যক্তির জন্য অন্য কোনো ব্যক্তির সততা ও সত্যবাদিতার শতভাগ নিশ্চয়তা দেওয়া কি সম্ভব, সে ব্যক্তি যতই নিকটতম হোক? উপরন্তু সেই ব্যক্তি যদি হয় শত বছর বা হাজার বছর আগের ভিন্ন দেশ, জাতি, ভাষা, সভ্যতার মানুষ? হাদীসশাস্ত্রের ইমামদের এই কাজটিই করতে হয়। তারা শত শত বছর আগের বর্ণনাকারীদের চারিত্রিক সনদ দেন এবং তার ভিত্তিতে হাদীসের মান নির্ধারণ করেন। যেমন ইমাম বুখারি (রাহ.) তাঁর তারীখ গ্রন্থে হাজার হাজার হাদীস বর্ণনাকারী রাবির জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং তাদের চারিত্রিক সনদ দিয়েছেন। এটি একেবারেই অযৌক্তিক ও অসম্ভব বিষয়। উপরন্তু হাদীসশাস্ত্রের ইমাম হিসাবে খ্যাত এইসব ব্যক্তিবর্গ কেউ আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক অনুমোদিত নন। তাহলে তাদের প্রত্যয়নপত্রের কী মূল্য আছে? কোনো কোনো হাদীস অস্বীকারকারী এসব দাবি করে থাকেন।

কোনো শাস্ত্রকে বৈজ্ঞানিক হতে হলে সর্বজন গ্রহণযোগ্য হতে হবে—এ দাবিটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান মানে বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞান নিজ উপযুক্ততায় বিজ্ঞান। কারো কাছে গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। তবে হাদীসশাস্ত্র অবশ্যই পরীক্ষিত, প্রমাণিত ও স্বীকৃত। অল্প কিছু অজ্ঞ বিভ্রান্ত লোক ছাড়া মুসলিম বিশ্বের সকল পণ্ডিত গবেষক, এমনকি অমুসলিম পণ্ডিত পর্যন্ত এ শাস্ত্রের অনন্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। শত শত বছর ধরে হাজার হাজার গবেষকের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তার যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। ইসলাম সমালোচক প্রাচ্যবিদ স্প্রেঙ্গার বলেছেন :

'There is no nation nor has there been any which like them (Muslims) has during twelve centuries, recorded the life of every man of letters. If the biographical records of Mussalman were collected we should probably have accounts, of a half million distinguished persons, and it would be found that

there is not a decennium of their history, nor a place of importance which has not its representatives.'

(মুসলিমদের মহাকীর্তি তাদের এই জীবনীশাস্ত্র)। অতীতে ও বর্তমানে এমন কোনো সম্প্রদায় নেই যারা মুসলিমদের মতো বারোটি শতাব্দী যাবৎ প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জীবনী লিপিবদ্ধ করেছে। যদি মুসলিমদের রচিত জীবনচরিত গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করা হয়, আমরা খুব সম্ভব অর্ধ মিলিয়ন কৃতীপুরুষের জীবনী লাভ করব। এবং দেখা যাবে এমন একটা দশকও নেই, এমন একটা স্থানও নেই যা নিজের কৃতীপুরুষের জন্ম দেয়নি।[২৫৬]

হাদীসশাস্ত্র মানব সভ্যতায় অনন্য ও বে-নজির বিষয়। অনন্য, অপূর্ব, অনুপম, অতুলনীয়, অদ্বিতীয়—এ শব্দগুলো পৃথিবীর সকল ভাষায় ইতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে যে নেতিবাচকভাবে দেখে তার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। হাদীসশাস্ত্রের মতো পরীক্ষিত, প্রমাণিত ও স্বীকৃত অদ্বিতীয় একটি শাস্ত্র মুসলিমদের হাতে গড়ে উঠেছে, এটা ইসলাম সংরক্ষণে মহান আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনার অংশ, মুসলিম জাতির জন্য গর্ব ও শুকরিয়ার বিষয়। মুসলিম নামধারী কেউ যদি এমনতর বিষয়কে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করেন অন্যরা তাকে 'ঘরের শত্রু বিভীষণ' ভাবতেই পারেন।

ইসলামপূর্ব ধর্মগুলো ছিল নির্দিষ্ট দেশকালের জন্য। মহান আল্লাহ তাই সেগুলো সংরক্ষণের দায়িত্ব নেননি। কিন্তু ইসলাম সর্বশেষ দীন। মহান আল্লাহ একে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন এবং এ কাজে যথাযথ পার্থিব ম্যাকানিজমও ব্যবহার করেছেন। যা অপূর্ব অভাবনীয়। মানব সভ্যতার আর কোনো অংশ সংরক্ষণের জন্য এর ধারেকাছের ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। হাদীসশাস্ত্রীয় মূলনীতি প্রয়োগ করে যদি বিশ্ব-ইতিহাসের অন্য কোনো পর্বের তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়, লোম বাছতে কম্বল উজাড় হয়ে যাবে।

আধুনিক ইতিহাসতত্ত্ব অবশ্য হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি অনেকখানি গ্রহণ করেছে।[২৫৭] কিন্তু পুরোপুরি নিতে পারেনি। নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা ইতিহাস তো ষোলো আনা সতর্কতার সাথে সংরক্ষণই করা হয়নি। এখন

---

২৫৬. [Sprenger, A Biographical Dictionary of Persons Who knew Muhammad, vol.1, p.1.]
২৫৭. বিস্তারিত দেখুন : আসাদ রুস্তম, মুস্তালাহুত তারীখ।

হাদীসশাস্ত্রীয় নীতিমালায় সত্যায়ন করতে গেলে তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এবং এজন্যই ইতিহাস কখনো হাদীসের মানে উত্তীর্ণ হতে পারবে না।

পরবর্তী কোনো জাতিগোষ্ঠীর জন্যও তাদের ইতিহাস ও দলনেতার বক্তব্য হাদীসশাস্ত্রের নমুনায় পরিপূর্ণ সংরক্ষণ ও নিখুঁতভাবে সত্যায়ন করা সম্ভব নয়। আর সেটা প্রয়োজনীয়ও নয়। কেননা মহান আল্লাহ ইসলাম সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তাঁর কুদরতি তত্ত্বাবধানে হাদীস সংরক্ষিত হয়েছে। এর জন্য সকল ব্যবস্থা তিনি কুদরতি ইশারায় করেছেন। প্রত্যেক প্রজন্মের অসংখ্য মরদে কামিল এর জন্য জান কুরবান করেছে। এর নজির মানব সভ্যতার জন্য আনয়ন করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে!

আমাদের নবীর পর আর কোনো নবী আসবে না। পরবর্তী কোনো জাতিগোষ্ঠীর নেতা, তিনি যত প্রভাবশালী আর গ্রহণীয়ই হোন না কেন, পরবর্তীদের জন্য তার জীবনাদর্শ ও কথাকর্ম মেনে চলা আবশ্যক নয়। তাই তার অনুসারীদের জন্য তার সকল কথাকর্ম সংরক্ষণ করা আবশ্যক নয়, উপকারীও নয়; বরং পণ্ডশ্রম। তাই আর কারো আদর্শ নিখুঁতভাবে সংরক্ষণের জন্য হাদীসশাস্ত্রীয় কঠোর সূক্ষ্ম মূলনীতি মেনে প্রাণান্ত মেহনত করা হবে না। হাদীসশাস্ত্র তাই কিয়ামত পর্যন্ত অনন্য, অনুপম, অতুলনীয় ও অদ্বিতীয় হয়ে থাকবে।

বর্ণনাকারীর মূল্যায়নের মাধ্যমে সংবাদ গ্রহণ-বর্জন নজিরবিহীন নয়, বরং মানব সমাজের ঈড়সসড়হ চর্চা। ধরুন, আপনারা পাঁচজন বন্ধু বসে আছেন। আপনাদের ষষ্ঠ বন্ধু এল। যার চরিত্র নড়বড়ে, বানিয়ে কথা বলে, সত্য-মিথ্যার পরোয়া করে না। সে এসে একটি সংবাদ দিল। নিশ্চয় আপনারা তার সংবাদ বিশ্বাস করবেন না। তা নিয়ে হাসাহাসি করবেন, বলবেন, 'দূর, ও কী বলে না বলে!' কিছুক্ষণ পর আপনাদের সপ্তম বন্ধু এল। মজবুত চরিত্রের অধিকারী। সততা ও সত্যবাদিতায় আপনাদের সকলের মাঝে প্রসিদ্ধ। আপনারা কখনোই তাকে মিথ্যা বলতে শোনেননি। তার দেওয়া সংবাদ নিয়ে কি হাসাহাসি করবেন? 'দূর, ও কী বলে না বলে' বলে কি উড়িয়ে দেবেন? না, তা করবেন না। জি, এটাই মানব সভ্যতার চিরন্তন প্রবণতা। ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতার উপর ভিত্তি করেই তার দেওয়া সংবাদ গ্রহণযোগ্যতা পায়।

আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

> "হে মুমিনগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে না অজ্ঞতাবশত কোনো সম্প্রদায়কে কষ্ট দিয়ে ফেলো; তাতে নিজেদের কর্ম নিয়ে তোমরা লজ্জিত হবে।"[২৫৮]

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সংবাদ গ্রহণ ও বর্জনের মূল ভিত্তি সংবাদদাতার অবস্থা। সংবাদদাতা ফাসিক হলে তার দেওয়া সংবাদ গ্রহণ করা যাবে না। অন্য মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। আর সংবাদদাতা ফাসিক না হলে তার সংবাদ গৃহীত হবে।

কুরআনে বর্ণিত এ মূলনীতির ভিত্তিতেই প্রত্যেক যুগের মুহাদ্দিস আলিমগণ স্বীয় যুগের হাদীস বর্ণনাকারী রাবিদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করেছেন এবং পরবর্তীদের জন্য সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেছেন—যেমন তারা হাদীস সংরক্ষণ ও বর্ণনা করেছেন। হাদীস ও হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা একই সাথে একইভাবে পরবর্তীদের নিকট ট্রান্সফার হয়েছে। সংকলক ইমামগণ নতুন করে গবেষণা করে এ সকল তথ্য উদ্ধার করেছেন তা নয়। এ ধারণা ভুল যে, শত শত বছর পর হাদীস যখন সংকলিত হলো এবং তারপর তা যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন দেখা দিল তখন মুহাদ্দিস ইমামগণ বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত অবস্থা অনুসন্ধানে মাঠে নামলেন, কিন্তু তত দিনে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, শত শত বছর আগের তথ্যাবলি কালের সাথে সাথে কালের হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে, সুতরাং এখন যা বলা হবে সবই ধারণা-অনুমান।

বরং বাস্তবতা হলো, সংকলক ইমামগণ হাদীসের মতো বর্ণনাকারীদের জীবনীও সূত্রের মাধ্যমে পেয়েছেন। ইমাম বুখারি (রাহ.)-ও তাঁর তারীখের কিতাবে যে সকল রাবির জীবনী উল্লেখ করেছেন এবং তাদের সম্পর্কে যে চারিত্রিক সনদ দিয়েছেন তা নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছেন। এ সম্পর্কে তাঁর কোনো বক্তব্যই এ কালে বসে সে কালের ব্যক্তি সম্পর্কে

২৫৮. সূরা [৪৯] হুজুরাত, আয়াত : ০৬।

আন্দাজে ঢিল ছোড়া মনগড়া মন্তব্য নয়। তিনি নিজেই বলেছেন :

إِنَّمَا رَوَيْنَا ذٰلِكَ رِوَايَةً لَمْ نَقُلْهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِنَا.

এ সম্পর্কে আমি পূর্বসূরিদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি মাত্র। নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলিনি।[২৫৯]

উল্লিখিত আয়াতের আলোকে এ কথাও সাব্যস্ত যে, সংবাদদাতা সম্পর্কে যিনি ওয়াকিবহাল তিনি তার সংবাদের গ্রহণযোগ্যতা ও অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে ও দিতে পারবেন। এ কথা জ্ঞানচর্চার জগতে সর্বজনস্বীকৃত। যা কিছু মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির গম্য সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে ও দিতে কোনো ঊর্ধ্বপক্ষের স্পেসিফিক অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। বরং নির্দিষ্ট শাস্ত্রে স্বীকৃত পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত পারদর্শিতা অর্জন করতে হয় এবং সত্যই পারদর্শিতা অর্জিত হয়েছে কি না সে বিষয়ে উক্ত শাস্ত্রের স্বীকৃত ব্যক্তিবর্গের স্বীকৃতি পেতে হয়।

যে গ্রন্থটিকে আমরা আল্লাহর কিতাব আল কুরআন বলে জেনেছি ও মেনেছি, জন্মের পর থেকে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও চারপাশের লোকজনের কাছ থেকে জেনেছি যে, এটা আল কুরআন। কিন্তু তারা কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের স্পেসিফিক অনুমোদিত নয়। তাছাড়া আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যে নিশ্চিত হয়েছি, কিন্তু আমি বা আমার জ্ঞানবুদ্ধিই কি মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কর্তৃক স্পেসিফিক অনুমোদিত? তাই বলে কি আমাদের এই সিদ্ধান্ত অবাস্তব অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক? কিছুতেই নয়—যদিও প্রজন্মের পর প্রজন্ম এভাবেই জেনে এসেছে।

হাদীস সত্যায়ন প্রক্রিয়া অনৈসলামিক

হাদীস সত্যায়ন প্রক্রিয়া অনৈসলামিক। কেননা হাদীস সত্যায়ন করা হয় বর্ণনাকারীদের সত্যায়ন করার মাধ্যমে। কিন্তু কোনো ব্যক্তির জন্যই তার সর্বাধিক নিকটতম ব্যক্তির সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব যেমন নয়, তেমনি যে কারো সম্পর্কে সুধারণা রাখার নির্দেশনা থাকলেও কারো বিশ্বস্ততা ও ঈমানদারিতা সম্পর্কে চূড়ান্ত নিশ্চয়তা দেওয়াও কুরআন-সুন্নাহসম্মত নয়। মহান আল্লাহ বলেন :

---

২৫৯. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', ১/৭৯ ও ১০/১০৪।

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَدُوْا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيْمٍ.

"আর তোমাদের আশপাশের বেদুইনদের মাঝে মুনাফিক আছে এবং মদীনাবাসীদের মধ্যেও; তারা কপটতায় এতটাই সিদ্ধ যে, তোমরা তাদেরকে জানো না, তবে আমি তাদেরকে জানি। অবশ্যই আমি তাদেরকে দুবার শাস্তি দেব। অতঃপর তাদেরকে এক ভয়ংকর শাস্তির দিকে তাড়িত করা হবে।"[২৬০]

হাদীস শরীফে এসেছে, মুহাজির সাহাবি উসমান ইবন মাযউন (রা.) আনসারি সাহাবিয়া উম্মুল আলা'র বাড়িতে জায়গির থাকেতেন। এই উসমান (রা.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর জায়গিরদার উম্মুল আলা' (রা.) বলেন, তাঁর উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক। তাঁর সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কীভাবে জানলে যে, আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, তা না হলে আল্লাহ আর কাকে সম্মানিত করবেন? নবীজি বললেন :

أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِيْنُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأَرْجُوْ لَهُ الْخَيْرَ وَاللهِ مَا أَدْرِيْ وَأَنَا رَسُوْلُ اللهِ مَا يُفْعَلُ بِيْ.

তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তাঁর নিশ্চিত মৃত্যু হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি অবশ্যই তাঁর জন্য কল্যাণের আশা করি। আল্লাহর কসম, আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও জানি না, আমার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে।

ওই নারী সাহাবি বলেন, আল্লাহর কসম, এরপর আমি আর কোনো দিন কারো সম্বন্ধে পবিত্র বলে মন্তব্য করব না।[২৬১]

সূরা তাওবাহর উল্লিখিত ১০১ নং আয়াত থেকে আমরা দেখছি যে, সাহাবিগণও তাঁদের সমাজের মুনাফিকদের চিনতেন না। সুতরাং তাঁদের জন্যও সম্ভব ছিল না তাঁদের সামাজের কারো কপটতা ও স্বচ্ছতা সম্পর্কে

---

২৬০. সূরা [৯] তাওবাহ, আয়াত : ১০১।

২৬১. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৭৪৫৭; সহীহ বুখারি, হাদীস : ২৬৮৭।

সুনিশ্চিত করে বলা। তেমনি হাদীস শরীফ থেকে আমরা দেখলাম, একই ছাদের নিচে বসবাসকারী ব্যক্তির ব্যাপারেও সুনিশ্চিত করে কিছু বলার অনুমতি নেই।

তাহলে মুহাদ্দিসগণ স্বীয় যুগের এবং নিকট, দূর বা সুদূর অতীতের বর্ণনাকারীদের প্রত্যয়ন করছেন এবং তার ভিত্তিতে তাদের দেওয়া সংবাদের মান নির্ণয় করছেন—এটা কীভাবে বৈধ ও অনুমোদিত হতে পারে?

তাছাড়া মুহাদ্দিসগণ হাদীস সত্যায়নের নামে লক্ষ লক্ষ মুসলিম রাবির চরিত্র হনন করেছেন। তাদেরকে মিথ্যুক, প্রতারক, বক্তব্য জালকারী ইত্যাদি নানান নেতিবাচক বিশেষণে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছেন। অথচ কুরআন-হাদীসের অসংখ্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক কোনো মানুষের সম্মানহানি, নিন্দা, গীবত ভয়ংকর কবীরাহ গোনাহ এবং এর পরিণাম চিরস্থায়ী জাহান্নাম। মহান আল্লাহ আল কুরআনে বলেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক ধারণা থেকে দূরে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান কোরো না। এবং একে অপরের দোষচর্চা কোরো না। তোমাদের কেউ কি আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো এটা ঘৃণাই করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।[২৬২]

হাদীস অস্বীকারকারীদের এইসব দাবি অবাস্তব, অজ্ঞতা, ভুল ও স্থূল চিন্তার ফসল। সূরা তাওবাহর ১০১ নং আয়াতে শ্রোতাপক্ষের ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এ আয়াতে প্রধানত সাহাবিগণ উদ্দেশ্য। তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং নবীজি ও তাঁর সাহাবিগণ মুনাফিকদের চিনতেন না এবং তাদের পরিণতি জানতেন না—এ কথা সত্য। তবে পরে আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে মুনাফিক সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন

২৬২. সূরা [৪৯] হুজুরাত, আয়াত : ১২।

সূরা শূরার ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ্ নবীজিকে বলেছেন, 'আপনি জানতেন না কিতাব কী আর ঈমান কী?' এর অর্থ এ নয় যে, নবীজি কখনোই কিতাব ও ঈমান সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেননি।

তেমনি প্রথম দিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক না চিনলেও পরবর্তী সময় সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাঁকে জ্ঞানদান করেছিলেন। কারো কারো বিষয়ে সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন এবং অন্যদের চেনার জন্য আলামত বলে দিয়েছিলেন। আল কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াত এবং অনেক হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিকদের চিনতেন। এমনকি কারা মুনাফিক এ বিষয়টি সাহাবিদের নিকটও সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُّخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ.

"যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে দেবেন না? আমি চাইলে, অবশ্যই আপনাকে তাদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব। ফলে তাদের ভাবভঙ্গিতে অবশ্যই আপনি তাদেরকে চিনতে পারবেন। তবে কথার ভঙ্গিতে অবশ্যই আপনি তাদেরকে চিনতে পারবেন। আর আল্লাহ তাদের কর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত।"[২৬৩]

অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ.

"আপনি যদি তাদেরকে দেখেন তাদের দেহকাঠামো আপনাকে মুগ্ধ করবে। আর যদি তারা কথা বলে আপনি তাদের কথা শুনতে চাইবেন। যেন তারা দেওয়ালে ঠেস দেওয়া কাঠখণ্ড। তারা ধারণা

২৬৩. সূরা [৪৭] মুহাম্মাদ, আয়াত : ২৯-৩০।

করে সকল আওয়াজ বুঝি তাদের বিরুদ্ধে। এরা শত্রু। এদের থেকে দূরে থাকুন। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে!"[২৬৪]

উপরের আয়াতে মহান আল্লাহ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, কথার ভঙ্গিতে অবশ্যই আপনি মুনাফিকদেরকে চিনতে পারবেন। আর এ আয়াতে মুনাফিকদের কিছু আলামত উল্লেখ করে বললেন, এরা শত্রু। এদের থেকে দূরে থাকুন। সূরা তাওবাহর ৭৩ নং আয়াত এবং সূরা তাহরীমের ৯ নং আয়াতে তিনি নবীজিকে মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এবং কঠোরতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এবং সূরা তাওবাহর ৮৪ নং আয়াতে মুনাফিকদের জানাযা না পড়তে এবং তাদের কবরের পাশে না দাঁড়াতে নবীজিকে নির্দেশ দিয়েছেন।

এ সকল আয়াত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনাফিক গোষ্ঠীকে পুরোপুরি চিনতেন। তা না হলে তিনি কীভাবে তাদের থেকে দূরে থাকা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও কঠোরতা অবলম্বন করা এবং তাদের জানাযা না পড়ানো ও কবরের পাশে না দাঁড়ানোর এ সকল কুরআনি নির্দেশ পালন করবেন?

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো সাহাবিকে বিষয়টি অবগত করেছিলেন। ফলে সাহাবিদের সমাজে মুনাফিকরা সকলের কাছে চিহ্নিত ছিল। কা'ব ইবন মালিক (রা.) তাবুক যুদ্ধে শরিক হননি। এ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন :

كُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَنَنِيْ أَنِّيْ لَا أَرَى إِلَّا رَجُلًا مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ النِّفَاقُ.

তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বের হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন মানুষের মাঝে বের হয়ে ঘুরতে লাগলাম, একটি বিষয় আমাকে পীড়া দিতে লাগল, আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধু মুনাফিকিতে প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছাড়া।[২৬৫]

২৬৪. সূরা [৬৩] মুনাফিকূন, আয়াত : ০৪।

২৬৫. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৫৭৮৯; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪৪১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭৬৯।

অর্থাৎ সাহাবিদের সমাজের মুনাফিক গোষ্ঠী সকলের কাছে সুস্পষ্ট ছিল। কে সাহাবি আর কে মুনাফিক তা অস্পষ্ট ছিল না। আর সাহাবিগণ সকলেই ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ও গ্রহণযোগ্য। সুখের কথা হচ্ছে, সাহাবিদের সমাজের মুনাফিক হিসাবে চিহ্নিত কোনো একজন ব্যক্তি থেকেও একটি হাদীসও বর্ণিত হয়নি। সুতরাং সে সমাজে মুনাফিকের উপস্থিতির কারণে হাদীসের ভান্ডারে সন্দেহ তৈরি হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আর উম্মুল আলা' (রা.) বর্ণিত উসমান ইবন মাযউন (রা.)-এর মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনায় পরকালীন জীবনে মহান আল্লাহ কাকে কোন পজিশনে রেখেছেন সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত মন্তব্য করতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। এর সাথে দুনিয়ার জীবনে ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা বা অগ্রহণযোগ্যতার কোনো সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে উপরে উল্লেখিত সূরা হুজুরাতের ০৬ নং আয়াতটি আবার স্মরণীয়। আয়াতটিতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে মুমিনগণ, যদি কোনো ফাসিক তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ নিয়ে আসে তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে'। এ আয়াত থেকে প্রথমত বোঝা যায় যে, সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে সংবাদদাতার চারিত্রিক অবস্থা দ্রষ্টব্য। মুমিনগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে আদিষ্ট যে, তারা সংবাদদাতার চারিত্রিক অবস্থা বিবেচনায় সংবাদ গ্রহণ বা বর্জন করবেন। কিন্তু তারা কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি এতটুকু প্রত্যয়ন করতে না পারেন, যার ভিত্তিতে তারা উক্ত ব্যক্তির আনীত বা প্রদত্ত সংবাদ গ্রহণ বা বর্জন করতে পারবেন, তাহলে তারা কীভাবে এই কুরআনি নির্দেশ পালন করবেন? সুতরাং হাদীস অস্বীকারকারীদের উত্থাপিত দলীলের দাবি কিছুতেই এ নয় যে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে এতটুকু প্রত্যয়নও করা যাবে না যার ভিত্তিতে তার সংবাদ গ্রহণ-বর্জন করা যায়। তবে কারো সম্পর্কে চূড়ান্ত ফায়সালা করা এবং আখিরাতের অবস্থান সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে বলা তো শুধু মহান আল্লাহরই কর্ম।

এ আয়াত থেকে এ কথাও বোঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি যদি এমন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আসে, যা গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন ওঠে, তার ব্যক্তিগত অবস্থা সংবাদপ্রাপকের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে, জানা থাকতে হবে সংবাদদাতা ফাসিক নাকি আদিল। সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। সুতরাং

হাদীসের মতো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যাদের মাধ্যমে বর্ণিত হবে সেসব বর্ণনাকারীর অবস্থা উম্মাতের কাছে পরিষ্কার থাকতে হবে। এ কারণেই মুহাদ্দিস ইমামগণ কর্তৃক রাবিদের সামগ্রিক অবস্থা আলোচিত হওয়া একটি জরুরি বিষয়। আর প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কারো নেতিবাচক বিশেষণ উল্লেখ করাও নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয় গীবত নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ প্রদর্শিত অনুমোদিত কর্ম। আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ মূসা (আ.)-কে ফিরআউনের কাছে দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন :

اِذْهَبْ إِلٰى فِرْعَوْنَ إِنَّهٗ طَغٰى.

"তুমি ফিরআউনের কাছে যাও। সে সীমালঙ্ঘন করেছে।"[২৬৬]

হাদীস শরীফে এসেছে, ফাতিমা বিনতু কায়স (রা.)-কে তাঁর স্বামী আবু আমর তালাক দেন। ইদ্দত পালন শেষে তিনি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন, মুআবিয়াহ ও আবু জাহম আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন। তখন নবীজি বলেন :

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

আবু জাহম তো চরম মারকুটে লোক, সে তো কাঁধ থেকে লাঠি নামায়ই না। আর মুআবিয়াহ কপর্দকহীন নিঃসম্বল মানুষ। তুমি বরং উসামাকে বিয়ে করো।[২৬৭]

সুতরাং হাদীস সত্যায়নের জন্য বর্ণনাকারীর চরিত্রের পোস্টমর্টেম করা এবং তার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বলে রায় প্রদান করা কুরআন-হাদীস নিষিদ্ধ অনৈসলামিক কর্ম নয়। বরং সংবাদ গ্রহণের ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়ার যে কুরআনি নির্দেশ তার প্রতিপালন। মুহাদ্দিসদের কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার ছিল। তারা হাদীস বর্ণনাকারীর প্রয়োজনীয় সমালোচনাকে নিন্দনীয় গীবত হিসাবে গণ্য করতেন না। এ বিষয়ে মুহাদ্দিসদের সর্বজনস্বীকৃত বক্তব্য হচ্ছে :

---

২৬৬. সূরা [২০] তা-হা, আয়াত : ২৪ ও ৪৩; সূরা [৭৯] নাযিআত, আয়াত : ১৭।

২৬৭. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৮০; মুআত্তা মালিক, হাদীস : ১৬৬৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৭৩২৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস : ৩২৪৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ২২৮৪।

وَالْـكَلَامُ فِي الرِّجَـالِ جَرْحًـا وَتَعْدِيْـلًا ثَابِـتٌ عَـنْ رَسُـوْلِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ثُـمَّ عَـنْ كَثِـيْرٍ مِـنَ الصَّحَابَـةِ وَالتَّابِعِيْنَ فَمَـنْ بَعْدَهُـمْ وَجُـوِّزَ ذٰلِـكَ تَـوَرُّعًا وَصَوْنًـا لِلشَّرِيْعَـةِ لَا طَعْنًـا فِي النَّـاسِ.

বর্ণনাকারীর ব্যক্তিগত তথ্য আলোচনা-পর্যালোচনা করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বিপুল সংখ্যক সাহাবি, তাবিয়ি এবং পরবর্তী শাস্ত্রবিদ থেকে প্রমাণিত। এর বৈধতা দেওয়ার কারণ শরীআতকে খাদ থেকে নির্ভেজাল রাখা, ব্যক্তি-আক্রমণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়।[২৬৮]

ইমাম বুখারি (রাহ.) বারবার বলেছেন, আখিরাতে আমার কোনো প্রতিপক্ষ থাকবে না। যখন থেকে আমি জেনেছি যে, গীবত গীবতকারীরই ক্ষতির কারণ হয় তখন থেকে কখনো কারো গীবত করিনি। আমি আশা করি, যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াব কারো গীবত করেছি এমন কোনো হিসাব তিনি পাবেন না। মুহাম্মাদ ইবন আবু হাতিম বলেন, আমি তাঁকে বললাম, কিছু মানুষ আপনার তারীখ গ্রন্থের ব্যাপারে আপত্তি করেন। তারা বলেন, সেখানে আপনি অনেক মানুষের গীবত করেছেন। তখন ইমাম বুখারি (রাহ.) বলেন :

إِنَّمَا رَوَيْنَا ذٰلِكَ رِوَايَةً لَمْ نَقُلْهُ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِـنَا.

এ সম্পর্কে আমি পূর্বসূরিদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি মাত্র। নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলিনি।[২৬৯]

এরপর তিনি আয়িশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করেন। হাদীসটি তিনি তাঁর সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আয়িশা (রা.) বলেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকটে আসার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বলেন :

اِئْذَنُوْا لَهُ فَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِـيْرَةِ أَوْ بِئْسَ أَخُو الْعَشِـيْرَةِ.

তাকে অনুমতি দাও। সে তো বংশের নিকৃষ্ট সন্তান বা ভাই।[২৭০]

২৬৮. হাজ্জি খলীফা, কাশফুল যুনূন, ১/৫৭২; সিদ্দীক হাসান খান, আবজাদুল উলূম, পৃ. ৩৫৭; আল হিত্তাহ, পৃ. ৮৩।

২৬৯. যাহাবি, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা', ১/৭৯ ও ১০/১০৩-১০৪।

২৭০. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৬০৫৪ ও ৬১৩১।

এ হাদীসে আমরা দেখছি, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তি সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ কথা তিনি বলেছেন, অন্যের প্রতি নসীহাহ বা কল্যাণ কামনা স্বরূপ। যেন অন্যেরা তার অকল্যাণ থেকে সতর্ক হতে পারে। এ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারছি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কারো সম্পর্কে বাস্তব সত্য নেতিবাচক মন্তব্য করা কুরআন-হাদীস বিরোধী অনৈসলামিক কর্ম নয়। সুতরাং হাদীসের মতো অতি প্রয়োজনীয় সংবাদ যাদের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে তাদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য উল্লেখ ও সংরক্ষণ করা কিছুতেই অনৈসলামিক কর্ম বলে গণ্য নয়।

যেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত হাদীস মান্য করা আবশ্যক থাকবে সেহেতু সে পর্যন্ত হাদীস যাচাই-বাছাইয়ের প্রশ্নও থাকবে। এবং এ কারণেই হাদীস বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত তথ্যাদি স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হওয়া ছিল অতিশয় জরুরি। মুহাদ্দিস ইমামগণ এই অতিপ্রয়োজনীয় কর্মটিই জীবন ক্ষয় করে আনজাম দিয়েছেন। তাই তারা উম্মাহর পক্ষ থেকে বেহদ কৃতজ্ঞতা, পুরস্কার ও প্রতিদান পাওয়ার হকদার।

সহীহ সনদে জাল হাদীস

হাদীস অস্বীকারকারীরা বলেন, হাদীসের নামে জালিয়াতি হয়েছে এ কথা হাদীস মান্যকারী ও অমান্যকারী সকলেই জানেন ও মানেন। আর সনদ যাচাইয়ের মাধ্যমে হাদীস সত্যায়ন করা সম্ভব নয়। কেননা জালিয়াত তো জাল হাদীসের জন্য বিশুদ্ধ সনদ ব্যবহার করতে পারেন। এমতাবস্থায় কীভাবে সনদ পরীক্ষা করে হাদীসের সত্যাসত্য নিরূপণ করা সম্ভব হবে?

তাছাড়া হাদীসের নামে জালিয়াতি হওয়ার কথা যদি আমরা স্বীকার করি তবে হাদীসের আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। কেননা যার একটা জাল ধরা পড়ে তার বাকি কথাও প্রামাণ্যতা হারায়। যেমন কোনো আদালতে কেউ একটা মিথ্যা বলেছে প্রমাণ হলে বা একটা ফেইক ডকুমেন্ট উত্থাপন করলে তার বাকি নয়শত নিরানব্বইটা সত্য আদালত গ্রহণ করে না।

জাল কথার জন্য সহীহ সনদ ব্যবহার করলে তা মুহাদ্দিসদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সহীহর কাতারে উতরে যেতে পারবে—এ কথা শুনে হাদীসশাস্ত্রের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী পর্যন্ত বিস্ময়ে হাসতে ভুলে যাবে। কোনো

বুদ্ধিমান মানুষ এমন অজ্ঞতাপ্রসূত ও পাগলামিপূর্ণ বাক্যালাপ করতে পারে! কোনো শাস্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পর্যন্ত অর্জন না করে তা সম্পর্কে মুখ খোলা যায়! এসব প্রলাপের জবাব দিতে যাওয়াও সময় নষ্ট করা, এক প্রকার বাতুলতা এবং বাক্যের অপচয়। কবি তাই পরামর্শ দিয়েছেন :

إِذَا نَطَقَ السَّفِيْهُ فَلَا تُجِبْهُ
فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوْتُ
فَإِنْ جَاوَبْتَهُ فَرَجْتَ عَنْهُ
وَإِنْ خَلَيْتَهُ كَمَدًا يَمُوْتُ.

উত্তর দিতে যেয়ো না যখন নির্বোধ বলে কথা,
তার সে কথার জবাবের চেয়ে উত্তম নীরবতা।
প্রত্যুত্তর করলে তো তার করে দিলে স্থান,
আর জেনে রেখো, উপেক্ষাতেই হয়ে থাকে প্রস্থান।

কবি যথার্থই বলেছেন। আমাদেরও এসব প্রলাপের জবাব দিতে রুচি হয় না। এ বিষয়ে ড. মুস্তফা আযমির কিছু সহজ-সরল বক্তব্য তুলে দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন, কারো কারো মনে সন্দেহ আসতে পারে যে, পরবর্তী যুগে কোনো কোনো মিথ্যাবাদী তো একেবারে উচ্চশ্রেণির বর্ণনাসূত্র-সহই একটি হাদীস বানিয়ে ফেলতে পারে। মুহাদ্দিসগণ হয়তো সনদ দেখেই সেই বানোয়াট বর্ণনাটি গ্রহণ করে নিলেন। আসলে এই আশঙ্কা অমূলক। কারণ এ কথা স্পষ্ট যে, মুহাদ্দিসগণ শুধু সনদ দেখেই ক্ষান্ত হন না। এ বর্ণনাকারীর অবস্থাও যাচাই করা হয়। পাশাপাশি দেখা হয় তার সতীর্থ কেউ সেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কি না।[২৭১] কোনো যুগেই জাল কথার সহীহ সনদ তৈরি করে মুহাদ্দিসদেরকে প্রতারিত করে উতরে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

এখানে দ্বিতীয় যে কথাটি তারা বলেছেন, হাদীসের নামে জালিয়াতি হয়েছে বলে হাদীস গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে—এটাও তাদের নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ কথা। উদোর পিণ্ডি তারা বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন।

---

২৭১. মুস্তফা আযমি, হাদিস সংকলনের ইতিহাস, পৃ. ১২৯।

এটা তো সত্যি যে, যে ব্যক্তি জীবনে একবার মিথ্যা বলেছে তার বিশ্বস্ততা হারিয়ে যাবে। কিন্তু যার নামে মিথ্যা বলা হলো তার বিশ্বস্ততাও হারিয়ে যাবে, এটা কেমন বিচার? আপনি জীবনে কখনো মিথ্যা বলেননি, কিন্তু কেউ একজন আপনার নামে মিথ্যা বলেছে, তাই আপনি আর বিশ্বাসযোগ্য থাকবেন না? কিছু মানুষ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা হাদীস তৈরি করেছে বলে নবীজির সকল হাদীস গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে? এটা কি কোনো যুক্তির কথা?

জি, যে ব্যক্তি জীবনে কখনো মিথ্যা বলেছে বলে প্রমাণিত সে বিশ্বস্ততা হারিয়েছে। হাদীসশাস্ত্রেও তার কথা আর গ্রহণ করা হয় না। আদালতে যেমন কেউ একটা মিথ্যা বলেছে প্রমাণ হলে বা একটা ফেইক ডকুমেন্ট উত্থাপন করলে তার সত্যমিথ্যা কোনো কিছুতেই আদালত ভ্রুক্ষেপ করে না। বরং ব্যক্তিকেই বাতিল করে দেয়। কিন্তু ওই মামলাটি যদি অন্যান্য সত্য সাক্ষী ও ডকুমেন্টের দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায় আদালত সেভাবেই রায় প্রদান করে। কোনো সাক্ষীর মিথ্যাচারের কারণে তার সাক্ষ্য বাতিল হয়, মামলাটি বাতিল করা হয় না।

এখান থেকে এ সংশয়ও তৈরি হতে পারে যে, কোনো বর্ণনাকারীর একটা মিথ্যা প্রমাণিত হলে যখন তার সমস্ত বর্ণনা বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে তখন তার কিছু ভুল ও জাল বর্ণনার পাশাপাশি অনেক বিশুদ্ধ হাদীসও বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে তো নবীজির অনেক হাদীস বাতিল ও অগ্রহণযোগ্যতার তালিকায় গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে। তবে কি এ কথা বলা যায় না যে, তাঁর সমগ্র হাদীস সংরক্ষিত হতে পারেনি?

এ সংশয়টিও অমূলক। যদিও প্রমাণিত মিথ্যাবাদীর জাল-সহীহ সকল বর্ণনা বাতিল হয়ে যাচ্ছে, তবে এ কারণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো হাদীস হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয় না। কেননা এমন তো হতে পারে না যে, নবীজির কোনো সহীহ হাদীস শুধু ওই মিথ্যাবাদীই জানতেন আর কেউ জানতেন না, মিথ্যাবাদীর জানা সহীহ হাদীসগুলো উস্তাদের কাছ থেকে শুধু তিনিই শিখেছিলেন, এই মিথ্যাবাদী ছাড়া ওই উস্তাদের আর কোনো ছাত্র ছিল না।

বরং কোনো মিথ্যাবাদীর চেয়ে ন্যায়পরায়ণ নিষ্ঠাবান রাসূল-প্রেমিক মুসলিমের হাদীস শেখার আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। সুতরাং কোনো

নির্ভরযোগ্য উস্তাদের কাছ থেকে কোনো মিথ্যাবাদী যদি একটা বিশুদ্ধ হাদীস শিখে থাকেন তবে অন্য অনেক ন্যায়পরায়ণ নিষ্ঠাবান ব্যক্তিও ওই উস্তাদের কাছ থেকে সেই হাদীসটি শিখে থাকবে। সুতরাং ওই মিথ্যাবাদীর সূত্রে ওই বর্ণনাটি বাতিল হলেও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে সেটি বর্ণিত ও সংরক্ষিত হয়ে যাবে। অতএব মিথ্যাবাদীর বর্ণনা বাতিল করে দেওয়ার কারণে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস হারিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

প্রবীণ সাহাবিদের বর্ণিত হাদীস সংখ্যা কম

অনেকে এ কথা বলে হাদীসের উপর সংশয় তৈরি করতে চায় যে, আবু বাকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর মতো প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবিয়ারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নববি জীবনের সমগ্র সময়ের সান্নিধ্যে ধন্যড়তাঁরা আবু হুরাইরা (রা.)-এর মতো শেষকালে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়েসি সাহাবিদের তুলনায় নবীজির কথা ও কর্ম সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন। এ কারণে তাঁদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা আবু হুরাইরা (রা.)-এর মতো শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়েসি সাহাবিদের থেকে অনেক অনেক বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু হয়েছে তার উল্টো। আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেছেন হাজার হাজার হাদীস। আর এর বিপরীতে আবু বাকর (রা.) বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা শত শতও নয়।

কোনো পড়াশোনা নয়, এ প্রশ্ন উঠানোর আগে যদি শুধু নিজের মস্তিষ্ককেও কাজে লাগানো হতো, তবুও এ ধরনের বালসুলভ কথা উচ্চারণ করা থেকে জবানকে সংযত করা হতো। কে নিজেকে হাসির পাত্র বানাতে চায়! বোঝা যায়, এ বক্তব্যের প্রচারক হাদীস সংরক্ষণের দুর্বলতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণের উসকানিতে খুবই ত্বরা প্রবণতার শিকার হয়েছেন।

প্রধানত দুটি কারণে আবু বাকর (রা.)-এর মতো প্রবীণ সাহাবিদের বিপরীতে আবু হুরাইরা (রা.)-এর মতো নবীন সাহাবিদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা বেশি। ১. সাহাবিদের কাছ থেকে হাদীস শিখেছেন তাবিয়িগণ। তাঁদের কাছ থেকে তাবি'-তাবিয়িগণ। এভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মধ্য দিয়ে সংকলক মুহাদ্দিসদের হাতে হাদীস সংকলিত হয়।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের অল্প দিনের মধ্যে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রবীণ সাহাবিগণও ইন্তিকাল করেন। যেমন আবু বাকর

(রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর মাত্র দু-বছর বেঁচে ছিলেন। আর নবীজির শেষ-জীবনে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়েসি সাহাবিগণ বেঁচে ছিলেন দীর্ঘকাল। তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী আবু হুরাইরা (রা.) নবীজির ইন্তিকালের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বেঁচে ছিলেন। নবীজির ইন্তিকালের পরপর ইসলাম গ্রহণকারী প্রবীণ তাবিয়িগণ তো সকল জীবিত সাহাবির কাছ থেকে হাদীস শেখার সুযোগ পেয়েছেন। তবে প্রবীণ সাহাবিগণ, যারা আগে আগে ইন্তিকাল করে গেছেন, তাঁদের অল্প দিনের সান্নিধ্যের কারণে তাঁদের কাছ থেকে হাদীস শেখার সুযোগ কম পেয়েছেন। আর দীর্ঘদিন যারা বেঁচে ছিলেন, সে সকল সাহাবির দীর্ঘ সান্নিধ্যের কারণে তাঁদের কাছ থেকে হাদীস শেখার সুযোগ বেশি পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে যে সকল তাবিয়ি সাহাবি-যুগের শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা তো প্রবীণ সাহাবিদের সাক্ষাৎ না পাওয়ার কারণে তাঁদের কাছ থেকে কোনো হাদীস শেখার সুযোগ পাননি। তাঁরা শুধু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ জীবনে ইসলাম গ্রহণকারী অল্প বয়েসি সাহাবিদের থেকেই হাদীস শেখার সুযোগ পেয়েছেন।

তাছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবিদের প্রথম যুগটি ছিল মূলত সাহাবি-প্রধান যুগ। তখন অল্প কিছু তাবিয়ি মাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন। সাহাবিরা তো সকলেই নবীজির কাছ থেকে ইসলাম শিখেছেন। আর সে সময়ে ইসলাম গ্রহণকারী তাবিয়িগণ প্রবীণ-নবীন সকল সাহাবি থেকেই ইসলাম শিখেছেন। আর সাহাবিদের শেষ যুগটি ছিল তাবিয়ি-প্রধান যুগ। প্রবীণ সাহাবিরা ইন্তিকাল করেছেন। একের পর এক বিভিন্ন দেশ ইসলামের হাতে বিজিত হয়েছে। দলে দলে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা ওই সময়ে জীবিত সাহাবিদের থেকেই ইসলাম শিখেছেন।

এ কারণে স্বভাবিকভাবেই তাবিয়ি প্রজন্মে প্রবীণ সাহাবিদের তুলনায় নবীন সাহাবিদের ছাত্র-শিষ্যের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি আর তারা নবীন সাহাবিদের থেকে হাদীসও শিখেছেন বেশি। সুতরাং এটাও স্বাভাবিক যে, এই সকল তাবিয়িদের দ্বারা যখন তাবি'-তাবিয়িদের কাছে হাদীস বর্ণিত হবে নবীন সাহাবিদের সূত্রই বেশি উল্লেখিত হবে। এর অর্থ কিছুতেই

এ নয় যে, প্রবীণ সাহাবিগণ হাদীস কম জানতেন বা হাদীসকে কম মূল্যায়ন করতেন।

২. আবু বাকর (রা.) ও উমার (রা.)-এর মূল ব্যস্ততা ছিল রাষ্ট্র পরিচালনা। আর আবু হুরাইরা (রা.)-এর মূল ব্যস্ততা ছিল শিক্ষাদান। ধরুন, আপনারা দুজন সহপাঠী একজন উস্তাদের কাছ থেকে কোনো বিশেষ জ্ঞান অর্জন করলেন। তবে আপনি সে উস্তাদের সারা জীবনের সান্নিধ্যধন্য আর আপনার সহপাঠী উস্তাদের শেষ-জীবনের ছাত্র। উস্তাদের মৃত্যুর পর প্রচুর লোক আসতে লাগল আপনাদের আশ্রমে ওই বিশেষ জ্ঞান শেখার জন্য। তারা সেখানে থাকে আর জ্ঞান অর্জন করে। তবে আপনার উপর দায়িত্ব পড়ল এসব লোকজনের থাকা-খাওয়া ইত্যাদি বিষয় দেখভালের আর আপনার সহপাঠীর দায়িত্ব পড়ল তাদের শিক্ষাদানের। আপনার সহপাঠী তাদের শিক্ষাদান করেন। কোথাও আটকে গেলে আপনার শরণাপন্ন হন। আপনি সে বিষয়ে উস্তাদের কোনো বাণী জানলে তাকে বলে দেন। না হয় দুজন পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত বের করেন। তবে তা তাদের গিয়ে শেখান আপনার এই সহপাঠীই। আপনি হয়তো কাজের ফাঁকে কখনো-সখনো একটু সময় পেলে তাদের সময় দেন। কথার ফাঁকে উস্তাদের দুয়েকটা কথা তাদের বলেন।

দেখুন, আপনিই উস্তাদের কথা বেশি জানতেন এবং আপনার সহপাঠী এই আগত জ্ঞান-অনুসন্ধানীদের যা-কিছু শিখিয়েছেন তার একটা বড় অংশ আপনার কাছ থেকে জেনেই শিখিয়েছেন। তবে এই ছাত্ররা যখন পরবর্তী প্রজন্মকে আপনাদের উস্তাদের জ্ঞান শিক্ষা দেবেন তখন আপনার সূত্রে হয়তো দুয়েকটি কথা বলবেন, আর অধিকাংশই বলবেন আপনার সহপাঠীর সূত্রে।

এসব কারণেই আবু হুরাইরা (রা.)-এর মতো নবীন সাহাবিদের বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা বেশি। শেষ দিকে ইসলাম গ্রহণের কারণে ইসলামের অনেক কিছুই তাঁদেরকে শিখতে হয়েছে আবু বাকর (রা.)-এর মতো প্রবীণ সাহাবিদের কাছ থেকে এবং সেসব কিছুও তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়েছেন।

এটা ওহির দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ হাদীস সংরক্ষণে মহান আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থা যে, তিনি আবু হুরাইরা (রা.)-এর মতো অল্প বয়স্ক মেধাবী তীক্ষ্ণ

স্মৃতিশক্তির অধিকারী তরুণকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষকালে ঈমানের নিআমত দান করেছেন এবং তাঁকে নবীজির ইন্তিকালের পর প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল বাঁচিয়ে রেখে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ইলম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে অতি অল্প বয়সের আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বিবাহও ইলম সংরক্ষণে মহান আল্লাহর প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপনারই অংশ।

হাদীসের বহুপথ, কুরআনের একপথ

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, হাদীসের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য আল কুরআনের সঠিক অর্থ সংরক্ষণ করা। অথচ কারো কারো ধারণা, এমনকি একজন জনপ্রিয় বক্তাকে পর্যন্ত এ কথা বলতে শোনা গেছে যে, 'হাদীসের বহুপথ, কুরআনের একপথ, কুরআন ধরো'। ভয়ংকর কথা! এ কথার তো অনিবার্য দাবি, 'সুতরাং হাদীস ছাড়ো'। হাদীস বাদ দিয়ে কুরআন বুঝতে গেলে কুরআনের কত পথ হবে সেটা হয়তো তিনি ভেবে দেখতে পারেননি। আহলে কুরআন পণ্ডিতদের বইপুস্তক তিনি পড়ে দেখতে পারেন। এক একটা বিষয়ের ব্যাখ্যায় তারা নিজেদের মধ্যে কত কত মতপার্থক্য করেছে, কত পথ সৃষ্টি করেছে!

অনেকের ধারণা, হাদীস মানতে গিয়েই বুঝি মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়েছে। আর তারা হয়তো সকল মতপার্থক্যকেই নিন্দনীয় ভাবেন।

তাদের জ্ঞাতার্থে আমরা প্রথমেই বলে নিই, সকল ইখতিলাফ নিন্দনীয় নয়। বরং কুরআন-হাদীস সমর্থিত ইখতিলাফ প্রশংসনীয় ও কাঙ্ক্ষিত। শুধু কুরআনের দিকে তাকালেও আমরা দেখব, ইখতিলাফ না করে উপায় থাকবে না। আমরা একটি উদাহরণ দিচ্ছি। মহান আল্লাহ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ.

> "তালাকপ্রাপ্তা নারীগণ তিন 'قُرُوْءٍ' (কুরুউন) সময় পরিমাণ নিজেদের বিরত রাখবে।"[২৭২]

আরবি ভাষায় 'কুরুউন' শব্দের দুটি অর্থ : হায়েয এবং দুই হায়েযের

২৭২. সূরা [২] বাকারাহ, আয়াত : ২২৮।

মধ্যবর্তী পবিত্রতা। কেউ যদি হায়েয অর্থ গ্রহণ করে আর অন্য কেউ যদি পবিত্রতা অর্থ গ্রহণ করে তাহলে তো অনিবার্যভাবে দুটি পথ হয়ে গেল। কুরআন দিয়ে এই দুটি পথ বন্ধ করবেন কীভাবে?

হাদীস মানলে ইখতিলাফ বা মতভিন্নতা বৈধতার সীমায় সীমাবদ্ধ থাকবে। আর হাদীস বাদ দিয়ে কুরআন বুঝতে গেলে মতভিন্নতা অবৈধতার সীমায় ঢুকে পড়বে এবং সে ইখতিলাফ হবে অন্তহীন। একেকজন এসে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করে একেকটা মত দাঁড় করাবে।

কুরআন ও হাদীসের সংঘর্ষ

কেউ কেউ এ কথা বলেন যে, মহান আল্লাহ আল কুরআনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনের ব্যাখ্যকার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীস মানি। তবে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক ও কুরআনের অতিরিক্ত কোনো বক্তব্যকে হাদীস বলে মানি না। আর তা হাদীস নামে প্রচলিত থাকলেও মূলত নবীজির হাদীস নয়। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্য দিতে পারেন না। তাছাড়া কুরআন ও হাদীস উভয়ই মহান আল্লাহর ওহি। আল্লাহ তাআলার মতো মহান বিধায়ক দুই ধরনের ওহিতে পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য দিতে পারেন না। আর নবীজি কুরআনের অতিরিক্ত বক্তব্যও দিতে পারেন না। কেননা কুরআন পরিপূর্ণ অনন্য এক মহাগ্রন্থ।

এই বক্তব্যটি পরস্পর সাংঘর্ষিক ও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। তাদের এই বক্তব্য মেনে নিলে তারা যে বলেন, 'আমরা হাদীস মানি, তবে...' তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে যায়। বিষয়টি আমরা কয়েকটি পয়েন্টে আলোচনা করছি।

প্রথমত, এ কথা ষোলো আনা যথার্থ যে, বিশুদ্ধ হাদীসের বক্তব্যের সাথে কুরআনের বক্তব্যের কোনো সংঘর্ষ নেই। যা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক তা হাদীসে নববি হতে পারে না। কুরআন ও হাদীস উভয়ই একটিমাত্র সোর্স থেকে এসেছে। উভয়ই আল্লাহ প্রেরিত ওহি। মহান আল্লাহ কখনো পরস্পর সাংঘর্ষিক বক্তব্য বান্দার নিকট নাযিল করতে পারেন না।

কিন্তু হাদীসের কোনো বক্তব্যকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলে বাদ দিতে হলে প্রথমে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য যথাযথভাবে বুঝতে হবে।

যেকোনো ব্যক্তির মনে হলো যে, এই হাদীস কুরআনের অমুক আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, আর তিনি সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলেন যে, এই হাদীস জাল, তবে তো তা হবে নিছক পাগলামিকে জ্ঞানশাস্ত্র বলে অভিহিত করা।

আমরা কীভাবে বুঝব যে, কুরআনের কোনো বক্তব্যের সাথে কোনো হাদীসের বক্তব্য সাংঘর্ষিক হচ্ছে? আমরা আমাদের দৃষ্টিতে কুরআনের যে আলোচনার সাথে হাদীসের যে সংঘর্ষ দেখতে পাচ্ছি তা তো এ কারণে হতে পারে যে, আমরা কুরআনের ওই আয়াতটি অথবা ওই হাদীসটির মর্ম ভুল বুঝেছি। অথবা কুরআন-হাদীস উভয়েরই উদ্দিষ্ট অংশের মর্ম ভুল বুঝেছি। আমাদের ওই ভুল বুঝের কারণেই কুরআন-হাদীসের সংঘর্ষ দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ সংঘর্ষ কুরআন-হাদীসের নয়, আমাদের ভুল বোঝার!

একটি উদাহরণ দেখুন। যে সকল মুমিন কোনো পাপের কারণে জাহান্নামে যাবে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শাফাআত ইত্যাদির মাধ্যমে জান্নাতে আসবে। এ বিষয়ে অনেক হাদীস রয়েছে। একটি হাদীসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

يَخْرُجُ قَوْمٌ مِّنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فَيُسَمِّيْهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

আগুনে ঝলসে যাবার পর একদল লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে। তারপর জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতিরা তাদেরকে 'জাহান্নামিয়্যীন' বলে আখ্যায়িত করবে।[২৭৩]

একদল লোক এ বিষয়ক হাদীসগুলোকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক দাবি করে বাতিল করে দেয়। অথচ তাদের উদ্ধৃত আয়াতগুলোর সাথে হাদীসগুলোর কোনো বিরোধ তো নেই-ই, বরং হাদীসগুলো অন্য একাধিক আয়াতের বিশুদ্ধ নববি ভাষ্য।

সালিহ ইবন আবী তারীফ (রাহ.) আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সূরা হিজরের ২ নং আয়াতের কোনো ব্যাখ্যা শুনেছেন? আবু সাঈদ (রা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি, পর্যাপ্ত শাস্তির পর আল্লাহ অনেক মুমিনকে

২৭৩. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৬৫৫৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১২৩৭৫।

জাহান্নাম থেকে বের করবেন। আল্লাহ যখন এইসব মুমিনকে মুশরিকদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন তখন মুশরিকরা তাদেরকে বলবে, তোমরা না দুনিয়াতে দাবি করতে যে, তোমরা আল্লাহর বন্ধু! তাহলে এখন আমাদের সাথে জাহান্নামে কেন? আল্লাহ তাদের এ কথা শুনে শাফাআতের অনুমতি দান করবেন। তাদের জন্য শাফাআত করবেন ফেরেশতামণ্ডলী ও নবীগণ (আ.)। তখন তারা আল্লাহর অনুমতিতে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে যাবে। এভাবে যখন তাদের বের করা হবে তখন মুশরিকরা বলবে, হায়, আমরা যদি এদের মতো হতাম, তাহলে শাফাআতের উপযুক্ত হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে পারতাম! সূরা হিজরের দ্বিতীয় আয়াতে মহান আল্লাহ এ কথাই বলেছেন :

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ.

"এক সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়, তারা যদি মুসলিম হতো!"[২৭৪]

আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন পর্বে পাপের কারণে জাহান্নামে যাওয়া মুমিনদের জন্য সুপারিশ করবেন। মহান আল্লাহ তাঁকে সুপারিশের অনুমতি দেবেন এবং তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি গোনাহগার মুমিনদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যার উপর জাহান্নাম স্থায়ীভাবে নির্ধারিত সে ছাড়া সবাইকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন :

عَسٰى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا.

"সত্বর আপনার প্রতিপালক আপনাকে 'প্রশংসিত অবস্থানে' উন্নীত করবেন।"[২৭৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এটিই হচ্ছে মাকামে মাহমূদ বা প্রশংসিত অবস্থান, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের নবীকে দেওয়া হয়েছে, যার কথা এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[২৭৬]

---

২৭৪. সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস : ৭৪৩২; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস : ৮১১০। ইবন হিব্বান, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

২৭৫. সূরা [১৭] ইসরা', আয়াত : ৭৯।

২৭৬. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৭৪৪০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১৩৫৬২।

ইয়াযীদ ইবন সুহাইব (রাহ.) বলেন, খারেজিদের একটি মত আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। একবার আমরা একটি দলের সাথে বের হই। উদ্দেশ্য ছিল হজ্জ করা। তারপর মানুষের সাথে যোগাযোগ করা। আমরা মদীনা দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম জাবির ইবন আব্দুল্লাহ (রা.) একটি খুঁটির পাশে বসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বর্ণনা করছেন। তিনি 'জাহান্নামিয়্যীন'দের বিষয়ে হাদীস বলছিলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবি, আপনি এ কী কথা বলছেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন :

رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ.

"হে আমাদের প্রতিপালক, নিশ্চয় আপনি যাকে জাহান্নামে প্রবেশ করালেন তাকে লাঞ্ছিত করলেন।"[২৭৭]

অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন :

كُلَّمَا أَرَادُوْا أَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا أُعِيْدُوْا فِيْهَا.

"যখনই তারা তা থেকে বের হতে চাইবে তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"[২৭৮]

তাহলে আপনারা এসব কী বলেন? জাবির (রা.) বলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো? আমি বললাম, জি। তখন তিনি বললেন, (তাহলে তুমি এর আগের অংশ পড়ে দেখো। এসব তো কাফিরদের ব্যাপারে বলা হয়েছে।[২৭৯]) তুমি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'মাকামে মাহমূদ' সম্পর্কে শুনেছ, আল কুরআনে মহান আল্লাহ যা তাঁকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন? বললাম, জি। তিনি বললেন, এই হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই 'মাকামে মাহমূদ', যা দ্বারা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে জাহান্নাম থেকে বের করবেন।...

ইয়াযীদ ইবন সুহাইব (রাহ.) বলেন, এরপর আমরা আমাদের এলাকায় ফিরে এলাম এবং সকলকে বললাম, ধ্বংস হোক তোমাদের, তোমরা কি

---

২৭৭. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ১৯২।

২৭৮. সূরা [৩২] সাজদাহ, আয়াত : ২০। আরো দেখুন : সূরা হাজ্জ, আয়াত : ২২।

২৭৯. ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ১০/৪৮৮।

মনে করো, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৃদ্ধ এই সাহাবি তাঁর নামে মিথ্যা বলছে? তারপর একজন ব্যতীত আমরা সকলেই ওই ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে ফিরে আসি।[২৮০]

উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম, একদল লোক 'জাহান্নামিয়্যীন' বিষয়ক হাদীসগুলোকে যে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক সাব্যস্ত করেছিল বাস্তবতা কিছুতেই তেমন নয়। তাদের উদ্ধৃত আয়াতগুলোর সাথে এ সকল হাদীসের কোনো বিরোধ তো নেই-ই, উপরন্তু এ হাদীসগুলো অন্য একাধিক আয়াতের বিশুদ্ধ নববি ভাষ্য।

ইয়া'লা ইবন হাকীম (রাহ.) বলেন, সাহাবি সাঈদ ইবন যুবাইর (রা.) একবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস বর্ণনা করেন। তখন এক ব্যক্তি বলেন :

فِيْ كِتَابِ اللهِ مَا يُخَالِفُ هٰذَا.

আল্লাহর কিতাবে এর বিপরীত বক্তব্য রয়েছে।

তখন সাঈদ ইবন যুবাইর (রা.) বলেন :

أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُعَرِّضُ فِيْهِ بِكِتَابِ اللهِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالٰى مِنْكَ.

আমি তোমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বলছি আর তুমি তাতে আল্লাহর কিতাবের সাথে বৈপরীত্যের কথা বলছ? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কিতাবের বিষয়ে তোমার থেকে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।[২৮১]

সুতরাং আমাদের উচিত কুরআন-হাদীসের সংঘর্ষ আবিষ্কার না করে নিজের বুঝকে পরখ করা। কেননা কুরআন নাযিল হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। তিনি কুরআন বুঝতেন পরিপূর্ণরূপে

---

২৮০. সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৯১; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস : ৩১০।

২৮১. সুনান দারিমি, হাদীস : ৬১০। আজুররি, আশ শারীআহ, হাদীস : ৯৯; ইবন বাত্তাহ, আল ইবানাহ, হাদীস : ৮১। হুসাইন দারানি বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।

এবং মানতেনও পরিপূর্ণভাবে। যেমনটি হাদীস শরীফে এসেছে, সা'দ ইবন হিশাম (রাহ.) বলেন, আমি আয়িশা (রা.)-কে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আখলাক কেমন ছিল? জবাবে তিনি বললেন :

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللهِ: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ.

তাঁর আখলাক ছিল কুরআন। তুমি কি কুরআন কারীমে মহান আল্লাহর এই বাণী পড়োনি, 'নিশ্চয় আপনি আছেন সুমহান আখলাকের উপর?।'[২৮২]

উপরন্তু মহান আল্লাহ তাঁকে করেছেন কুরআন পাকের বাহক, ব্যাখ্যাকার ও নমুনা। সুতরাং তাঁর বুঝকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলতে আমাদের বুক কেঁপে উঠা উচিত।

এ আলোচনার পরও যদি এ কথা বলা হয় যে, আমরা তাঁর বুঝকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বলছি না; বরং হাদীসের কিতাবসমূহে তাঁর নামে সংকলিত যেসব কথা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক সেগুলোকে তাঁর হাদীস বলেই মানছি না। কেননা আমরাও এ কথা বিশ্বাস করি যে, তাঁর কথা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। সুতরাং সাংঘর্ষিক কথাগুলো হাদীস নয়।

তাদের এ কথা মূলত হাদীস সংগ্রহ ও সংকলনে এবং মিথ্যা ও ভুল কথা থেকে যাচাই-বাছাই করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসকে নির্ভেজাল বিশুদ্ধরূপে সংরক্ষণে মুসলিম উম্মাহর কর্মপদ্ধতি ও এক্ষেত্রে তাদের সফলতার বিষয়ে অজ্ঞতার ফল এবং নিজের বুঝকে চূড়ান্তরূপে গ্রহণ করা থেকে উৎসারিত। অর্থাৎ তারা নিজের বুঝকে এমন চূড়ান্ত বিশুদ্ধ ও সঠিকতার মাপকাঠি হিসাবে গ্রহণ করেছে যে, তার বিপরীতে তারা চৌদ্দশত বছরের উম্মাহর হাজার হাজার মনীষীর অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেবে, কিন্তু নিজের বুঝ নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ করা ও তা নতুন করে পরখ করে দেখার গরজ বোধ করবে না। এমন আত্মমুগ্ধতার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কখনো সঠিক পথের দিশা পেতে পারে না। এরা হবে পথহারা, দুনিয়া-আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত। মহান আল্লাহ বলেন :

---

২৮২. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৪৬০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ৭৪৬।

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا . الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.

"বলুন, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না, কর্মের দিক থেকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত কারা? যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনেই ব্যর্থ হয়ে গেছে। অথচ নিজেদের ধারণায় তারা খুবই উত্তম কর্ম সম্পাদন করে চলেছে।"[২৮৩]

মনে রাখতে হবে, মুহাদ্দিস ইমামগণ হাদীস যাচাই-বাছাই ও সত্যাসত্য নিরূপণে কেবল বর্ণনাসূত্রই নিরীক্ষা করেননি, হাদীসের বক্তব্যও নিরীক্ষা করেছেন, তা বাস্তবতা ও কুরআনের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক কি না পরীক্ষা করেছেন। যেগুলো প্রকৃতপক্ষে বিরোধী হয়েছে সেগুলোকে শায, মুনকার, বাতিল, ওয়াহি ইত্যাদি বলে প্রমাণিত হাদীসের কাতার থেকে বের করে দিয়েছেন। এভাবেই যোগ্যতা, সততা, সত্যবাদিতা ও খোদাভীরুতায় প্রবাদতুল্য হাজার হাজার মনীষীর গবেষণার একটা চূড়ান্ত ফলাফল আমাদের সামনে রয়েছে। হাদীসশাস্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্ত এই যে, তা পরিপক্বতার চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছে। قد نضجت واحترقت। উম্মাতের মূলধারার এই জ্ঞান-গবেষণাকে অস্বীকার করে নিজের বুঝমতো চলতে গিয়ে যে ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে তার ব্যাপারে সতর্কতা ও কঠিন হুঁশিয়ারি দিয়ে আল্লাহর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ.

নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতকে ভ্রান্তির উপর একত্র করবেন না। আল্লাহর হাত ঐক্যবদ্ধতার উপর। আর যে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।[২৮৪]

দ্বিতীয়ত, কুরআন সকল কিছু সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে, এ কথার অর্থ

---

২৮৩. সূরা [১৮] কাহাফ, আয়াত : ১০৩-১০৪।

২৮৪. সুনান তিরমিযি, হাদীস : ২১৬৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস : ৩৯২-৩৯৭। হাদীসটিকে ইমাম হাকিম, জিয়া মাকদিসি, সাখাবি প্রমুখ মুহাদ্দিস প্রমাণিত বলেছেন।

এই নয় যে, কুরআনের বাইরে হাদীসও মানা যাবে না; বরং হাদীস মানতে হবে এ কথাও কুরআন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে। সুতরাং 'কুরআন সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা' এ কথার আলোকেই হাদীস মানা আবশ্যক। পাঠক, এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা আপনি কিছুক্ষণ আগে পড়ে এসেছেন। এ কারণে এখানে আমরা এ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছি না।

হাদীস মানি, তবে...

তৃতীয়ত, তারা যে দাবি করেন, *আমরা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক নয় বা কুরআনের অতিরিক্ত নয় এ ধরনের হাদীস মান্য করি*—এসব হাদীস তারা কোথায় পান? মুহাদ্দিসদের হাদীস সংরক্ষণ ও যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতিতে যদি তাদের আস্থা না থাকে; বরং যদি তারা মনে করেন, এভাবে মুহাদ্দিসরা সফল হননি, তবে তারা যে সকল হাদীস মান্য করেন তাদের কাছে তার সোর্স কী? তারা তো মুহাদ্দিসদের সংকলিত হাদীসের কিতাব থেকেই তাদের মতে কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ হাদীস গ্রহণ করে থাকেন।

ধরুন, ইমাম বুখারি (রাহ.) শুধু সহীহ হাদীস সংকলন করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়ে মুহাদ্দিসদের নিকট হাদীস সহীহ হওয়ার যে সকল শর্ত রয়েছে তার আলোকে হাদীস সংকলন করলেন। পরবর্তী মুহাদ্দিসগণ বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে, এক্ষেত্রে ইমাম বুখারি (রাহ.) সফল। কিন্তু এখন যদি কোনো ব্যক্তি সহীহ বুখারির কিছু হাদীস গ্রহণ করেন আর বাকি হাদীসগুলো এ কথা বলে বাতিল করে দেন যে, সেগুলো কুরআনের অতিরিক্ত বা কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, বুখারি (রাহ.) যে শুধু নবীজির হাদীস সংকলনের ঘোষণা দিয়েছিলেন তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি, তাতে অন্যের কথাও ঢুকে পড়েছে—হয়তো তাঁর অসততার কারণে, না হয় তাঁর অবহেলা বা শর্ত ও প্রচেষ্টার দুর্বলতার কারণে।

এখন তারা এই সহীহ বুখারি থেকে যে হাদীসগুলো গ্রহণ করছেন তা যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরই হাদীস তার প্রমাণ কী? তারা তো এ কথা মানছেন যে, ইমাম বুখারির অসততা হোক আর ব্যর্থতা হোক, সহীহ বুখারিতে নবীজির কথার বাইরেও অন্যদের কথা নবীর কথা নামে ঢুকে পড়েছে। হয়তো ইমাম বুখারি নিজেই জালিয়াতি করে অন্যের কথা

নবীর নামে চালিয়ে দিয়েছেন, অথবা তাঁর অবহেলা ও শর্তের দুর্বলতার কারণে ঢুকে পড়তে পেরেছে।

তাহলে সহীহ বুখারির যে হাদীসগুলোকে কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে তারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস হিসাবে গ্রহণ করলেন সেগুলোও যে ইমাম বুখারির জালিয়াতি নয় বা তাঁর শর্তের দুর্বলতার সুযোগে বুখারিতে ঢুকে পড়া অন্যের কথা নয়, তাদের কাছে এর প্রমাণ কী? তাদের কাছে এর প্রমাণ কি শুধু এই যে, এগুলো তাদের বুঝ অনুযায়ী কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ? যারা কুরআনের সাথে অসংগতিপূর্ণ বক্তব্য নবীর নামে হাদীসের কিতাবে ঢুকিয়ে দিতে পারে বা যাদের অসর্তকতার কারণে এ ধরনের বক্তব্য কিতাবে ঢুকে যেতে পারে তাদের অসততা বা অসতর্কতার কারণে কি সংগতিপূর্ণ মিথ্যা ও ভুল বক্তব্য ঢুকে যেতে পারে না? তাছাড়া এমনও তো নয় যে, কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ কথা কেবল নবীজিই বলতে পারেন আর কেউ বলতে পারে না। তাহলে তাদের গৃহীত হাদীসগুলো যে বিশুদ্ধ নবী-বাণী তার বিশ্বাসযোগ্যতা কী?

তারা যদি বলেন, হাদীস না হলেও অসুবিধা নেই। যেহেতু কুরআন-বিরোধী নয়, বরং কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ কথা, সুতরাং এ কথা মানলে তো ইসলাম-বিরোধী কিছু মানা তো হচ্ছে না, নাই-বা হলো হাদীস। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন অন্য জায়গায়— আপনাদের হাদীস মানার দাবির যথার্থতা কোথায়?

তাদের এক পণ্ডিত বলেছেন, '*হাদীস মানি কুরআনের মানদণ্ডে, বর্ণনাকারীর সত্যবাদিতার মানদণ্ডে নয়*'। অর্থাৎ যে কেউ কোনো একটা কথাকে হাদীস বলে দাবি করল, আর পণ্ডিত মহাশয়ের মনে হলো যে, এ কথা কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ, তাহলেই সেটা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশুদ্ধ বাণী, সহীহ হাদীস। এ-ই হচ্ছে তাদের কাছে 'কুরআনের মানদণ্ড'। পণ্ডিতির নামে এমন বিশুদ্ধ বিনোদনই তারা বিতরণ করে চলেছেন!

অর্থাৎ তাদের এই মূলনীতি গ্রহণ করলে পুরো হাদীসের ভান্ডারই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং তাদের 'হাদীস মানি, তবে...' এই বক্তব্য মূলত হাদীস অস্বীকারেরই রকমফের। আর হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসদের গৃহীত রীতি-পদ্ধতিই সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক। পাঠক, আপনি

যদি এই বিষয়টি যথাযথভাবে বুঝতে চান তবে যোগ্য শাস্ত্রজ্ঞ উস্তাদের তত্ত্বাবধানে হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়নের আক্ষরিক অর্থেই কোনো বিকল্প নেই।

হাদীস মানি কুরআনের মানদণ্ডে

হাদীস মানি কুরআনের মানদণ্ডে—এটা হাদীস অস্বীকারকারীদের কৌশলী বক্তব্য। এর অর্থ হচ্ছে, আমি প্রথমে নিজের মতো করে কুরআন বুঝব। তারপর আমার বুঝ মহান আল্লাহর নির্ধারিত ও নির্বাচিত ব্যাখ্যাকার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বুঝ, অর্থাৎ হাদীসের উপর প্রয়োগ করব। যদি আমার বুঝের সাথে হাদীসের বক্তব্য না মেলে তবে নিজের বুঝকে চূড়ান্ত ধরে মহান আল্লাহর অনুমোদিত বুঝকে বাতিল করে দেব। ভেবে দেখুন তো, এর চেয়ে বড় আত্মপূজা, আল্লাহর অবাধ্যতা, রাসূল-অবমাননা, ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা আর কী হতে পারে? এদের ক্ষেত্রেই কি মহান আল্লাহর এ বাণী প্রযোজ্য নয় :

فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيْبُوْا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُوْنَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ.

"তবে তারা যদি আপনার ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রাখুন, তারা নিজ প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে মাত্র। যে ব্যক্তি আল্লাহর হিদায়াত ব্যতীত নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিপথগামী আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।"[২৮৫]

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلٰى عِلْمٍ وَّخَتَمَ عَلٰى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلٰى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَّهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ.

"আপনি কি ওই ব্যক্তির বিষয়টি খেয়াল করেছেন, যে নিজ প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছে? এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ জ্ঞানতই পথহারা করেছেন, তার কর্ণ ও কলবে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং চোখের উপরে পর্দা এঁটে দিয়েছেন। সুতরাং

২৮৫. সূরা [২৮] কাসাস, আয়াত : ৫০।

আল্লাহর পর কে আর তাকে পথ দেখাবে? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না?[২৮৬]

এরা আবার নিজেদের মধ্যেও হাদীস গ্রহণ-বর্জনের ক্ষেত্রে একমত হতে পারেন না। কেউ কোনো হাদীসকে কুরআনের সাথে সংগতিপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন তো অন্যে আবার সেটাকে অসংগতিপূর্ণ বলে বাতিল করে দেন। যেমন ধরুন, সালাতের ওয়াক্ত বিষয়ক হাদীস। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে সালাতের ওয়াক্ত পাঁচটি। কুরআনেও সালাতের ওয়াক্ত বিষয়ক আলোচনা রয়েছে। তারা কেউ কেউ সালাতের ওয়াক্ত বিষয়ক হাদীসগুলোকে কুরআনের এ বিষয়ক আলোচনার বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হিসাবে সহীহ হাদীস বলে গ্রহণ করেন। আবার তাদের কারো কারো গবেষণায় কুরআনে দুই বা তিন ওয়াক্ত সালাতের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং এদের মতে, কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে এ বিষয়ক সকল হাদীস জাল ও বাতিল।

এদের এ দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে আল কুরআন বারবার জানাচ্ছে, পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, উম্মাতকে কুরআন বুঝতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যা তথা হাদীস অনুযায়ী। অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর কালাম আল কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে এবং তাদেরকে সে ব্যাখ্যা নিতে হবে আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে।

হাদীস অস্বীকারকারীরা মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ সরাসরি সকল হাদীস অস্বীকার করে। আরেক ভাগ দাবি করে, আমরা হাদীস মানি। তবে কুরআনের অতিরিক্ত ও কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক বক্তব্যকে হাদীস হিসাবে মানি না। এরা কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসের প্রয়োজনীয়তার কথা মুখে স্বীকার করে। আমাদের এখনকার আলোচনা এই দ্বিতীয় দল নিয়ে। তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন, আপনারা তো কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীসের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেন? তবে বলুন তো, কোনো বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির জন্য অন্যের ব্যাখ্যার কেন প্রয়োজন হয়?

আংশিক বা পুরো বক্তব্য না বোঝা বা ভুল বুঝের সম্ভাবনার কারণেই তো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়! আপনারা যখন কুরআন ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার

---

২৮৬. সূরা [৪৫] জাসিয়াহ, আয়াত : ২৩।

কথা স্বীকার করেন তখন নিশ্চয় এ কথা স্বীকার করবেন যে, আপনাদের জন্যও না বোঝার বা ভুল বোঝার সম্ভাবনা বিদ্যমান। এখন বলুন, আপনি কুরআন পড়ে যা বুঝলেন তা যখন হাদীসের সাথে মিলল না তখন কী বলবেনড়নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুল বুঝেছেন (নাউযু বিল্লাহ), বা হাদীসটাকে জাল বলে বাতিল করে দেবেন, শুধু এ কারণে যে তা আপনার বুঝের সাথে মিলল না, হাদীস সহীহ হওয়া না-হওয়ার নীতিমালার দিকে আর ভ্রুক্ষেপই করবেন না, নাকি নিজের বুঝটাকে পুনর্নিরীক্ষণ করবেন?

যেখানে আপনার বুঝ হাদীসের সাথে মিলে গেল সেখানে তো আপনি সঠিক বুঝলেন আর যেখানে মিলল না সেখানে আপনার বুঝকে চূড়ান্ত সঠিক ধরে হাদীসকে বাতিল করে দিলেন, তবে তো কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে সর্বত্রই আপনি আপনার বুঝকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন কোথায়? '*হাদীস মানি, তবে*' বলে যে হাদীস মানার দাবি করেন, সেই হাদীসটা কোথায় মানেন, কীভাবে মানেন?

আমাদের এক বন্ধু রসিকতা করে বলেন, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মতামতের সমতা রক্ষার জন্য তিনি একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তা এই যে, যে ক্ষেত্রে তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একমত হন সে ক্ষেত্রে তিনি স্ত্রীর মতকে মেনে নেন। আর যে ক্ষেত্রে তারা স্বামী-স্ত্রী একমত হতে পারেন না সে ক্ষেত্রে তিনি নিজের মতকে প্রাধান্য দেন। তাহলে দুজনের মতই মানা হলো, মূল্যায়ন করা হলো। আসলে ফলাফল কী? সব ক্ষেত্রেই নিজের মতই প্রতিষ্ঠা করা! আপনার হাদীস মানাও কি এমন হচ্ছে না?

কিন্তু সাহাবিগণ (রা.) কী করতেন? আসুন একটি দৃষ্টান্ত দেখি। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজ গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না অনুমতি গ্রহণ করো এবং তার বাসিন্দাদেরকে সালাম প্রদান করো। এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। হয়তো তোমরা মেনে চলবে। যদি সেখানে কাউকে না পাও তবুও অনুমতি না মিললে প্রবেশ করবে না। আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে। এটি তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত।"[২৮৭]

এ আয়াতে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যের গৃহে প্রবেশের আগে বাইরে থেকে সালাম দিয়ে অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না মিললে প্রবেশ করবে না, ফিরে যেতে বললে ফিরে আসতে হবে।

সাহাবি আবু সাঈদ খুদরি (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে, আবু মূসা আশআরি (রা.) উমার (রা.)-এর ডাকে তাঁর বাসায় যান। দরজায় গিয়ে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্ভবত উমার (রা.) ব্যস্ত ছিলেন। অনুমতি না পেয়ে আবু মূসা (রা.) যখন ফিরে আসতে উদ্যত হন উমার (রা.) বলেন, কেন ফিরে যাচ্ছেন, কে আপনাকে বাধা দিল? আবু মূসা (রা.) বলেন, আমি তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেছি। কিন্তু অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাই ফিরে যাচ্ছি। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ.

তোমাদের কেউ যখন তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করেও অনুমতি পাবে না, সে তখন ফিরে যাবে।

এ বিষয়ক উল্লেখিত আয়াতে কারীমা উমার (রা.)-এর জানা ছিল, কিন্তু হাদীসটি জানা ছিল না। দেখুন, এ হাদীস আয়াতে উল্লেখিত কুরআনি নির্দেশনাকে বাহ্যত আংশিক পরিবর্তন করে দিচ্ছে। কুরআনে শুধু অনুমতি নেওয়ার কথা বলা হয়েছে আর হাদীসে 'তিনবার' অনুমতি চাওয়ার কথা বলা হচ্ছে। কুরআন বলছে, ফিরে যেতে বললে ফিরে যাবে আর হাদীস বলছে, অনুমতি না মিললে ফিরে যেতে না বললেও ফিরে যাবে। সম্ভবত এ কারণেই উমার (রা.)-এর খটকা লাগে। তাই তিনি নিশ্চিত হতে চান— আবু মূসা (রা.) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ঠিক ঠিক

---

২৮৭. সূরা [২৪] নূর, আয়াত : ২৭ ও ২৮।

শুনেছেন এবং সঠিক শব্দে বর্ণনা করতে পেরেছেন কি না। তাই তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন :

وَمَـنْ يَعْلَـمُ ذٰلِكَ؟ لَـئِنْ لَـمْ تَأْتِـنِيْ بِمَـنْ يَعْلَـمُ ذٰلِكَ لَأَفْعَلَـنَّ بِكَ كَـذَا وَكَـذَا.

আপনি ছাড়া এ বিষয়টি আর কে জানে? কোনো সাক্ষী আমার কাছে না আনতে পারলে আপনাকে শাস্তি দেওয়া হবে।

দেখুন, উমার (রা.) কিন্তু কুরআন-বিরোধী দাবি করে হাদীসকে বাতিল করে দেননি। বরং সত্যই এটা নবীর হাদীস কি না নিশ্চিত হতে চেয়েছেন। পরে যখন আবু সাঈদ খুদরি (রা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন, তিনি নিশ্চিত হতে পেরেছেন যে, এটা সত্যই নবী-বাণী, তিনি কুরআনের ক্ষেত্রে নিজের বুঝকে ভুল হিসাবে পরিত্যাগ করে হাদীসের বক্তব্যকে কুরআনের সঠিক মর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছেন :

خَفِيَ عَلَيَّ هٰذَا مِنْ أَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَانِيْ عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণিত এই নির্দেশনাটি আমার অজানা রয়ে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যস্ততা আমাকে অনবহিত রেখেছে।[২৮৮]

জি, এভাবেই সাহাবায়ে কিরাম হাদীসের আলোকে কুরআন বুঝতেন। প্রমাণিত হাদীসের বিপরীতে কুরআন সংক্রান্ত নিজের বুঝ পরিত্যাগ করতেন। নিজের বুঝকে ভুল ভেবে ছেড়ে দিতেন এবং হাদীসের ব্যাখ্যাকে সঠিক মর্ম জেনে গ্রহণ করতেন। কুরআন নির্দেশিত সাহরির শেষ সময় বোঝার ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি, সাহাবিগণ হাদীসের বিপরীতে নিজেদের বুঝ পরিত্যাগ করেছেন।

তবে আমরা যে কিছু বর্ণনা পাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

২৮৮. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ২০৩০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ১১০২৯, ১৯৬১১; সহীহ বুখারি, হাদীস : ৭৩৫৩, ৬২৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২১৫৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৫১৮০-৫১৮৪; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল: ৬/৫৭৯।

ইন্তিকালের পর এক সাহাবির বর্ণিত হাদীসের বিপরীতে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে অন্য সাহাবি তার বিরোধিতা করেছেন, এ সংক্রান্ত আলোচনা আমরা ইতঃপূর্বে 'প্রবীণ সাহাবিদের হাদীস অনুসরণ' শিরোনামে করেছি। পাঠক, সে অংশ পুনরায় দেখে নিতে পারেন।

প্রমাণিত হাদীস কখনোই কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনি কুরআনে এক কথা বলবেন আর তাঁর রাসূলকে ব্যাখ্যায় শিক্ষা দেবেন তার সাথে সাংঘর্ষিক কথা—এটা কখনোই হতে পারে না। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকেও আল্লাহর শিক্ষা বদলে দেবার কল্পনা করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেন :

> مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُوْا عِبَادًا لِّيْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ كُوْنُوْا رَبَّانِيِّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُوْنَ.
>
> "এটা সম্ভব নয় যে, আল্লাহ কোনো মানুষকে কিতাব, হিকমত এবং নবুওয়াত দান করবেন, তারপর সে মানুষদেরকে বলবে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও। বরং (সে তো এ কথাই বলবে যে) কিতাবের পঠন-পাঠনের ভিত্তিতে তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও।"[২৮৯]

সুতরাং কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো বক্তব্য হাদীস হতে পারে না। তবে দুটি বিষয় অবশ্যই বিবেচনাযোগ্য। যা আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় উঠে এসেছে।

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে প্রচুর জাল কথা বানিয়ে সমাজে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং ২. আপামর সকল পাঠকের জন্য অনেক স্থানে কুরআন যথাযথভাবে বুঝতে না পারার এবং ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং কোনো পাঠকের কুরআন বুঝের সাথে যদি হাদীস হিসাবে বর্ণিত কোনো বক্তব্যের অমিল হয় তখন ওই পাঠকের প্রথম কর্তব্য হাদীস হিসাবে বক্তব্যটি প্রমাণিত কি না তা যাচাই করা। অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ

---

২৮৯. সূরা [৩] আলে ইমরান, আয়াত : ৭৯।

আলিমের কাছ থেকে জেনে নেওয়া। প্রমাণিত না হলে তো কথাই নেই। আর প্রমাণিত হলে নিজের বুঝকে হাদীসের অনুকূলে পরিশোধন করে নেওয়া। এর অন্যথা করে নিজের বুঝকে চূড়ান্ত ধরে প্রমাণিত হাদীসকে বাতিল করে দিলে কী পরিণতি হয় তা আমরা '*নববি ভাষ্য ও সাহাবিদের বুঝ প্রত্যাখ্যানের ফল*' শিরোনামের আলোচনায় দেখেছি। খারিজি সম্প্রদায়ের ভয়ংকর পরিণতি এবং সমাজের জন্য তাদের ভয়ংকর হয়ে ওঠার কারণ এটিই। মহান আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। আমীন!!

মনে রাখতে হবে, কুরআন বোঝা ও অনুধাবন করা এবং কুরআনের শিক্ষা ও বিধান আত্মস্থ করা এ যুগের নতুন বিষয় নয়। কুরআন নাযিলের যুগ থেকেই তা চলে আসছে। সাহাবিগণ শিখেছেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে। তারপর প্রজন্ম পরম্পরায় যোগ্য নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত চলে এসেছে। এই ট্রেডিশনে সর্বযুগে যে হাদীসটি কুরআনের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা হিসাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়ে এসেছে আজ তাকে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক দাবি করে বাতিল করে দেওয়ার আমি কোন তালেবর? নাকি এভাবে আমি কুরআনের বিশুদ্ধ মর্ম পরিত্যাগ করে প্রবৃত্তি-পূজারিতে পরিণত হচ্ছি! আমার রব যদি মহান আল্লাহ হন তবে কেন আমি তাঁর শেখানো ও তাঁর রাসূলের বাতলানো ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে নিজের বুঝকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করছি? আমি কি তবে প্রবৃত্তির পূজা করছি না? এভাবে আমি যা মানছি তা তো আর কুরআন নয়। কেননা আমি কুরআনের বিশুদ্ধ মর্মকে প্রত্যাখ্যান করেছি। আর নিজের ভুল বুঝের উপরে আমল করছি। তবে কি আমি কুরআন অস্বীকারকারী নই?

কুরআনের অতিরিক্ত শর্তারোপ

আমরা জেনে এসেছি, হাদীস ওহি। এ ওহি দুই প্রকার : ১. কুরআনে বর্ণিত বিষয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সম্পূরক বর্ণনা এবং ২. কুরআনের অতিরিক্ত বিষয়-আশয়ের বর্ণনা। যারা এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহি অর্থাৎ হাদীসকে অস্বীকার করেন তারা বলেন, কুরআনের অতিরিক্ত শর্তারোপ বৈধ নয়। স্বয়ং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এ কথা বলেছেন। সুতরাং হাদীস নামে প্রচলিত কুরআনের অতিরিক্ত বিষয় বিধৃত বর্ণনাগুলো হাদীস নয়। বরং নবীজির নামে জালকৃত বিষয়। আয়িশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ.

যে ব্যক্তি এমন শর্ত আরোপ করল, যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল। যদিও সে একশত শর্ত আরোপ করে। আল্লাহর শর্ত অগ্রগণ্য ও দৃঢ়তর।

হাদীসটি ইমাম মালিক, আহমাদ ও কুতুবে সিত্তাহর সংকলকগণসহ অনেক মুহাদ্দিস ইমাম সংকলন করেছেন। এ হাদীসে 'আল্লাহর কিতাব' শব্দযুগল 'আল্লাহর বিধান' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল কুরআনে ও অন্য হাদীসেও 'আল্লাহর কিতাব' আল্লাহর বিধান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। '*কুরআন-বহির্ভূত ওহির গুরুত্ব ও মর্যাদা*' শিরোনামের আলোচনায় আমরা তা দেখেছি। এ হাদীসে যে 'আল্লাহর কিতাব' শব্দযুগল 'আল্লাহর বিধান' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে হাদীসের পুরো ঘটনাটি পড়লেই আমরা তা বুঝতে পারব।

বারীরাহ (রা.) তাঁর মনিবের সাথে অর্থের বিনিময়ে মুক্তির চুক্তি করেন। এ মর্মে তিনি আয়িশা (রা.)-এর সাহায্য চান। আয়িশা (রা.) বলেন, হ্যাঁ, তোমার মনিব রাজি হলে আমি তোমার চুক্তির সমুদয় অর্থ এককালীন দিয়ে তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারি। তবে সে ক্ষেত্রে তোমার সম্পদের উত্তরাধিকারী হব আমি। কিন্তু বারীরাহ (রা.)-এর মনিব পক্ষ উত্তরাধিকার ছাড়তে রাজি হন না। সব শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা (রা.)-কে বলেন, মনিব পক্ষ যত ইচ্ছা শর্ত দিক। তুমি তাঁকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দাও আর শুনে রাখো :

إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

'মুক্তদাসের উত্তরাধিকার দাস মুক্তকারীর।'

এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, লোকদের কী হলো তারা এমন শর্ত আরোপ করে, যা আল্লাহর বিধানে নেই? যে ব্যক্তি এমন শর্ত আরোপ করল যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল। যদিও সে শত শর্ত আরোপ করে। আল্লাহর শর্ত অগ্রগণ্য ও দৃঢ়তর।[২৯০]

---

২৯০. মুআত্তা মালিক, হাদীস : ২৭৪৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস : ২৫৭৮৬; সহীহ বুখারি, হাদীস : ২১৬৮, ২৫৬৩, ; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৫০৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস : ৩৯২৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস : ৪৬৫৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস : ১২৫৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ২৫২১; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ১/৫২০।

মুক্তদাসের উত্তরাধিকার দাস মুক্তকারীর—এটা হাদীসে বর্ণিত বিধান। বারীরাহ (রা.)-এর মালিক পক্ষের দাবি হাদীসে বর্ণিত এ বিধানের বিরোধী হয়। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রতিবাদে বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন শর্ত আরোপ করল যা কিতাবুল্লাহ বা আল্লাহর বিধানে নেই তা বাতিল। যদিও সে শত শর্ত আরোপ করে।' সুতরাং এ হাদীস দ্বারা তো কুরআনের অতিরিক্ত বিষয় সম্বলিত হাদীস কুরআনের অতিরিক্ত শর্ত হিসাবে বাতিল হয়ই না; বরং এ জাতীয় হাদীস আল্লাহরই বিধান এবং মান্য করা আবশ্যক বলে প্রমাণিত হয়।

এসব কথা কুরআনে নেই

এতক্ষণ আমরা হাদীসে নববির উপর মুনকিরীনে হাদীস বা হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় কর্তৃক আরোপিত কিছু সংশয় বা আপত্তির পর্যালোচনা করলাম। এছাড়া তারা হাদীসের বিরুদ্ধে আরো অনেক অভিযোগ উত্থাপন করে থাকেন। কিন্তু সেসব এতটাই যুক্তিহীন, অর্থহীন ও পাগলামিপূর্ণ যে, তার জবাব দিতে যাওয়াটাও একপ্রকার পাগলামি, সময়, মেধা ও বাক্যের অপচয়। তাদের এসব পাগলামিপূর্ণ কথাবার্তা বলতে দ্বিধা না করার কারণ হয়তো এই যে, হাদীসশাস্ত্র তো বটেই, উলূমে ইসলামিয়্যার কোনো শাখার প্রাথমিক জানাশোনাও তাদের নেই। নইলে এসব হাস্যকর কথাবার্তা বলে তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী মহলের কাছে খেলো করবে কেন? অথবা তাদের টার্গেট ওই সব সরল সাধারণ জনতাকে বিভ্রান্ত করে দলে ভেড়ানো, যাদের ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই এবং সাধারণ যুক্তি-তর্কও বোঝে না। বরং কথার ভংচং দিয়ে কেউ আকর্ষণীয়ভাবে কিছু উপস্থাপন করলেই গলে যায়।

তারা যে সকল ধাপ্পাবাজি করে সাধারণ মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করতে চান তার একটি হচ্ছে—*এসব কথা কুরআনে নেই*। প্রমাণিত স্বতঃসিদ্ধ কোনো কোনো বিষয় উত্থাপন করে তারা এ কথা বলেন। তারা বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন কুরআনে নেই মানে তার আর কোনো অস্তিত্বই নেই। তাদের এ উপস্থাপন শুনে অনেক সাধারণ মুসলিম বিভ্রান্ত হয়—কুরআনে নেই তবে আমরা এতদিন মেনে এসেছি কেন?

ধরুন, আপনার পরিহিত পোশাকে দুটি পকেট আছে। আপনি উপস্থিতির

সামনে বললেন, আমার পকেটে ৫০০ টাকা আছে। একজন কেউ আপনার একটি পকেটে হাত দিয়ে দেখল কোনো টাকা নেই। সে বলল, আপনি মিথ্যা বলছেন। আপনার পকেটে তো কোনো টাকা নেই! তখন নিশ্চয় আপনি বলবেন, আমার আর একটি পকেট আছে। এই দেখুন টাকাটা এখানে আছে।

কিন্তু অনেক সাধারণ মুসলিম, যারা হাদীসকে শরীআতের দলীল হিসাবে বিশ্বাস করে, তবে হাদীস অস্বীকারকারীদের ওই বাক্য শুনে তাদের আর মনে পড়ে না, তারা পাল্টা প্রশ্নও করতে পারে না, কুরআন নেই তো কী হয়েছে? হাদীসে তো আছে! শরীআত হওয়ার জন্য সব কথা কুরআনে থাকতে হবে কেন?

এই কথা যদি তাদের মনে পড়ত আর তাদেরকে তারা বলতে পারত, তখন যদি জবাবে হাদীস অস্বীকারকারী বলত, *হাদীসে থাকলে কী হয়েছে? হাদীস তো বানোয়াট কথা! হাদীস কোনো দলীল নয়*, তখন হয়তো এই সাধারণ মুসলিমেরও চেতনা জাগ্রত হত, তার হয়তো টনক নড়ত, এই লোক হয়তো বিভ্রান্ত অথবা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী। কিন্তু তার আগেই যারা কথার ভংচংয়ে খেই হারিয়ে ফেলে এ ধরনের অতি সাধারণ লোকজনই হয়তো এইসব হাদীস অস্বীকারকারীর টার্গেট। নইলে এত কাঁচা কথা তারা কেন বলবেন?

আমরা এই গ্রন্থের বক্ষ-বিস্তৃত আলোচনায় দেখে এসেছি, হাদীস ওহি, ইসলামের অন্যতম ও স্বতন্ত্র দলীল। সুতরাং কোনো বিষয় কুরআনে না থাকলেই ইসলামে তা নেই হয়ে যায় না; বরং হাদীসে থাকলেও ইসলামে তা আল্লাহর বিধান হিসাবে ওহির পূর্ণ মর্যাদায় বরিত। তাছাড়া তারা যে সকল বিষয় উল্লেখ করে বলেন যে, *এসব বিষয় কুরআনে নেই*, তার অনেক কিছুই কুরআনে আলোচিত। এর মধ্যে অন্যতম কবরের সাওয়াল-জবাব ও আযাব। তারা বলেন, এ বিষয়ে কুরআনে কোনো প্রমাণ নেই; বরং কুরআনের সাথে বিষয়টি সাংঘর্ষিক। অথচ আল কুরআনে বেশ কিছু আয়াতে এ বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সূরা ইবরাহীমের ২৭ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন :

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي

الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.

"যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ পার্থিব জীবন ও আখিরাতে তাদের দৃঢ়পদ রাখবেন সুপ্রতিষ্ঠিত বাক্য দ্বারা। আর জালিমদের পথচ্যুত করবেন। আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।"

বারা' ইবন আযিব (রা.) বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এ আয়াতটি কবরের সাওয়াল-জবাব ও আযাব সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।[২৯১]

তারা হয়তো বলবেন, উদ্ধৃত আয়াতে তো 'কবরের আযাব' জাতীয় কোনো শব্দ নেই। আমরা তাদের জ্ঞাতার্থে বলব, সচেতন ভাষা ব্যবহারকারী মাত্রই খেয়াল করে থাকবেন, কথক কথা বলতে গিয়ে সব সময় প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন না; বরং কখনো কখনো পরিপার্শ্ব এমন থাকে যে, কথক প্রসঙ্গ উল্লেখ না করেই উদ্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য দিয়ে থাকেন। আর শ্রোতামাত্রই পরিপার্শ্ব বিবেচনায় বুঝতে পারেন, কোন বিষয়ে বক্তব্য প্রদত্ত হলো। অন্যত্র এই বক্তব্য উদ্ধৃত করবার সময় উপস্থিত শ্রোতা যখন বলেন, বক্তব্যটি অমুক বিষয়ে প্রদত্ত হয়েছে। তখন এই শ্রোতাকে উপস্থিত শ্রোতার কথা বিশ্বাস করে সে প্রসঙ্গ বিবেচনায় বক্তব্য বোঝার চেষ্টা করতে হয়। নইলে কিছুতেই তার মর্ম ও নির্দেশনা উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

আল কুরআনের যে সকল আয়াত কোনো প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক নাযিল হয়েছে সে সকল আয়াতের সবগুলোতে প্রসঙ্গের উল্লেখ নেই। এর কোনো কোনোটি এমন যে, হাদীসে বর্ণিত প্রসঙ্গ সামনে না রাখলে কোনোভাবেই বোঝা সম্ভব হবে না যে, এ আয়াত কেন নাযিল হয়েছিল।

উম্মাত-জননী আয়িশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উপর অপবাদ আরোপের প্রেক্ষাপটে সূরা নূরের ১১ থেকে ২০ আয়াত পর্যন্ত ১০টি আয়াত নাযিল হয় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণায়। কিন্তু এই আয়াতগুলোতে কোথাও আয়িশা (রা.)-এর নাম উল্লেখ নেই। কোনোভাবেই বোঝার উপায় নেই যে, এগুলো ব্যক্তি-বিশেষের পবিত্রতা ঘোষণায় নাযিল হয়েছে। বরং ১২ নং আয়াতে

২৯১. সহীহ বুখারি, হাদীস : ১৩৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৮৭১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস : ৪২৬৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস : ২০৫৭; ইবনুল আসীর, জামিউল উসূল, ২/২০৩, ১১/১৭৬-১৭৭।

'أَنْفُس' শব্দের বহুবচন ব্যবহার থেকে বোঝা যায়, এটি হয়তো মুসলিম জাতির জন্য সাধারণ নির্দেশনাবাচক কোনো আয়াত। কিন্তু আয়াতগুলো নাযিল হলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দেন :

يَا عَائِشَـةُ أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ.

হে আয়িশা, আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করেছেন।[২৯২]

তেমনি আমাদের উদ্ধৃত সূরা ইবরাহীমের ২৭ নং আয়াত মহান আল্লাহ কোন প্রসঙ্গে নাযিল করেছেন এটা তাঁর নবী, যাঁর উপর এ আয়াতে কারীমা নাযিল হয়েছে, তিনি যথার্থ জানেন। আমাদেরকে তাঁর বর্ণিত প্রসঙ্গ বিবেচনায় রেখে বুঝতে হবে। তিনি পরিষ্কার বলেছেন, আয়াতটি কবরের আযাব এবং সাওয়াল-জবাব বিষয়ে নাযিল হয়েছে। আমরা কি বলতে পারি, যাঁর উপর আয়াত নাযিল হয়েছে তিনি জানেন না আয়াতটি কোন প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে?

আর কবরের আযাবের বিরুদ্ধে আল কুরআনের যে সকল আয়াত তারা পেশ করেন সবগুলোই তারা ভুল বুঝেছেন। আয়াতগুলোর সঠিক মর্ম বুঝতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন। (এ সংক্রান্ত সকল আয়াত উদ্ধৃত করে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে দেখানোর অবকাশ এ সংক্ষিপ্ত পুস্তকে নেই)। হাদীসে নববি ও উম্মাতের তুরাসি (ধারাবাহিকভাবে যুগ যুগ ধরে চলমান) বুঝ প্রত্যাখ্যান করার কারণে কুরআনের সঠিক বুঝ থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করছেন। মহান আল্লাহ এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে আমাদের হেফাজত করুন। আমীন!!
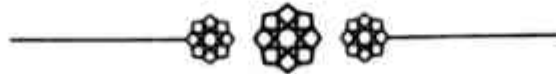
২৯২. সহীহ বুখারি, হাদীস : ৪১৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৭৭০।
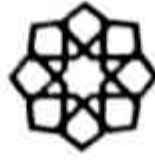
উপসংহার

আল কুরআন সকল কিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা। এই কুরআন সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করছে যে, কুরআনের বাইরেও মহান আল্লাহ ওহি নাযিল করেছেন—কুরআনের ব্যাখ্যা এবং কুরআনের অতিরিক্ত বিধিবিধান সংবলিত ওহি। যা কুরআনের সমপরিমাণ বা তারও অধিক। কুরআনের অতিরিক্ত এই ওহি আমাদের নিকট হাদীস বা সুন্নাহ নামে সংকলিত। এই উভয় প্রকার ওহি কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য মান্য করা মহান আল্লাহ আবশ্যক করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি কিয়ামত পর্যন্ত তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন এটা বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানের অংশ। কেউ যদি ওহির কোনো অংশ কোনো ধরনের যুক্তির অবতারণা করে অস্বীকার করে তবে মহান আল্লাহর প্রতি তার ঈমান যথার্থ নয়। এবং সে ওহি অস্বীকারকারী বলে গণ্য।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহ এ বিষয়ে একমত। তবে নিজেকে মুসলিম বলে দাবিকারী কিছু ব্যক্তি ও গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে হাদীস অস্বীকার করে থাকে। কেউ একবাক্যে সকল হাদীস অস্বীকার করে, কেউ কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক দাবি করে কিছু হাদীস অস্বীকার করে আর কেউ এর সাথে সাথে কুরআনের অতিরিক্ত বিষয় সংবলিত হাদীসগুলো অস্বীকার করে।

হাদীস অস্বীকারের এ ফিতনা অনেক প্রাচীন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এ বিভ্রান্ত গোষ্ঠীর উত্থানের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। আমাদের আসলাফ-আকাবির তাদের বিভ্রান্তি খণ্ডনে বিস্তারিত

লিখেছেন। তবে বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নতির কারণে অন্য অনেক কিছুর মতো এ ফিতনাও দেশ-দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাহফিল মঞ্চে জনপ্রিয় বক্তার কণ্ঠে, চায়ের দোকানে সাধারণের আলাপে, এমনকি খেতখামারে কৃষক-মজুরের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে এসব সংশয়ের কথা।

এ ফিতনা মূলত ইসলামের শিকড়মূলে কুঠারাঘাত। হাদীস অস্বীকারের মাধ্যমে কীভাবে ইসলামের সৌধসমগ্রকে ধসিয়ে দেওয়া যায় আপনারা তা এ পুস্তকের এতক্ষণের আলোচনায় নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন। এ জন্য আমরা অনেকটা বাধ্য হয়েই কলম ধরেছি এবং সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। এ বিষয়ক পূর্ণ পাঠ উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল সাধারণ পাঠকের জন্য প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করেছি। তারা যেন এতটুকু বুঝতে পারেন যে, হাদীস অস্বীকারকারী সম্প্রদায় কর্তৃক হাদীসের উপর আরোপিত সংশয়গুলো ভিত্তিহীন, অবাস্তব ও অযৌক্তিক। কিন্তু তারা যদি এ বিষয়টি বিস্তারিত ও পরিপূর্ণরূপে জানতে চান তবে এ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় কিতাবাদি শাস্ত্রজ্ঞ আলিমের নিকট অধ্যয়ন করে নেবেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, জগৎসমূহের প্রতিপালক মহান আল্লাহর, যিনি এ অধমকে প্রচেষ্টার সমাপ্তি টানার তাওফীক দিয়েছেন। তাঁর কাছে বিনীত প্রার্থনা করছি, তিনি যেন ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে একে কবুল করে নেন এবং লেখক, পাঠক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নাজাতের ওসিলা করেন। সালাত ও সালাম আমাদের প্রিয়তম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিজন, সহচর এবং কিয়ামত পর্যন্ত সকল অনুসারীর উপর। শুরুতে ও শেষে সকল সময়ে সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের নিমিত্তে।
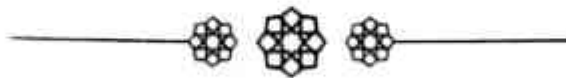
লেখক পরিচিতি

শায়খ ইমদাদুল হক

আলিম, উস্তায, ইমাম, খতীব ও লেখক

তিনি জন্মেছেন আপন মাতুলালয় চুয়াডাঙ্গা সদরের কুতুবপুর গ্রামে—১৯৮২ সালের ২৫ ডিসেম্বর শনিবার ভোর-সকালে। আলমডাঙ্গা উপজেলার নওলামারি গ্রামে তার পৈতৃক নিবাস। ২০০৪ সালে জামিআ আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম, ফরিদাবাদ, ঢাকা থেকে দাওরা হাদীস শেষ করে কিছুদিন ইফতা পড়েছেন। বর্তমানে তিনি আলমডাঙ্গা শহরে শিক্ষকতা, ইমামত ও খেতাবতের দায়িত্ব পালন করছেন।

উলূমে শারয়িয়্যাহর মতো ঢাকা-কেন্দ্রিক বাংলা সাহিত্যেরও একনিষ্ঠ পাঠক তিনি। সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি একসময় প্রচুর ছড়া, কবিতা, ছোটগল্প ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন এবং বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। তার রচিত, অনূদিত, সংকলিত ও সম্পাদিত বেশ কিছু গ্রন্থ বাজারে রয়েছে।

হাদীসের প্রামাণ্যতাকে অস্বীকারের নানারকম ব্যর্থ প্রচেষ্টা আজ নতুন নয়। যুগে যুগে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে নানান মোড়কে এই চ্যালেঞ্জ উম্মাহর সামনে এসেছে। কিন্তু আল্লাহ যে শরীয়তকে সুরক্ষিত করেছেন, দুশমনদের কী সাধ্য, এর ক্ষতি করবে!

যখনই মুখরোচক কোনো স্লোগান বা উপস্থাপনের মাধ্যমে হাদীস অস্বীকারের তথা অবমাননার কসরত করা হয়েছে, দ্বীনের প্রহরী উলামায়ে কেরাম মজবুতভাবে সেসব আপত্তির খণ্ডন করেছেন।

'হাদীস মানতেই হবে' তেমনই একটি সংকলন। এখানে খুবই মজবুত ও মোটামুটি বিস্তৃতভাবে এমন কিছু মৌলিক কথা আলোচিত হয়েছে, যা পড়ার পর ইনসাফওয়ালা কোনো মানুষ হাদীসের প্রয়োজনীয়তা, সংরক্ষণ ও এর অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করতে পারবে না। পাশাপাশি যারা হাদীস অস্বীকারের ফিতনায় জড়িয়ে গেছে, তাদের মাঝেও চিন্তার সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

cover • muhareb 01600187761